কল্লোল যুগ

কল্লোল যুগ

কল্লোল যুগ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট,
কলিকাতা—৬

দীনেশরঞ্জন দাশ

ও

গোকুলচন্দ্র নাগের

উদ্দেশে উৎসর্গ

সূচীপত্র

এক

একই শ্লেটের দুপিঠে দুজনে একই জনের নাম লিখলাম।

তেরো শ আটাশ সালের কথা। গিয়েছিলাম মেয়েদের ইস্কুল-হসটেলে একটি ছাত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। দারোয়ানের কাছে শ্লেট জিম্মা আছে, তাতে কাঙ্ক্ষিতদর্শনার নামের নিচে দর্শনাকাঙ্ক্ষীর নাম লিখে দিতে হবে। আরো একটি যুবক, আমারই সমবয়সী, এধার-ওধার ঘুরঘুর করছিল। শ্লেট নিয়ে আসতেই দুজনে কাছাকাছি এসে গেলাম। এত কাছাকাছি যে আমি যার নাম লিখি সেও তার নাম লেখে।

প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে বন্ধু হয়ে গেলাম দুজনে।

তার নাম সুবোধ দাশগুপ্ত। ডাক নাম, নানকু।

হৃদ্যতা এত প্রগাঢ় হয়ে উঠল যে দুজনেই বড় চুল রাখলাম ও নাম বদলে ফেললাম। আমি নীহারিকা, সে শেফালিকা।

তখন সাউথ সুবার্বন কলেজে—বর্তমানে আশুতোষ—আই-এ পড়ি। এন্তার কবিতা লিখি আর "প্রবাসী"তে পাঠাই। আর প্রতি খেপেই প্যারীমোহন সেনগুপ্ত (তখনকার "প্রবাসী"র "সহ-সম্পাদক") নির্মমের মত তা প্রত্যর্পণ করেন। একে ডাক-খরচা তায় গুরু-গঞ্জনা, জীবনে প্রায় ধিক্কার এসে গেল। তখন কলেজের এক ছোকরা পরামর্শ দিলে, মেয়ের নাম দিয়ে পাঠা, নির্ঘাৎ মনে ধরে যাবে। তুই যেখানে পুরো পৃষ্ঠা লিখে পাশ করতে পারিস না, মেয়েরা সেখানে এক লাইন লিখেই ফার্স্ট ডিভিশন। দেখছিস ত—

ওই ঠিক করে দিলে, নীহারিকা। আর, এমন আশ্চর্য, একটি সদ্য-ফেরৎ-পাওয়া কবিতা নীহারিকা দেবী নামে "প্রবাসী"তে পাঠাতেই পত্রপাঠ মনোনীত হয়ে গেল।

দেখলাম, সুবোধেরও সেই দশা। বহু জায়গায় লেখা পাঠাচ্ছে, কোথাও জায়গা পাচ্ছে না। বললাম, নাম বদলাও। নীহারিকার সঙ্গে মিলিয়ে সে নাম রাখলে শেফালিকা। আর, সঙ্গে-সঙ্গে সেও হাতে-হাতে ফল পেল।

লেখা ছাপা হল বটে, কিন্তু নাম কই? যেন নিজের ছেলেকে পরের বাড়িতে পোষ্য দিয়েছি। লোককে বিশ্বাস করানো শক্ত, এ আমার রচনা। গুরুজনের গঞ্জনা গুরুতর হয়ে উঠল। কেননা আগে শুধু গঞ্জনাই ছিল, এখন সে সঙ্গে মিশল এসে গুঞ্জন। নীহারিকা কে?

অনেক কাগজ গায়ে পড়ে নীহারিকা দেবীকে কবিতা লেখবার জন্যে অনুরোধ করে পাঠাতে লাগল। নিমন্ত্রণ হল কয়েকটা সাহিত্যসভায়, দু-একজন গুণমোহিতেরও খবর পেলাম চিঠিতে। ব্যাপারটা বিশেষ স্বস্তিকর মনে হল না। ঠিক করলাম স্বনামেই ত্রাণ খুঁজতে হবে। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ ইত্যাদি। অনেক ঠোকাঠুকির পর "প্রবাসী"তে ঢুকে পড়লাম স্বনামে, "ভারতী"ও অনেক বাধা-বারণের পর দরজা খুলে দিল।

গেলাম সুবোধের কাছে। বললাম, 'পালাও। মাননীয়া সাহিত্যিকারা নীহারিকা দেবীর সঙ্গে বাড়িতে দেখা করতে আসছেন। অন্তত নিজের ছদ্মনাম থেকে পালাও। আত্মরক্ষা করো। নইলে ঘরছাড়া হবে একদিন।'

অর্ধশব্দস্ফুট একটি বিশেষ হাসি আছে সুবোধের। সেই নির্লিপ্ত হাসি হেসে সুবোধ বললে, 'ঘরছাড়াই হচ্ছি সত্যি। পালাচ্ছি বাংলা দেশ থেকে।'

কোন এক সমুদ্রগামী মালবাহী জাহাজে ওয়ারলেস-ওয়াচার হয়ে সুবোধ অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে। পঞ্চাশ টাকা মাইনে। মুক্ত পাখির মতন খুশি। বললে, 'অফুরন্ত সমুদ্র আর অফুরন্ত সময়। ঠেসে গল্প লেখা যাবে। যখন ফিরব দেখা করতে এসো ডকে। অস্ট্র-টাং খুব উপাদেয়

জিনিস, খেয়ে দেখতে পারো ইচ্ছে করলে। আর এক-আধ দিন যদি রাত কাটাতে চাও, শুতে পাবে পালকের বালিশে।'

সেই সুবোধ একদিন হঠাৎ মাদ্রাজ থেকে ঘুরে এসে আমাকে বললে, 'গোকুল নাগের সঙ্গে আলাপ করবে?'

জানতাম কে, তবু ঝাঁজিয়ে উঠে জিগগেস করলাম, 'কে গোকুল নাগ? ওই লম্বা চুল-ওলা বেহালা-বাজিয়ের মত যার চেহারা?'

অর্ধস্ফুটশব্দে সুবোধ হাসল। পরে গম্ভীর হয়ে বললে, '"কল্লোলে"র সহ-সম্পাদক। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। তোমার লেখা তাঁকে পড়াব বলে বলেছি। চমৎকার লোক।'

ব্যাপার কি—কৌতূহলী হয়ে তাকালাম সুবোধের দিকে।

গোকুলের প্রতি, কেন জানি না, মনটা প্রসন্ন ছিল না। মাঝে-মাঝে দেখেছি তাকে ভবানীপুরের রাস্তায়, কখনো বা ট্র্যামে। কেমন যেন দূর ও দাম্ভিক মনে হত। মনে হত লম্বা চালের লোক, ধরাখানাকে যেন সরা জ্ঞান করছে। "প্রবাসী" "ভারতী"তে ছোট ধাঁচের প্রেমের গল্প লিখত, যাতে অর্থের চাইতে ইঙ্গিত থাকত বেশি, যার মানে, দাঁড়ি-কমার চেয়ে ফুটকিই অধিকতর। সেই ফুটকি-চিহ্নিত হেঁয়ালির মতই মনে হত তাকে।

দূরের থেকে চোখের দেখা দেখে বা কখনো নেহাৎ কান-কথা শুনে এমনি মনগড়া সিদ্ধান্ত করে বসি আমরা। আর সে সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এত নিঃসন্দেহ থাকি। সময় কোথায়, সুযোগই বা কোথায়, সে সিদ্ধান্ত যাচাই করি একদিন। যাকে কালো বলে জেনেছি সে চিরকাল কালো বলেই আঁকা থাক।

সুবোধ এমন একটা কথা বললে যা কোনো দিন শুনিনি বা শুনব বলে আশা করিনি বাংলা দেশে।

জাহাজে বসে এতদিন যত লিখেছে সুবোধ, তারই থেকে একটা

গল্প বেছে নিয়ে কি খেয়ালে সে "কল্লোলে" পাঠিয়ে দিয়েছিল। আরো অনেক কাগজে সে পাঠিয়েছিল সেই সঙ্গে, হয় খবর এসেছে মনোনয়নের, নয় ফেরৎ এসেছে লেখা—সেটা এমন কোনো আশ্চর্যজনক কথা নয়। কিন্তু "কল্লোলে" কী হল? "কল্লোল" তার গল্প অমনোনীত করলে, সম্পাদকী লেপাফায় লেখা ফেরৎ গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে গেল একটি পোস্ট কার্ড। "যদি দয়া করে আমাদের আফিসে আসেন একদিন আলাপ করতে!" তার মানে, লেখা অপছন্দ হয়েছে বটে, কিন্তু লেখক, তুমি অযোগ্য নও, তুমি অপরিত্যাজ্য। তুমি এসো। আমাদের বন্ধু হও।

ঐ পোস্টকার্ডটিই গোকুল।

ঐ পোস্টকার্ডটিই সমস্ত "কল্লোলে"র সুর। "কল্লোলের"র স্পর্শ। তার নীড়নির্মাণের মূলমন্ত্র।

খবর শুনে মন নরম হয়ে গেল। আমার লেখা বাতিল হলেও আমার মূল্য নিঃশেষ হয়ে গেল না এত বড় সাহসের কথা কোনো সম্পাদকই এর আগে বলে পাঠায়নি। যা লিখেছি তার চেয়ে যা লিখব তার সম্ভাব্যতারই যে দাম বেশি এই আশ্বাসের ইসারা সেদিন প্রথম পেলাম সেই গোকুলের চিঠিতে।

সুবোধ বললে. 'তোমার খাতা বের করো।'

তখন আমি আর আমার বন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্র মোটা-মোটা বাঁধানো খাতায় গল্প-কবিতা লিখি। লিখি ফাউন্টেন পেনে নয়—হায়, ফাউন্টেন পেন কেনবার মত আমাদের তখন পয়সা কোথায়—লিখি বাংলা কলমে, সরু জি-মার্কা নিবে। অক্ষর কত ছোট করা যায় চলে তার অলক্ষ্য প্রতিযোগিতা। লেখার মাথায় ও নিচে চলে নানারকম ছবির কেরামতি।

তারিখটা আমার ডায়রিতে লেখা আছে—৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার,

১৩৩১ সাল। সন্ধেবেলা সুবোধের সঙ্গে চললাম নিউ মার্কেটের দিকে। সেখানে কি? সেখানে গোকুল নাগের ফুলের দোকান আছে।

যে দোকান দিয়ে বসেছে সে ব্যবসা করতে বসেনি এমন কথা কে বিশ্বাস করতে পারত? কিন্তু সেদিন একান্তে তার কাছে এসে স্পষ্ট অনুভব করলাম, চারপাশের এই রাশীভূত ফুলের মাঝখানে তার হৃদয়ও একটি ফুল, আর সেই ফুলটিও সে অকাতরে বিনামূল্যে যে-কারুর হাতে দিয়ে দিতে প্রস্তুত।

সুবোধের হাত থেকে আমার খাতাটা সে ব্যগ্র উৎসাহে কেড়ে নিল। একটিও পৃষ্ঠা না উলটিয়ে কাগজে মুড়ে রেখে দিলে সন্তর্পণে। যেন নীরব নিভৃতিতে অনেক যত্ন-সহকারে লেখাগুলো পড়তে হবে এমনি ভাব। হাটের মাঝে পড়বার জিনিস তারা নয়—অনেক সদ্ব্যবহার ও অনেক সদ্বিবেচনা পাবার তারা যোগ্য। লেখক নতুন হোক, তবু সে মর্যাদার অধিকারী।

এমনি ছোটখাটো ঘটনায় বোঝা যায় চরিত্রের বিশালতা।

বুঝলাম কত বড় শিল্পীমন গোকুলের। অনুসন্ধিৎসু চোখে আবিষ্কারের সম্ভাবনা দেখছে। চোখে সেই যে সন্ধানের আলো তাতে তেল জোগাচ্ছে স্নেহ।

যখন চলে আসি, আমাকে একটা ব্ল্যাকপ্রিন্স উপহার দিলে। বললে, 'কাল সকালে আপনি আর সুবোধ আমার বাড়ি যাবেন, চা খাবেন।'

'আপনার বাড়ি—'

'আমার বাড়ি চেনেন না? আমার বাড়ি কোথায় চেহারা দেখে ঠাহর করতে পারেন না?'

'কি করে বলব?'

'কি করে বলবেন! আমার বাড়ি জু-তে, চিড়িয়াখানায়। আমার বাড়ি মানে মামার বাড়ি। কোনো ভয় নেই। যাবেন স্বচ্ছন্দে।'

পরদিন খুব সকালে সুবোধকে নিয়ে গেলাম চিড়িয়াখানায়। দেখলাম শিশিরভেজা গাঢ়-সবুজ ঘাসের উপর গোকুল হাঁটছে খালি পায়ে। বোধহয় আমাদেরই প্রতীক্ষা করছিল। তার সেদিনের সেই বিশেষ চেহারাটি বিশেষ একটা অর্থ নিয়ে আজো আমার মনের মধ্যে বিঁধে আছে। যেন কিসের স্বপ্ন দেখছে সে, তার জন্যে সংগ্রাম করছে প্রাণপণ, প্রতীক্ষা করছে পিপাসিতের মত। অথচ, সংগ্রামের মধ্যে থেকেও সে নির্লিপ্ত, নিরাকাঙ্ক্ষ। জনতার মধ্যে থেকেও সে নিঃসঙ্গ, অনন্যসহায়।

তার ঘরে নিয়ে গেল আমাদের। চা খেলাম। সিগারেট খেলাম। নিজের অজানতেই তার অন্তরের অঙ্গ হয়ে উঠলাম। বললে, 'আপনার "গুমোট" গল্পটি ভালো লেগেছে। ওটি ছাপব আষাঢ়ে।'

"কল্লোলে"র তখন দ্বিতীয় বর্ষ। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৩০। সম্পাদক শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ; সহ-সম্পাদক, শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ। প্রতি সংখ্যা চার আনা। আট পৃষ্ঠা ডিমাই সাইজে ছাপা, প্রায় বারো ফর্মার কাছাকাছি।

নিজের সম্বন্ধে কথা বলতে এত অনিচ্ছুক ছিল গোকুল। পরের কথা জিজ্ঞাসা করো, প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। তবু যেটুকু খবর জানলাম মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

গোকুল হালে সাহিত্য করছে বটে, কিন্তু আসলে সে চিত্রকর। আর্ট স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছে সে। অয়েল পেন্টিংএ তার পাকা হাত। তারপর তার লম্বা চুল দেখে যে সন্দেহ করেছিলাম, সে সত্যিই-সত্যিই বেহালা বাজায়। আর, আরো আশ্চর্য, গান গায়। শুধু তাই? "সোল অফ এ শ্লেভ" বা "বাঁদীর প্রাণ" ফিল্মে সে অভিনয়ও করেছে অহীন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে। শিল্প-পরিচালকও ছিল সে-ই।

গোকুল ও তার বন্ধুদের "ফোর আর্টস ক্লাব" নামে একটা প্রতিষ্ঠান

ছিল। বন্ধুদের মধ্যে ছিল দীনেশরঞ্জন দাশ, মণীন্দ্রলাল বসু আর সুনীতি দেবী। এরা চার জনে মিলে একটা গল্পের বইও বের করেছিল, নাম "ঝড়ের দোলা"। প্রত্যেকের একটি করে গল্প। মাসিক পত্রিকা বের করারও পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু তার আগে ক্লাব উঠে গেল।

'আমার ব্যাগে দেড় টাকা আর দীনেশের ব্যাগে টাকা দুই—ঠিক করলাম "কল্লোল" বের করব।' স্নিগ্ধ উত্তেজনায় উজ্জ্বল দুই চোখ মেলে গোকুল তাকিয়ে রইল বাইরের রোদের দিকে। বললে, 'সেই টাকায় কাগজ কিনে হ্যাণ্ডবিল ছাপালাম। চৈত্র সংক্রান্তির দিন রাস্তায় বেজায় ভিড়, জেলেপাড়ার সং দেখতে বেরিয়েছে। সেই ভিড়ের মধ্যে দু'জনে আমরা হ্যাণ্ডবিল বিলোতে লাগলাম।' পরমুহূর্তেই আবার তার শান্ত স্বরে ঔদাস্যের ছোঁয়া লাগল। বললে, 'তবু "ফোর আর্টস্ ক্লাব"টা উঠে গেল, মনে কষ্ট হয়।'

বললাম, 'আপনিই তো একাধারে ফোর আর্টস। চিত্র, সঙ্গীত, সাহিত্য, অভিনয়।'

নম্রতায় বিমর্ষ হয়ে হাসল গোকুল। বললে, 'আসুন আপনারা সবাই "কল্লোলে"। "কল্লোল"কে আমরা বড় করি। দীনেশ এখন দার্জিলিঙে। সে ফিরে আসুক। আমাদের স্বপ্নের সঙ্গে মিশুক আমাদের কর্মের সাধনা।'

যখন চলে আসি, গোকুল হাত বাড়িয়ে আমার হাত স্পর্শ করল। সে স্পর্শে মামুলি শিষ্টাচার নয়, তার অনেক বেশি। একটি উত্তপ্ত স্নেহ, হয়তো বা অস্ফুট আশীর্বাদ।

তারপর একদিন "কল্লোল" আফিসে এসে উপস্থিত হলাম। ১০।২ পটুয়াটোলা লেন। মির্জাপুর স্ট্রিট ধরে গিয়ে বাঁ-হাতি।

"কল্লোল"-আফিস !

চেহারা দেখে প্রথমে দমে গিয়েছিলাম কি সেদিন ? ছোট্ট দোতলা বাড়ি—একতলায় রাস্তার দিকে ছোট্ট বৈঠকখানায় "কল্লোল"-আফিস ! বাঁয়ে বেঁকে দুটো সিঁড়ি ভেঙে উঠে হাত-দুই চওড়া ছোট একটু রোয়াক ডিঙিয়ে ঘর। ঘরের মধ্যে উত্তরের দেওয়াল ঘেঁসে নিচু একজনের শোয়ার মত ছোট একফালি তক্তপোশ, শতরঞ্চির উপর চাদর দিয়ে ঢাকা। পশ্চিম দিকের দেওয়ালের আধখানা জুড়ে একটি আলমারি, বাকি আধখানায় আধা-সেক্রেটারিয়েট টেবিল। পিছন দিকে ভিতরে যাবার দরজা, পর্দা ঝুলছে কি ঝুলছে না, জানতে চাওয়া অনাবশ্যক। ফাঁকা জায়গাটুকুতে খান দুই চেয়ার, আর একটি ক্যানভাসের ডেক-চেয়ার। ঐ ডেক চেয়ারটিই সমস্ত "কল্লোল"-আফিসের অভিজাত্য। প্রধান বিলাসিতা।

সম্পাদকী টেবিলে গোকুল নাগ বসে আছে, আমাকে দেখে সস্মিত 'শুভাগমন' জানালে। তক্তপোশের উপর একটি প্রিয়দর্শন যুবক, নাম ভূপতি চৌধুরী, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে, বাড়ির ঠিকানা ৫৭ আমহার্স্ট স্ট্রিট। আরো একটি ভদ্রলোক ব'সে, ছিমছাম ফিটফাট চেহারা, একটু বা গম্ভীর ধরনের। খোঁজ নিয়ে জানলাম, সতীপ্রসাদ সেন, "কল্লোলের" গোরাবাবু। দেখতে প্রথমটা একটু গম্ভীর, কিন্তু অপেক্ষা করো, পাবে তার অন্তরের মধুরতার পরিচয়।

ভূপতির সঙ্গে একবাক্যেই ভাব হয়ে গেল। দেখতে দেখতে চলে এল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

কিন্তু প্রথম দিন সব চেয়ে যা মন ভোলাল তা হচ্ছে ঠিক সাড়ে-চারটের সময় বাড়ির ভিতর হতে আসা প্লেট-ভরা এক গোছা রুটি আর বাটিতে করে তরকারি। আর মাথা-গুনতি চায়ের কাপ।

ভাবলাম, প্রেমেনকে বলতে হবে। প্রেমেন আমার স্কুলের সঙ্গী। ম্যাট্রিক পাশ করেছি এক বছর।

দুই

সাউথ সুবার্বন স্কুলে ফার্স্ট ক্লাশে উঠে প্রেমেনকে ধরি। সে-সব দিনে ষোলো বছর না পুরলে ম্যাট্রিক দেওয়া যেত না। প্রেমেনের এক বছর ঘাটতি পড়েছে। তার মানে ষোলো কলার এক কলা তখনো বাকি।

ধরে ফেললাম। লক্ষ্য করলাম সমস্ত ক্লাশের মধ্যে সব চেয়ে উজ্জ্বল, সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে অসাধারণ ঐ একটিমাত্র ছাত্র—প্রেমেন্দ্র মিত্র। এক মাথা ঘন কোঁকড়ানো চুল, সামনের দিকটা একটু আঁচড়ে বাকিটা এক কথায় অগ্রাহ্য করে দেওয়া—সুগঠিত দাঁতে সুখস্পর্শ হাসি, আর চোখের দৃষ্টিতে দূরভেদী বুদ্ধির প্রখরতা। এক ঘর ছেলের মধ্যে ঠিক চোখে পড়ার মত। চোখের বাইরে একলা ঘরে হয়তো বা কোনো-কোনো দিন মনে পড়ার মত।

এক সেকশনে পড়েছি বটে কিন্তু কোনো দিন এক বেঞ্চিতে বসিনি। যে কথা-বলার জন্যে বেঞ্চির উপর উঠে দাঁড়াতে হয়, তেমন কোনো দিন কথা হয়নি পাশাপাশি বসে। তবু দূর থেকেই পরস্পরকে আবিষ্কার করলাম।

কিংবা, আসল কথা বলতে গেলে, আমাদের আবিষ্কার করলেন আমাদের বাংলার পণ্ডিত মশাই—নাম রণেন্দ্র গুপ্ত। ইস্কুলের ছাত্রদের মুখ-চলতি নাম রণেন পণ্ডিত।

গায়ের চাদর ডান হাতের বগলের নিচে দিয়ে চালান করে বাঁ কাঁধের উপর ফেলে পাইচারি করে-করে পড়াতেন পণ্ডিত মশাই। অদ্ভুত তাঁর পড়াবার ধরন, আশ্চর্য তাঁর বলবার কায়দা। থমথমে ভারী গলার মিষ্টি আওয়াজ এখনো যেন শুনতে পাচ্ছি।

নিচের দিকে সংস্কৃত পড়াতেন। পড়াতেন ছড়া তৈরি করে। একটা আমার এখনো মনে আছে। ব্যাকরণের সূত্র শেখাবার জন্যে সে ছড়া, কিন্তু সাহিত্যের আসরে তার জায়গা পাওয়া উচিত।

ব্যধ্-যজ্ এদের য-কার গেল
তার বদলে ই,
ই-কার উ-কার দীর্ঘ হল
ঋকারান্ত রি।
শাস্-এর হল শিষ-দেওয়া রোগ
অস্-এর হল ভূ,
স্বপ-সাহেবের সুপ এসেছে
হ্বে সাহেবের হূ।
বহরমপুরের বাদীরা সব
বদমায়েসি ছেড়ে
চন্দ্র পরান দয়াল হরি
সবাই হল উড়ে॥

একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। বাচ্যান্তর শেখাচ্ছেন পণ্ডিত মশাই—কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য। তখন সংস্কৃত ধাতুগুলো কে কি-রকম চেহারা নেবে তারই একটা সরস নির্ঘণ্ট। তার মানে ব্যধ আর যজ-ধাতু য-ফলা বর্জন করে হয়ে দাঁড়াবে বিধ্যতে আর ইজ্যতে। কৃয়তে-মৃয়তে না হয়ে হবে ক্রিয়তে-ম্রিয়তে। তেমনি শিষ্যতে, ভূয়তে, সুপ্যতে, হূয়তে। বহরমপুরের বাদীরাই সব চেয়ে মজার। তারা সংখ্যায় চারজন—বচ, বপ, বদ আর বহ। কর্মবাচ্যে গেলে আর বদমায়েসি থাকবে না, সবাই উড়ে হয়ে যাবে। তার মানে, ব উ হয়ে যাবে। তার মানে উচ্যতে, উপ্যতে, উদ্যতে, উহ্যতে। তেমনি ভাববাচ্যে উক্ত, উপ্ত, উদিত, ঊঢ়। ছিল বক হয়ে দাঁড়াল উচ্চিংড়ে।

বাংলার রচনা-ক্লাশে তিনি অনায়াসে চিহ্নিত করলেন আমাদের দুজনকে। যা লিখে আনি তাই তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন ও আরো লেখবার জন্যে প্রবল প্ররোচনা দেন। একদিন দুঃসাহসে ভর করে তাঁর হাতে আমার কবিতার খাতা তুলে দিলাম। তখনকার দিনে মেয়েদের গান গাওয়া বরদাস্ত হলেও নৃত্য করা গর্হিত ছিল, তেমনি ছাত্রদের বেলায় গদ্যরচনা সহ্য হলেও কবিতা ছিল চরিত্রহানিকর। তা ছাড়া কবিতার বিষয়গুলিও খুব স্বর্গীয় ছিল না, যদিও একটা কবিতা "স্বর্গীয় প্রেম" নিয়ে লিখেছিলাম। কিন্তু পণ্ডিত মশাইর কি আশ্চর্য ঔদার্য! পঙ্গু ছন্দ, অপাঙক্তেয় বিষয়, সঙ্কুচিত কল্পনা—তবু যা একটু পড়েন, তাই বলেন চমৎকার। বলেন, 'লিখে যাও, থেমো না, নিশ্চিতরূপে অবস্থান কর। যা নিশ্চিতরূপে অবস্থান তারই নাম নিষ্ঠা। আর, শোনো—' কাছে ডেকে নিলেন। হিতৈষী আত্মজনের মত বললেন, 'কিন্তু পরীক্ষা কাছে, ভুলো না—'

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় আমি আর প্রেমেন দুজনেই মান রেখেছিলাম পণ্ডিত মশাইর। দুজনেই 'ভি' পেয়েছিলাম।

রাস্তায় এক দিন দেখা পণ্ডিত মশাইর সঙ্গে। কাঁধ চাপড়ে বললেন, 'আমার মান কিন্তু আরো উঁচু। নি-পূর্ব্বক স্থা ধাতু অ—কর্তৃবাচ্যে। মনে থাকে যেন।'

তাঁর কথাটা মনে রেখেছি কিনা আমাদের অগোচরে তিনি লক্ষ্য করে এসেছেন বরাবর। শুনেছি পরবর্তী কালে প্রতি বৎসর নবাগত ছাত্রদের উদ্দেশ করে স্নেহ-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলেছেন—এইখানে বসত প্রেমেন আর ঐখানে অচিন্ত্য।

ম্যাট্রিক পাশ করে প্রেমেন চলে গেল কলকাতায় পড়তে, আমি ভর্তি হলাম ভবানীপুরে। সে সব দিনে ধর্মতলা পেরিয়ে উত্তরে গেলেই ভবানীপুরের লোকেরা তাকে কলকাতায় যাওয়া বলত। হয়তো ঘুরে

এলাম ঝামাপুকুর বা বাদুড়বাগান থেকে, কেউ জিগগেস করলে বলতাম কলকাতায় গিয়েছিলাম।

নন-কোঅপারেশনের বান-ডাকা দিন। আমাদের কলেজের দোতলার বারান্দা থেকে দেশবন্ধুর বাড়ির আঙিনা দেখা যায়—শুধু এক দেয়ালের ব্যবধান। মহাত্মা আছেন, মহম্মদ আলি আছেন, বিপিন পালও আছেন বোধ হয়—তরঙ্গতাড়নে কলেজ প্রায় টলোমলো। কি ধরে যে আঁকড়ে থাকলাম কে জানে, শুনলাম প্রেমেন ভেসে পড়েছে।

ডাঙা পেল প্রায় এক বছর মাটি করে। এবার ভালো ছেলের মত কলকাতায় না গিয়ে ঢুকল পাড়ার কলেজে। সকাল-বিকেলের সঙ্গীকে দুপুরেও পেলাম এবার কাছাকাছি। কিন্তু পরীক্ষার কাছাকাছি হতেই বললে, কী হবে পরীক্ষা দিয়ে। ঢাকায় যাব।

১৯২২-সালে পুরী থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রর চিঠি :

"দুঃখের তপস্যায় সবই অমৃত, পথেও অমৃত, শেষেও অমৃত। সফল হও ভালই, না হও ভালই। আসল কথা সফল হওয়া না-হওয়া নেই—তপস্যা আছে কিনা সেইটেই আসল কথা। সৃষ্টি তো স্থিতির খেয়ালে তৈরী নয়, গতির খেয়ালে। যা পেলুম তাও অহরহ সাধনা দিয়ে রাখতে হয়, নইলে ফেলে যেতে হয়। এখানে কেউ পায় না, পেতে থাকে—সেই পেতে-থাকার অবিরাম তপস্যা করছি কিনা তাই নিয়ে কথা। যাকে পেতে থাকি না সে নেই।...যা পাই তাও ফেলে যাই, গাছ যেই ফুল পায় অমনি ফেলে দিয়ে যায়, তেমনি আবার ফল ফেলে দিয়ে যায় পাওয়া হলেই।...যারা পায় তাদের মতো হতভাগা আর নেই। দুঃখের ভয়ে যারা কঠিন তপস্যা থেকে বিরত হয়ে সহজ পথ খোঁজে আরামের, তাদের আরামই জোটে, আনন্দ নয়।...

আমি পড়াশুনা একদিনও করিনি—পারা যায় না। আমার মত

লোকের পক্ষে পড়ব বল্লেই পড়া অসম্ভব। হয়ত এবার একজামিন দেওয়া হবে না।

তোর প্রেমেন্দ্র মিত্র"

পুরী থেকে লেখা আরেকটা চিঠির টুকরো—সেই ১৯২২-এ:

"সমুদ্রে খুব নাইছি। মাঝে-মাঝে এই প্রাচীন পুরাতন বৃদ্ধ সমুদ্র আমাদের অর্ব্বাচীনতায় চটে গিয়ে একটু আধটু ঝাঁকানি কানমলা দিয়ে দেন—নইলে বেশ নিরীহ দাদামশাইয়ের মত আনমনা!

ঝিনুক কুড়োচ্ছি। পড়াশোনা মোটেই হচ্ছে না—তা কি হয়?"

সে-সব দিনে দুজন লেখক আমাদের অভিভূত করেছিল—গল্পে-উপন্যাসে মণীন্দ্রলাল বসু আর কবিতায় সুধীরকুমার চৌধুরী। কাউকে তখনো চোখে দেখিনি, এবং এঁদেরকে সত্যি-সত্যি চোখে দেখা যায় এও যেন প্রায় অবিশ্বাস্য ছিল। কলেজের এক ছাত্র—নাম হয়তো উষারঞ্জন রায়—আমাদের হঠাৎ একদিন বিষম চমকে দিলে। বলে কিনা, সে সুধীর চৌধুরীর বাড়িতে থাকে, আর, শুধু এক বাড়িতেই নয়, একই ঘরে, পাশাপাশি তক্তপোশে! যদি যাই তো দুপুরবেলা সেই ঘরে ঢুকে বাক্স ঘেঁটে সুধীর চৌধুরীর কবিতার খাতা আমরা দেখে আসতে পারি।

বিনাবাক্যব্যয়ে দুজনে রওনা হলাম দুপুরবেলা। সুধীর চৌধুরী তখন রমেশ মিত্র রোডে এক একতলা বাড়িতে থাকেন—তখন হয়তো রাস্তার নাম পাকাপাকি রমেশ মিত্র রোড হয়নি—আমরা তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁর ডালা-খোলা বাক্স হাটকে কবিতার খাতা বার করলাম। ছাপার অক্ষরে যাঁর কবিতা পড়ি স্বহস্তাক্ষরে তাঁর কবিতা দেখব তার স্বাদটা শুধু তীব্রতর নয়, মহত্তর মনে হল। হাতাহাতি করে অনেকগুলি খাতা থেকে অনেকগুলি কবিতা পড়ে ফেললাম দুজনে। একটা কবিতা ছিল "বিদ্রোহী" বলে। বোধ হয় নজরুল ইসলামের

পালটা জবাব। একটা লাইন এখনও মনে আছে—"আমার বিদ্রোহ হবে প্রণামের মত।" গভীর উপলব্ধি ও নিঃশেষ আত্মনিবেদনের মধ্যেও যে বিদ্রোহ থাকতে পারে—তারই শান্ত স্বীকৃতির মত কথাটা।

কবিতার চেয়েও বেশি মুগ্ধ করল কবিতার খাতাগুলির চেহারা। ষোলপেজী ডবল ডিমাই সাইজের বইয়ের মত দেখতে। মনে আছে পরদিনই দুইজনে ঐ আকৃতির খাতা কিনে ফেললাম।

১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে বটতলা বাড়ি, পাথরচাপতি, মধুপুর থেকে প্রেমেন আমাকে যে চিঠি লেখে তা এই :

"অচিন, তবু মনে হয় 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।' তারা মিথ্যা বলেনি সেই সত্যের সাধকেরা, ঋষিরা। আনন্দে পৃথিবীর গায়ে প্রাণের রোমাঞ্চ হচ্ছে, আনন্দে মৃত্যু হচ্ছে, আনন্দে কান্না আনন্দে আঘাত সইছে নিখিলভুবন। নিখিলের সত্য হচ্ছে চলা, প্রাণ হচ্ছে দুরন্ত নদী—সে অস্থির, সে আপনার আনন্দের বেগে অস্থির। আনন্দভরে সে স্থির থাকতে পারে না—প্রথম প্রেমের স্বাদ-পাওয়া কিশোরী। সে আঘাত যেচে খেয়ে নিজের আনন্দকে অনুভব করে। ভগবানও ওই আনন্দভরে স্থির থাকতে পারেননি, তাই সেই বিরাট আনন্দময় নিখিলভুবনে নেচে কুঁদে খেলায় মেতেছেন। সে কি দুরন্তপনা! অবাধ্য শিশুর দুরন্তপনায় তারই আভাস।

মানুষ যে বড্ড বড়, সে যে ধারণাতীত—সে যে সুধীর চৌধুরী যা বলতে গিয়ে বলতে না পেরে বলে ফেল্লে—'ভয়ঙ্কর'—তাই। তাই তার সব ভয়ঙ্কর, তার আনন্দ ভয়ঙ্কর, তার দুঃখ ভয়ঙ্কর, তার ত্যাগ ভয়ঙ্কর, তার অহঙ্কার ভয়ঙ্কর, তার স্খলন ভয়ঙ্কর, তার সাধনা ভয়ঙ্কর। তাই একবার বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যাই যখন তার সাধনার দিকে তাকাই, তার আনন্দের দিকে তাকাই। আবার ভয়ে বুক দমে

যায় যখন তার দুঃখের দিকে তাকাই, তার স্খলনের দিকে তাকাই। আর শেষকালে কিছু বুঝতে না পেরে বলি—ধন্য ধন্য ধন্য।

কাল এখানে চমৎকার জ্যোৎস্নারাত ছিল। সে বর্ণনা করা যায় না। মনের মধ্যে সে একটা অনুভূতি শুধু। ভগবানের বীণায় নব নব সুর বাজছে—কালকের জ্যোৎস্নারাতের সুর বাজছিল আমার প্রাণের তারে, তার সাড়া পাচ্ছিলুম। তারাগুলো আকাশে ঠিক মনে হচ্ছিল সুরের ফিনকি আর পথটা তন্দ্রা, পাতলা তন্দ্রা, আকাশটা স্বপ্ন। এক মুহূর্ত্তে মনের ভেতর দিয়ে সুরের ঝিলিক হেনে দিয়ে গেল, বুঝলুম, ভয় মিথ্যা হতাশা মিথ্যা মৃত্যু মিথ্যা। কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে হবে, প্রমাণ করতে হবে আমার জীবন দিয়ে। বলেছিলুম প্রিয়া অচেনা, আজ দেখছি আমি যে আমার অচেনা। প্রিয়া যে আমিই। এক অচেনা দেহে, আর এক অচেনা দেহের বাইরে। স্থূল জগতে একদিন আদিপ্রাণ—protoplasm—নিজেকে দুভাগ করেছিল। সেই দুভাগই যে আমরা। আমরা কি ভিন্ন? আমি পৃথিবী, প্রিয়া আকাশ—আমরা যে এক। এই এককে আমায় চিনতে হবে আমার নিজের মাঝে আর তার মাঝে। এই চেনার সাধনা অন্তহীন তপস্যা হচ্ছে মানুষের। সেই চেনার কি আর শেষ আছে? একদিন জানতুম আমি রক্তমাংসের মানুষ, ক্ষুধাতৃষ্ণা-ভরা আর প্রিয়া দেহসুখের উপাদান—তারপর চিনছি আর চিনছি। আজ চিনতে চিনতে কোথায় এসে পৌঁছেছি, তবু কি আনন্দের শেষ আছে! আমার আমি কি অপরূপ, কি বিস্ময়কর! এই চেনার পথে কত রৌদ্র কত ছায়া কত ঝড় কত বৃষ্টি কত সমুদ্র কত নদী কত পর্বত কত অরণ্য কত বাধা কত বিঘ্ন কত বিপথ কত অপথ।

থামিসনি কোনোদিন থামিসনি। থামব না আমরা, কিছুতেই না। ভয় মানে থামা হতাশা মানে থামা অবিশ্বাস মানে থামা ক্ষুদ্র বিশ্বাস মানেও থামা। দেহের ডিঙা যদি তুফানে ভেঙে যায় গুঁড়িয়ে যায়,

গেল তো গেল—'হালের কাছে মাঝি আছে।' যৌবনটা হচ্ছে রাত্রি, তখন আমার পৃথিবী অন্ধকারে ঢেকে যায়, শুধু থাকে প্রিয়ার আকাশ—যেটুকু আলো পড়ে, কখনো তারার কখনো জ্যোৎস্নার, আমার পৃথিবীর ওপর শুধু সেইটুকু। তোর সেই জীবনের রাত্রি এসেছে, কিন্তু এসেছে ঘোর ঘনঘটা করে, নিবিড় অন্ধকার করে—তা হোক, বিচিত্র পৃথিবী। বিচিত্র জীবনের কাহিনী। শুধু মনের মধ্যে মন্ত্র হোক—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত।' যদি কেউ ঐশ্বর্য নিয়ে সুখী হয় হোক, ক্ষুদ্র শান্তি নিয়ে সুখী হয় হতে দাও, আমরা জানি 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।' অতএব 'ভূমৈব জিজ্ঞাসিতব্য।' সেই ভূমার খোঁজে যেন আমরা না নিরস্ত হই। আর যৌবনকে বলি, 'বয়সের এই মায়াজালের বাঁধনখানা তোরে হবে খণ্ডিতে।'"

এর কদিন পরেই আরেকটা চিঠি এল প্রেমেনের সেই মধুপুর থেকে :

"হ্যাঁ, আরেকটা খবর আছে। এখানে এসে একটা কবিতার শেষ পূরণ করেছি আর চারটে নতুন কবিতা লিখেছি। তোকে দেখাতে ইচ্ছে করছে। শেষেরটার আরম্ভ হচ্ছে 'নমো নমো নমো।' মনের মধ্যে একটা বিরাট ভাবের উদয় হয়েছিল, কিন্তু সব ভাষা ওই গুরু-গম্ভীর 'নমো নমো নমো'-র মধ্যে এমন একাকার হয়ে গেল যে কবিতাটা বাড়তেই পেল না। কবিতার সমস্ত কথা ওই 'নমো নমো নামো'-র মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে রইল। কি রকম কবিতা লিখছিস ?"

তিন

তেরো-শ একত্রিশ সালের পয়লা জ্যৈষ্ঠ আমি প্রেমেন আর আমাদের দুটি সাহিত্যিক বন্ধু মিলে একটা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলাম। তার নাম হল "আভ্যুদয়িক"। আর বন্ধু দুটির নাম শিশিরচন্দ্র বসু আর বিনয় চক্রবর্তী।

যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে। অভিভাবক ছাড়া আলাদা একটা ঘরে জন কয়েক বন্ধু মিলে মনের সুখে সাহিত্যিকগিরির আখড়াই দেওয়া। সেই গল্প-কবিতা পড়া, সেই পরস্পরের পিঠ চুলকোনো। সেই চা, সিগারেট, আর সর্বশেষে একটা মাসিক পত্রিকা ছাপাবার রঙিন জল্পনাকল্পনা। আর, সেই মাসিক পত্রিকা যে কী নিদারুণ বেগে চলবে মুখে মুখে তার নির্ভুল হিসেব করে ফেলা। অর্থাৎ দুয়ে-দুয়ে চার না করে বাইশ করে ফেলা।

তখনকার দিনে আমাদের এই চারজনের বন্ধুত্ব একটা দেখবার মত জিনিস ছিল। রোজ সন্ধ্যায় একসঙ্গে বেড়াতে যেতাম হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল বা উডবার্ন পার্কে, নয়তো মিণ্টো স্কোয়ারে মালীকে চার আনা পয়সা দিয়ে নৌকো বাইতাম। কোনো দিন বা চলে যেতাম প্রিনসেপ ঘাট, নয়তো ইডেন গার্ডেন। একবার মনে আছে, স্টিমারে করে রাজগঞ্জে গিয়ে, সেখান থেকে আন্দুল পর্যন্ত পায়ে হাঁটা প্রতিযোগিতা করেছিলাম চারজন। আমাদের দলে তখন মাঝে-মাঝে আরো একটি ছেলে আসত। তার নাম রমেশচন্দ্র দাস। কালে ভদ্রে আরো একজন। তার নাম সুনির্মল বসু। "বলিয়া গেছেন তাই মহাকবি মাইকেল, যেওনা যেওনা সেথা যেথা চলে সাইকেল।" মনোহরণ শিশু-কবিতা লিখে এরি মধ্যে সে বনেদী পত্রিকায় প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে।

শিশির আর বিনয়ের সাহিত্যে বিশেষ প্রতিশ্রুতি ছিল। বিনয়ের কটি ছোট গল্প বেরিয়েছিল "ভারতী"তে, তাতে দস্তুরমতো ভালো লেখকের স্বাক্ষর আঁকা। শিশির বেশির ভাগ লিখত "মৌচাকে," তাতেও ছিল নতুন কোণ থেকে দেখবার উঁকিঝুঁকি। আমরা চার জন মিলে একটা সংযুক্ত উপন্যাসও আরম্ভ করেছিলাম। নাম হয়েছিল "চতুষ্কোণ"। অবিশ্যি সেটা শেষ হয় নি, শিশির আর বিনয় কখন কোন ফাঁকে কেটে পড়ল কে জানে। সেই একত্র উপন্যাস লেখার পরিকল্পনাটা আমি আর প্রেমেন পরে সম্পূর্ণ করলাম আমাদের প্রথম বই "বাঁকালেখা"য়। জীবনের লেখা যে লেখে সে সোজা লিখতে শেখেনি এই ছিল সেই বইয়ের মূল কথা।

"আভ্যুদয়িকে"র বৈঠক বসত রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। ভালো ঘর পাইনি কিন্তু ভালো সঙ্গ পেয়েছি এতেই সকল অভাব পুষিয়ে যেত। আড্ডায় প্রথম চিড় খেল প্রেমেন ঢাকায় চলে গেলে। সেখানে গিয়ে সে "আভ্যুদয়িকে"র শাখা খুললে, শুভেচ্ছা পাঠাল এখানকার আভ্যুদয়িকদিগের :

"আভ্যুদয়িকগণ, আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ঢাকায় এসেও আপনাদের ভুলতে পারছি না। আজ বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যায় সেই ছোট ঘরটিতে যখন জলসা জমে উঠবে তখন আমি এখানে বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলব বই আর কি করব? ঢাকার আকাশ আজকাল সর্ব্বদাই মেঘে ঢাকা, তবু কবিতার কলাপ বিকশিত হয়ে উঠছে না। আপনাদের আকাশের রূপ এখন কেমন? কোন কবির হৃদয় আজ উতলা হয়ে উঠেছে আপনাদের মাঝে, প্রথম শ্রাবণের কাজল-পিছল (দোহাই তোমার অচিন্ত্য, চুরিটা মাফ কোরো) চোখের কটাক্ষে? কার "বাদল-প্রিয়া" এল মেঘলা আকাশের আড়াল দিয়ে হৃদয়ের গোপন অন্তঃপুরে, গোপন অভিসারে?

এখানে কিন্তু "এ ভরা বাদর, মাহ—ভাদর নয়, শাওন, শূন্য মন্দির মোর।" কেউ আপনারা পারেন নাকি মন্দাক্রান্তা ছন্দে দুলিয়ে এই শ্রাবণ-আকাশের পথে মেঘদূত পাঠাতে? কিন্তু ভুলে যাবেন না যেন যে আমি যক্ষপ্রিয়া নই।

দূর থেকে এই 'আভ্যুদয়িকে'র নমস্কার গ্রহণ করুন। আর একবার বলি সেই প্রাচীন বৈদিক যুগের সুরে—"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম—"

আমরা যে যেখানেই থাকি না, আমরা আভ্যুদয়িক।"

এই সময়কার প্রেমেনের তিনখানা চিঠি—ঢাকা থেকে লেখা:

"অচিন,

আজকালকার প্রেমের একটা গল্প শোন।

সে ছিল একটি মেয়ে, কিশোরী—তনু তার তনুলতা, চোখের কোণে চঞ্চলতাও ছিল, আর তাদের বাড়ীর ছিল দোতলা কিম্বা তেতলায় একটা ছাদ। অবশ্য লাগাও আর একটা ছাদও ছিল। মেয়েটির নাম অতি মিষ্টি কিছু ঠাউরে নে—ভাষায় বললে তার মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে যাবে। কৈশোরের স্বপ্ন তার সমস্ত তনুবল্লরীকে জড়িয়ে আছে, ফুটন্ত হাস্নাহানায় চাঁদের আলোর মত। সে কাজ করে না, কিচ্ছু করে না—শুধু তার পিয়াসী আঁখি কোন সুদূরে কি খুঁজে বেড়ায়। একদিন ঠিক দুপুর বেলা, রোদ চড়চড় করছে অর্থাৎ রুদ্রের অগ্নিনেত্রের দৃষ্টির তলে পৃথিবী মূর্চ্ছিত হয়ে আছে—সে ভুল করে তার নীলাম্বরী শাড়ীখানি শুকোতে দিতে ছাদে উঠেছিল। হঠাৎ তার দূরাগত-পথ-চাওয়া আঁখির দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। ওগো জন্মজন্মান্তরের হৃদয়দেবতা, তোমায় পলকের দৃষ্টিতেই চিনেছি—এইরকম একটা ভাব। হৃদয়দেবতাও তখন লম্বা চুলে টেড়ি কাটছিলেন, সামনেই দেখলেন তীব্র জ্বালাময় আকাশের নীচে স্নিগ্ধ আষাঢ়ের পথহারা মেঘের মত কিশোরীটিকে। আর্শির রোদ

ঘুরিয়ে ফেললেন তার মুখে তৎক্ষণাৎ। "ওগো আলোকের দূত এলো তোমার হৃদয় হতে আমার হৃদয়ে।" মেয়েটি একটু হাসলে যেন দূর মেঘের কোলে একটু শীর্ণ চিকুর খেলে গেল। প্রেম হল। কিন্তু পালা এইখানেই সাঙ্গ হল না। আলোকের দূত যাতায়াত করতে লাগল। লোষ্ট্রবাহন লিপিকা তারপর। একদিন লোষ্ট্রবাহন লিপিকা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে হৃদয়দেবতার স্থূল দেহের কপাল নামক অংশবিশেষকে আঘাত করে রক্ত বার করে দিলে ও কালশিরে পড়িয়ে দিলে। হৃদয়দেবতা লিখলেন, 'তোমার কাছ থেকে এ দান আমার চরম পুরস্কার। এই কালো দাগ আমার প্রিয়ার হাতের স্পর্শ, এ আমার জীবন পথের পাথেয়। তোমার হাতে যা পাই তাইতেই আমার আনন্দ।' অবশ্য প্রিয়ার হাতের স্পর্শ ও জীবন পথের পাথেয়র ওপর টিঙ্কচার আয়োডিন লাগাতে কোন দোষ নেই। জীবনদেবতা তাই লাগাতেন। এবং বাড়ীর লোক কারণ জিজ্ঞাসা কল্লে একটা অতি কাব্যগন্ধহীন স্থূল বিশ্রী মিথ্যা বলতে দ্বিধা করেন নি, যথা—'খেলতে গিয়ে ইটে আছাড় খেয়েছি।'

ওই পর্য্যন্ত লিখে নাইতে খেতে গেছলুম। আবার লিখছি। এখানে সাহিত্য জগতের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রাখবার সুযোগ নেই। লেখা তো একেবারেই বন্ধ। My Muse is mute. কোন কালে আর সে মুখ খুলবে কিনা জানি না। মাথাটায় এখন ভারী গোলমাল। মাথা স্থির না হলে ভালো আর্ট বেরোয় না, কিন্তু আমার মাথায় ঘূর্ণি চলেছে। শরীর ভালো নয়। বিনয় আর রমেশের ঠিকানা জানি না, পাঠিয়ে দিস।

খানিক আগে কটা প্রজাপতি খেলছিল নীচের ঘাসের জমিটুকুর ওপরে। আমার মনে হল পৃথিবীতে যা সৌন্দর্য্য প্রতি পলকে জাগছে, এ পর্যন্ত যত কবি ভাষার দোলনা দোলালে তারা তার সামান্যই ধরতে

পেয়েছে—অমৃত-সাগরের এক অঞ্জলি জল, কেউ বা এক ফোঁটা। আমরা সাধারণ মানুষ এই সৌন্দর্য্যের পাশ দিয়ে চলাচল করি, আর কেউ বা দাঁড়িয়ে এক অঞ্জলি তুলে নেয়। কিন্তু কিছুই হয়নি এখন। হয়ত এমন কাল আসছে যার কাব্যের কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তারা এই মাটির গানই গাইবে, এই সবুজ ঘাসের এই মেঘলা দিনের কিম্বা এই ঝড়ের রাতের—কিন্তু যে সূক্ষ্মতম সুর যে পরম ব্যঞ্জনা আমরা ধরতেও পারি নি তারা তাকেই মূর্ত্ত করবে। আমি ভাবতে চেষ্টা কচ্ছি তখন নারীর ভেতর মানুষ কি খুঁজে পাবে। মানুষ দেহের আনন্দ নারীর ভেতর খুঁজতে খুঁজতে আজ এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে—সেদিন যেখানে গিয়ে পৌঁছাবে তার আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু আছে সৃষ্টির অন্তরে অনন্ত অমৃতের পথ—তার কোথায় আজ আমরা? চাই অমৃতের জন্যে তপস্যা। মানুষ ড্রেডনটই তৈরী করুক আর ওয়ারলেসই চালাক এ শুধু বাইরের—ভেতরের সাধনা তার অমৃতের জন্যে।"[৮]

"কিন্তু আসল কথা কি জানিস অচিন, ভালো লাগে না—সত্যি ভালো লাগে না।....বন্ধুর প্রেমে আনন্দ নেই, নারীর মুখেও আনন্দ নেই, নিখিল বিশ্বে প্রাণের সমারোহ চলেছে তাতেও পাই না কোনো আনন্দ। কিন্তু একদিন বোধ হয় পৃথিবীর আনন্দসভায় আমার আসন ছিল—অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে আকাশের পানে চাইলে মনে হত, সমস্ত দেহ-মন যেন নক্ষত্রলোকের অভিনন্দন পান করছে—অপরূপ তার ভাষা। বুঝতে পারতুম আমার দেহের মধ্যে অমনি অপূর্ব্ব রহস্য অনাদি অনন্ত আকাশের ভাষায় সাড়া দিচ্ছে। আজকাল মাঝে মাঝে জোর করেই সেই আসনটুকু অধিকার করতে যাই কিন্তু বৃথাই। ভালো লাগে না, ভালো লাগে না। আশ্চর্য্য হয়েই ভাবি এই দেহটার মাল মশলা সবই প্রায় তেমনি আছে। হৃৎপিণ্ড তেমনই নাচছে,

শিরায় শিরায় রক্ত ছুটছে, ফুস্‌ফুস্‌ থেকে নিংড়ে নিংড়ে রক্ত বেরুচ্ছে। খাড়া হয়ে হাঁটি, গলা থেকে তেমনি স্বর বেরোয়। এই সেই দেবতার দেহটা এমন হল কেন? আর সে বাজে না। নিখিল-দেবতার এই যে দেহ সে নিখিল-দেবতাকেই এমন করে ব্যঙ্গ করে কেন?·· এখানে ধারাশ্রাবণ, কিন্তু শ্রাবণ-ঘন-গহন মোহে কারুর গোপন চরণ-ফেলা টের পাই না। বৃষ্টিতে দেশ ভেসে গেল কিন্তু আমার প্রাণে তার দৃষ্টি পড়ল না। কেবল শুকনো তৃষ্ণার্ত্ত মাটি—নিস্পন্দ নির্জীব। বর্ষার নৃত্যসভার গান শোনবার জন্যে দেখছি মাটি পাথর মরু ফুঁড়ে কোণে-কোণে আনাচে-কানাচে পৃথিবীর স্থানে-অস্থানে নব নব প্রাণ মাথা তুলে উঁকি মারছে, কিন্তু আমার জীবনের নবাঙ্কুর শুকিয়ে মরে আছে। আমার মাটি সরস হল না। সেদিন রাত্রে শ্রাবণের সারঙে একটা সুর বাজছিল, সুরটা আমার বহুদিনকার পরিচিত। ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম, আশা হচ্ছিল হয়তো পুরোনো বর্ষারাত্রির আনন্দকে ফিরে পাব। কিন্তু হায়, বৃষ্টি শুধু বৃষ্টি, অন্ধকার আকাশ শুধু অন্ধকার আকাশ। এই বৃষ্টি পড়াকে ব্যাখ্যা করতে পারি অনুভব করতে পারি ইন্দ্রিয় দিয়ে কিন্তু অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি না। তাই মেঘের জল শুধু ঝরতে লাগল, আমার হৃদয় সাড়া দিলে না।

সত্যি নিজেকে আর চিনতে পারি না। তোদের যে প্রেমেন বন্ধু ছিল তাকে আমার মধ্যে খুঁজে খুঁজে পাই না। মনে হয় গাছের যে ডালপালা একদিন দুবাহু মেলে আকাশ আর আলোর জন্যে তপস্যা করত, যার লোভ ছিল আকাশের নক্ষত্র, সে ডালপালা আজ যেন কে কেটেকুটে ছারখার করে দিয়েছে। শুধু অন্ধকার মাটির জীবন্মৃত গাছের মূলগুলো হাতড়ে-হাতড়ে অন্বেষণ করছে শুধু খাবার, মাটি আর কাদা, শুধু বেঁচে থাকা—কেঁচোর মত বেঁচে থাকা। এ প্রেমেন তোদের বন্ধু ছিল না বোধ হয়!

বাতি নিবে গেছে। হৃদয়ের বিষাক্তবাতাসে সে কতক্ষণ বাঁচতে পারে? "যে প্রদীপ আলো দেয় তাহে ফেল শ্বাস।"

মানুষের দিকে তাকিয়ে আজকাল কি দেখতে পাই জানিস? সেই আদিম পাশব ক্ষুধা—হিংসা, বিষ, আর স্বার্থপরতা। চোখের বাতায়ন দিয়ে শুধু দেখতে পাই সুসভ্য মানুষের অন্তরে আদিম পশু ওৎ পেতে আছে। যে চোখ দিয়ে মানুষের মাঝে দেবতাকে দেখতুম সেটা আজ অন্ধপ্রায়। আমার যেন আজকাল ধারণা হয়েছে এই যে, লোকে বন্ধুকে ভালবাসে এটা নেহাৎ মিথ্যে—মানুষ নিজেকেই ভালবাসে। যে বন্ধুর কাছে অর্থাৎ যে মানুষের কাছে সেই নিজেকে ভালবাসার অহঙ্কারটা চরিতার্থ হয়, অর্থাৎ যার কাছ থেকে সে নিজের আত্মম্ভরিতার খোরাক পায় তাকেই সে ভালবাসে মনে করে। দরকার মানুষের শুধু নিজেকে, শুধু নিজেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে সে অহঙ্কার চরিতার্থ করতে চায়। বন্ধু হচ্ছে মাত্র সেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখবার আর্শি। ওই জন্যেই তাকে ভালবাসা। যে আর্শি থেকে নিজেকে সব চেয়ে ভাল দেখায় তাকেই বলি সব চেয়ে বড় বন্ধু। বন্ধুর জন্যে বন্ধুকে মানুষ ভালবাসে না—ওটা মিথ্যা কথা—মানুষ নিজের জন্যে বন্ধুকে ভালবাসে। শুধু স্বার্থ, শুধু স্বার্থ। তাই নয় কি?

আচ্ছা অচিন্ত্য, পড়েছিস তো, 'এতদিনে জানলেম যে কাঁদন কাঁদলেম সে কাহার জন্য?' পেরেছিস কি জানতে? সে কি প্রিয়া? সে প্রিয়াকে পাব কি মেয়েমানুষের মধ্যে? কিন্তু কই? যার জন্যে জীবনভরা এই বিরাট ব্যাকুলতা সে কি ওইটুকু? দিনরাত্রি আকাশ-পৃথিবী ছাড়িয়ে গেল যার বিরহের কান্নায় সে কি ওই চপল ক্ষুদ্র ক্ষুধায় ভরা প্রাণীটা? যাকে নিঃশেষ করে সমস্ত জীবন বিলিয়ে দিতে চাই, যার জন্যে এই জীবনের মৃত্যু-বেদনা-দুঃখ-ভয়-সংকুল পথ বেয়ে চলেছি সে প্রিয়াকে নারীর ভেতর পাই কই ভাই! কার জন্যে কান্না জানি না বটে, কিন্তু

কেন তা তো জানি—এ কথা তো জানি যে এটা দিতে চাওয়ার অশ্রান্ত কান্না। দেব, দেব—মায়ের স্তন যেমন দেবার কান্নায় ব্যথাভরা আনন্দে টলমল করে ওঠে, আমাদের সমস্ত জীবন যে তেমনি ব্যথায় কাঁপছে। কিন্তু কে নেবে ভাই?···কে নেবে ভাই নিঃশেষ করে আমাকে, শিশির প্রভাতের আকাশের মত নিঃস্ব, রিক্ত, শূন্য করে, বাঁশির বেণুর মত নিঃসম্বল করে—কে সে অচিন?"

"কি কথা বলতে চাই বলতে পারছি না। বুকের ভেতর কি কথার ভিড় বন্ধ ঘরে মৃগনাভির তীব্র ঘ্রাণের মত নিবিড় হয়ে উঠেছে, তবু বলতে পারছি না। কত রকমের কত কথা—তার না পাই খেই না পাই ফাঁক! হাস্নাহানার বন্ধ কুঁড়ির মত টনটন করছে সমস্ত প্রাণ—কিন্তু পারছি না বলতে। কাল থেকে কতবার ছন্দে তুলিয়ে দিতে চাইলুম, পারলুম না। ছন্দ দোলে না আর। বোবা বাঁশী যেন আমি, ব্যাকুল সুরের নিশ্বাস শুধু দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—বাজাতে পারছি না। কত কথা ভাই—যদি বলতে পারতুম!

গলসওয়ার্দির Apple Tree পড়ছিলুম—না, পড়ে ফেলেছি আজ দুপুরে। সেই না-জানা আপেল-মঞ্জরীর সুবাস বুঝি এমন উদাস করেছে। তুই সেখানে পাস খুঁজে গলসওয়ার্দির Apple Tree গল্পটা পড়িস। Pan ছাড়া এ রকম love story পড়েছি বলে তো মনে পড়ছে না।

না, শুধু Apple Tree নয় ভাই, এই নতুন শরৎ আমার মনে কি যেন এক নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। মরতে চাই না, কিন্তু মরতে আর ভয়ও পাই না বোধ হয়। যে একদিন অযাচিত জীবন দিয়েছিল সেই আবার কেড়ে নেবে তাতে আর ভয় কিসের ভাই। তবে একটু সকাল-সকাল এই যা। তাতে দুঃখ আছে, ভয়ের তো কিছু দেখি না। আজ পর্য্যন্ত তো

ভাই কোটি-কোটি মানুষ এমনি করে চলে গেছে—এমনি করে নীল আকাশ শিউলি মেঘ সবুজ ঘাস বন্ধুর ভালবাসা ছেড়ে—নিষ্ফল প্রতিবাদে। তবে—? জীবন কেন পেয়েছিলাম তা যখন জানিনা, জানিনা যখন কোন পুণ্যে, তখন হারাবার সময় কৈফিয়ৎ চাইবার কি অধিকার আছে ভাই? খোঁড়া হয়ে জন্মাই নি, অন্ধ হয়ে জন্মাই নি, বিকৃত হয়ে জন্মাইনি—মার কোল পেলাম, বন্ধুর বুক পেলাম, নারীর হৃদয় পেলাম, তা যতটুকু কালের জন্যেই হোক না—আকাশ দেখেছি, সাগরের সঙ্গীত শুনেছি, আমার চোখের সামনে ঋতুর মিছিল গেছে বার বার, অন্ধকারে তারা ফুটেছে, ঝড় হেঁকে গেছে, বৃষ্টি পড়েছে, চিকুর খেলেছে—কত লীলা কত রহস্য কত বিস্ময়! তবে জীবনদেবতাকে কেন না প্রণাম করব ভাই! কেন না বলব ধন্য আমি—নমো নমো হে জীবনদেবতা!

যা পেয়েছি তার মান কি রাখতে পেরেছি ভাই? কত অবহেলা কত অপচয় কত অপমান না করলুম! এখনো হয়তো করছি। তাই তো কেড়ে নেবে বলে জোর করে তাকে ভর্ৎসনা করতে পারি না। জানি তুলনা করে তাকে দোষ দিয়েছি কতবার, কিন্তু কি সে যে ভুল ভাই—তার খুশির দান তাতে আমার কি বলবার আছে? কারুর গলায় হয়তো সে বেশী গান দিলে, কাউকে প্রাণ বেশী, কাউকে সে সাজিয়ে পাঠালে, কাউকে না—আমায়ও তো সে রিক্ত করে জাগায়নি।

তাই ভাবি যখন যাব তখন ভয় কেন? এখনও শিরায় জোয়ার ভাঁটা চলছে, স্নায়ুতে সাড়া আছে, তবে চোখ বুজে মাথা গুঁজে পড়ব কেন? যেমন অজান্তে এসেছিলাম তেমনি অজান্তে চলে যাব—হয়ত শুধু একটু ব্যথা একটু অন্ধকার একটু যন্ত্রণা। তা হোক। এখন এই নীলাভ নিথর রাত্রি, এই কোমল জ্যোৎস্না, তন্দ্রালস পৃথিবীর গুঞ্জন—সমস্ত প্রাণ দিয়ে পান করি না কেন—এই বাতাসের ক্ষীণ শীতল ছোঁয়া—এই সব।

এমনি সুন্দর শরতের প্রভাতে নিষ্কলঙ্ক শিশিরের মত না একদিন

এসেছিলাম অপরূপ এই নিখিলে। কত বিস্ময় সে সাজিয়েছে, কত আয়োজন কত প্রাচুর্য্য। কত আনন্দই না দেখলাম। হ্যাঁ, দুঃখও দেখেছি বটে, দেখেছি বটে কদর্য্যতা। মার চোখের জল দেখেছি, গলিত কুষ্ঠ দেখেছি, দেখেছি লোভের নিষ্ঠুরতা, অপমানিতের ভীরুতা, লালসার জঘন্য বীভৎসতা, নারীর ব্যভিচার, মানুষের হিংসা, কদাকার অহঙ্কার, উন্মাদ, বিকলাঙ্গ, রুগ্ন—গলিত শব। তবু—। তবু তুলনা হয় না বুঝি!

এই যে জাপানের এতগুলো প্রাণ নিয়ে একটা অন্ধ শক্তি নির্ম্মম খেলাটা খেললে—এ দেখেও আবার যখন শান্ত সন্ধ্যায় ঝাপসা নদীর ওপর দিয়ে মন্থর না-খানি যেতে দেখি স্বপ্নের মত পাল তুলে, যখন দেখি পথের কোল পর্য্যন্ত তরুণ নির্ভয় ঘাসের মঞ্জি এগিয়ে এসেছে, দুপুরের অলস প্রহরে সামনের মাঠটুকুতে শালিকের চলাফেরা দেখি, তখন বিশ্বাস হয় না আমার মত না নিয়ে আমায় এই দুঃখভরা জগতে আনা তার নিষ্ঠুরতা হয়েছে।

একটা ছোট্ট, অতি ছোট্ট পোকা—একটা পাইকা অক্ষরের চেয়ে বড় হবে না—আমার বইয়ের পাতার উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে পাখা দুটি ছড়িয়ে—কি, আশ্চর্য্য নয়? এইবারের পৃথিবীতে এই জীবনের পরিচিতদের মধ্যে ও-ও একজন। ওকেও যেতে হবে। আমাকেও।

কিন্তু এমন অপরূপ জীবন কেনই বা সে দেয়, কেনই বা কেড়ে নেয় কিছু বুঝতে পারি না—শুধু এইটুকুই বিরাট সংশয় রয়ে গেল। যদি এমন নিঃশেষ করে নিশ্চিহ্ন করে মুছেই দেবে তবে এমন অপরূপ করে বিস্ময়েরও অতীত করে দিলে কেন? কেন কে বলতে পারে? এত আশা এত বিশ্বাস এত প্রেম এত সৌন্দর্য্য—আমার জগতের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকবে না—কোনো অনাগত কালের তৃণের রস জোগাবে হয়ত আমার দেহের মাটি—অনাগত মানুষের নীলাকাশতলে তাদের রৌদ্রে তাদের বাতাসে তাদের ঝড়ে তাদের বর্ষায় থাকব ধূলা হয়ে বাষ্প হয়ে।

প্রীতি-বিনিময় তোর সাথে আমার, দুদিনের জীবনবুদ্বুদের সঙ্গে দুদিনের জীবনবুদ্বুদের। তবু জয়তু জীবন জয়, জয় জয় সৃষ্টি—"

কুস্তি করে সারা গায়ে মাথায় ধুলো মাটি মাখা—কাপড়ের খুঁটটা শুধু গায়ের উপর মেলে দেওয়া—সকালবেলা ভবানীপুরের নির্জন রাস্তা ধরে বাঁশের আড়বাঁশি বাজিয়ে ঘুরে বেড়াত কে একজন। কোন নিপুণ ভাস্কর্যের প্রতিমূর্তি তার শরীর, সবল, সুঠাম, সুতনু। বলশালিতা ও লাবণ্যের আশ্চর্য সমন্বয়। সে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের যে একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর হবে, যৌবনের প্রারম্ভেই তার নিজের দেহে তার নির্ভুল আভাস এনেছে। ব্যায়ামে বলসাধনে নিজের দেহকে নির্মাণ করেছে গঠনগৌরবদৃপ্ত, সর্বসঙ্গত করে।

ইস্কুলে যে-বছর প্রেমেনকে গিয়ে ধরি সেই বছরই দেবীপ্রসাদ বেরিয়ে গেছে চৌকাট ডিঙিয়ে। কিন্তু ভবানীপুরের রাস্তায় ধরতে তাকে দেরি হল না। শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট ও চৌরাঙ্গীর মোড়ের জায়গাটাতে তখন একটা একজিবিশন হচ্ছে। জায়গাটার হারানো নাম পোড়াবাজার। নামের জন্যেই একজিবিশনটা শেষ পর্যন্ত পুড়ে গিয়েছিল কিনা কে বলবে। একদিন সেই একজিবিশনে দেবীপ্রসাদের সঙ্গে দেখা—একটি সুবেশ সুন্দর ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইছে। ভদ্রলোক চলে গেলে জিগগেস করলাম, কে ইনি? দেবীপ্রসাদ বললে, মণীন্দ্রলাল বসু।

এই সেই? ভিড়ের মধ্যে তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম। কোথাও দেখা পেলাম না। এর কত বছর পর মণীন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা। "কল্লোল" যখন খুব জমজমাট তখন তিনি ইউরোপে। তারপর "কল্লোল" বার হবার বছর পাঁচেক পরে "বিচিত্রা"য় যখন সাব-এডিটরি করি তখন ভিয়েনা থেকে লেখা তাঁর ভ্রমণকাহিনীর প্রুফ দেখেছি।

"আভ্যুদয়িক" উঠে গেল। তার সব চেয়ে বড় কারণ হাতের কাছে

"কল্লোল" পেয়ে গেলাম। যা চেয়েছিলাম হয়তো, তৈরি কাগজ আর জমকালো আড্ডা। সে সব কথা পরে আসছে।

একদিন দু'জনে, আমি আর প্রেমেন, সকালবেলা হরিশ মুখার্জি রোড ধরে যাচ্ছি, দেখি কয়েক রাশি সামনে গোকুল নাগ যাচ্ছে, সঙ্গে দুইজন ভদ্রলোক। লম্বা চুল ও হাতে লাঠি গোকুলকে চিনতে দেরি হয় না কখনো।

বললাম, 'ঐ গোকুল নাগ। ডাকি।'

'না, না, দরকার নেই।' প্রেমেন বারণ করতে লাগল।

কে ধার ধারে ভদ্রতার! "গোকুলবাবু" "গোকুলবাবু" বলে রাস্তার মাঝেই উচ্চস্বরে ডেকে উঠলাম। ফিরল গোকুল আর তার দুই সঙ্গী।

প্রেমেনের তখন দুটি গল্প বেরিয়ে গেছে "প্রবাসী"তে—"শুধু কেরাণী" আর "গোপনচারিণী"। আর, সেই দুটি গল্প বাংলা সাহিত্যের গুমোটে সজীব বসন্তের হাওয়া এনে দিয়েছে। এক গল্পেই প্রেমেনকে তখন একবাক্যে চিনে ফেলার মত।

পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হল। কিন্তু গোকুলের সঙ্গে ঐ দুজন সুচারুদর্শন ভদ্রলোক কে?

একজন ধীরাজ ভট্টাচার্য।

আরেকজন?

ইনি শৈলজা মুখোপাধ্যায়।

সানন্দবিস্ময়ে তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে। বাংলা সাহিত্যে ইনিই সেই কয়লাকুঠির আবিষ্কর্তা? নিঃস্ব রিক্ত বঞ্চিত জনতার প্রথম প্রতিনিধি? বাংলা সাহিত্যে যিনি নতুন বস্তু নতুন ভাষা নতুন ভঙ্গি এনেছেন? হাতির দাঁতের মিনারচূড়া ছেড়ে যিনি প্রথম নেমে এসেছেন ধূলিম্লান মৃত্তিকার সমতলে?

বিষণ্ণ মমতায় চোখের দৃষ্টিটি কোমল। তখনো শৈলজা 'আনন্দ'

হয়নি, কিন্তু আমাদের দেখে তার চোখ আনন্দে জ্বলে উঠল। যেন এই প্রথম আলাপ হল না, আমরা যেন কত কালের পরিচিত বন্ধু।

'কোথায় যাচ্ছেন?' জিগগেস করলাম গোকুলকে।

'এই রূপনন্দন না রসনন্দন মুখার্জি লেন। মুরলীবাবুর বাড়ি। মুরলীবাবু মানে "সংহতি" পত্রিকার মুরলীধর বসু।'

মনে আছে বাড়িতে মুরলীবাবু নেই—কি করা—গোকুলের লাঠির ডগা দিয়ে বাড়ির সামনেকার কাঁচা মাটিতে সবাই নিজের-নিজের সংক্ষিপ্ত নাম লিখে এলাম। মনে আছে গোকুল লিখেছিল G. C.—তার নামের ইংরিজি আদ্যাক্ষর। সেই নজিরে দীনেশরঞ্জনও ছিলেন D. R.। কিন্তু গোকুলকে সবাই গোকুলই বলত, G.C. নয়, অথচ দীনেশরঞ্জনকে সবাই ডাকত, D.R.। এ শুধু নামের ইংরিজি আদ্যাক্ষর নয়, এ একটি সম্পূর্ণ অর্থান্বিত শব্দ। এর মানে সকলের প্রিয়, সকলের সুহৃৎ, সকলের আত্মীয় দীনেশরঞ্জন।

চার

কাঁচা মাটিতে নামের দাগ কতক্ষণ বেঁচে থাকবে?

গোকুলের পকেট থেকে ভিজিটিং কার্ড বেরুল। কিন্তু তার ওষ্ঠে পৃষ্ঠে-ললাটে নিজেদের নাম লিখি কি দিয়ে? কলম? কারুরই কলম নেই। পেন্সিল? দাঁড়াও, বাড়ির ভিতর থেকে জোগাড় করছি একটা।

পেন্সিল দিয়ে সবাই সেই ভিজিটিং কার্ডের গায়ে নিজের-নিজের নাম লিখে দিলাম। সেই ভিজিটিং কার্ডটি মুরলীদার কাছে এখনো নিটুট আছে।

মুরলীধর বসু ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনের একজন সাদাসিদে সাধারণ ইস্কুল মাস্টার! নিরাড়ম্বর নিরীহ জীবন, হয়তো বা নিম্নগত। এমনিতে উচ্চকিত-উৎসাহিত হবার কিছু নেই। কিন্তু কাছে এসে একটা মহৎ উপলব্ধির আস্বাদ পেলাম। অদম্য কর্ম বা উত্তুঙ্গ চিন্তায় শুধু নয়—আছে সুদূরবিলাসী স্বপ্ন। দীনেশরঞ্জনের মত মুরলীধরও স্বপ্নদর্শী! তাই একজন D. R. আরেকজন মুরলীদা।

একদিকে "কল্লোল", আরেক দিকে "সংহতি"।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, দুটি মাসিক পত্রই একই বছরে একই মাসে এক সঙ্গে জন্ম নেয়। ১৩৩০, বৈশাখ। "কল্লোল" চলে প্রায় সাত বছর, আর "সংহতি" উঠে যায় দু বছর না পুরতেই।

"কল্লোল" বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন। কিন্তু "সংহতি" কি? সংহতি তো শিলীভূত শক্তি। সঙ্ঘ, সমূহ, গণগোষ্ঠী। যে গুণের

জন্যে সমধর্মী পরমাণুসমূহ জমাট বাঁধে, তাই তো সংহতি। আশ্চর্য নাম। আশ্চর্য সেই নামের তাৎপর্য।

এক দিকে বেগ, আরেক দিকে বল। এক দিকে ভাঙন, আরেক দিকে সংগঠন, একীকরণ।

আজকের দিনে অনেকেই হয়তো জানেন না, সেই "সংহতি"ই বাংলা দেশে শ্রমজীবীদের প্রথমতম মুখপত্র, প্রথমতম মাসিক পত্রিকা। সেই ক্ষীণকায় স্বল্পায়ু কাগজটিই গণজয়যাত্রার প্রথম মশালদার। "লাঙল", "গণবাণী" ও "গণশক্তি"—এরা এসেছিল অনেক পরে। "সংহতি"ই অগ্রনায়ক।

এই কাগজের পিছনে এমন একজনের পরিকল্পনা ছিল যাঁর নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখে রাখা উচিত। তিনি জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত। আসলে তিনিই এই কাগজের প্রতিষ্ঠাতা। অমৃতবাজার পত্রিকার ছাপাখানায় কাজ করেন। ঢোকেন ছেলেবয়সে, বেরিয়ে আসেন পঞ্চাশ না পেরোতেই, জরাজর্জর দেহ নিয়ে। দীর্ঘকাল বিষাক্ত টাইপ আর কদর্য কালি ঘেঁটে-ঘেঁটে কঠিন ব্যাধির কবলে পড়েন। কিন্তু তাতেও মন্দা পড়েনি তাঁর উদ্যমে-উৎসাহে, মুছে যায়নি তাঁর ভাবীকালের স্বপ্নদৃষ্টি।

একদিন চলে আসেন বিপিন পালের বাড়িতে। তাঁর ছেলে জ্ঞানাঞ্জন পালের সঙ্গে পরিচয়ের সুতো ধরে।

বিপিন পাল বললেন, 'কি চাই?'

'শ্রমজীবীদের জন্যে বাংলায় একটা মাসিকপত্র বের করতে চাই।'

এমন প্রস্তাব শুনবেন বিপিনচন্দ্র যেন প্রত্যাশা করেন নি। তিনি মেতে উঠলেন। এর কিছুকাল আগে থেকেই তিনি ধনিক-শ্রমিক সমস্যা নিয়ে লেখা আর বলা সুরু করেছেন। ইণ্টারন্যাশন্যাল গ্রুপ-এর ম্যানিফেস্টোর (পৃথিবীর অন্যান্য মনীষীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও রোঁলারও

দ ংং আছে) ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর "World Situation and Ourselves" বক্তৃতায়; ইংরিজিতে প্রবন্ধ লিখেছেন মানুষের বাঁচবার অধিকার—"Right to Live" নিয়ে। তিনি বলে উঠলেন: 'নিশ্চয়ই। এই দণ্ডে বের করুন, আর কাগজের নাম দিন "সংহতি"।'

কিন্তু কাগজ কি চলবে?

কেন চলবে না? জিতেনবাবু কলকাতার প্রেস-কর্মচারী সমিতির উদ্যোক্তা, সেই সম্পর্কে তাঁর সহকর্মী আর সহ-সদস্যেরা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে, কাগজ বের হওয়া মাত্রই বেশ কিছু গ্রাহক আর বিজ্ঞাপন জুটিয়ে আনবে। সকলে মিলে রথের রশিতে টান দেব, ঠিক চলে যাবে।

কিন্তু সম্পাদক হবে কে?

সম্পাদক হবে জ্ঞানাঞ্জন পাল আর তার বন্ধু মুরলীধর বসু।

আর আফিস?

'আফিস হবে ১ নম্বর শ্রীকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার।' কুণ্ঠিত মুখে হাসলেন জিতেনবাবু।

'সেটা কি?'

'সেটা আমারই বাসা। একতলার দেড়খানা ঘরের একখানি।'

সেই একতলায় দেড়খানা ঘরের একখানিতে "সংহতি"র আফিস বসল। দক্ষিণচাপা গলি, রাস্তার দিকে উত্তরমুখো লম্বাটে ঘর। আলো-বাতাসের সংস্পর্শ নেই। একপাশে একটি ভাঙা আলমারি, আরেক পাশে একখানি ন্যাড়া তক্তপোশ। টেবিল চেয়ার তো দূরের কথা, তক্তপোশের উপর একখানা মাদুর পর্যন্ত নেই। শুধু কি দরিদ্রতা? সেই সঙ্গে আছে কালান্তক ব্যাধি। তার উপর সদ্য স্ত্রী হারিয়েছেন। তবু পিছু হটবার লোক নন জিতেনবাবু। ঐ ন্যাড়া তক্তপোশের উপর রাত্রে ছেলেকে নিয়ে শোন আর দিনের বেলা কাশি ও হাঁপানির ফাঁকে "সংহতি"র স্বপ্ন দেখেন।

সম্পাদকের সঙ্গে রোজ তাঁর দেখাও হয় না। তাঁরা লেখার জোটপাট করেন ভবানীপুরে বসে, প্রুফ দেখেন ছাপাখানায় গিয়ে। কিন্তু ছুটির দিন আফিসে এসে হাজিরা দেন। সেদিন জিতেনবাবু অনুভব করেন তাঁর রথের রশিতে টান আছে। মুঠো থেকে খসে পড়েনি আলগা হয়ে। অস্বাস্থ্যকে অস্বীকার করেই আনন্দে ও আতিথেয়তায় উদ্বেল হয়ে ওঠেন। আসে চা, আসে পরোটা, আসে জলখাবার। আপত্তি শোনবার লোক নন জিতেনবাবু।

কাগজ তো বেরুলো, কিন্তু লেখক কই ?

প্রথম সংখ্যার প্রথমেই কামিনী রায়ের কবিতা—"নিদ্রিত দেবতা জাগো।" সেই সঙ্গে বিপিন পাল ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ। জ্ঞানাঞ্জন লিখলেন "সংহতি"র আদর্শ নিয়ে। তারই ছাপানো নকল তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল ব্রজেন্দ্র শীল আর রবীন্দ্রনাথকে। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ টেলিগ্রামে আশীর্বাণী পাঠালেন, তার বাংলা অনুবাদ ছাপা হলো পত্রিকার প্রচ্ছদে। আর রবীন্দ্রনাথ? এক পরমাশ্চর্য সন্ধ্যায় পরম-অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর এক অপূর্ব প্রবন্ধ এসে পৌঁছুল। সেই প্রবন্ধ ছাপা হল জ্যৈষ্ঠের সংখ্যাতে।

কিন্তু তারপর? গল্প কই ?

বাংলাসাহিত্যের বীণায় যে নতুন তার যোজনা করা হল সে সুরের লেখক কই? সে অনুভূতির হৃদয় কই? কই সেই ভাবের সূত্রধর ?

বিপিনচন্দ্র বললেন, 'নারান ভটচাজ্জকে লেখ। টাকা চায় ভি-পি করে যেন পাঠায়।'

নারায়ণ ভট্টাচার্য গল্প পাঠালেন, "দিন মজুর"।

একবার শরৎচন্দ্রের কাছে গেলে হয় না? শোষিত মানবতার নামে কিছু খুদকুড়া মিলবে না তাঁর কাছে?

কে জানে! তবু দুই বন্ধু জ্ঞানাঞ্জন আর মুরলীধর একদিন রওনা হলেন শিবপুরের দিকে।

বাড়ির মধ্যে আর ঢুকতে পাননি। শরৎচন্দ্রের কুকুর ভেলির তাড়া খেয়েই দোরগোড়া থেকে ফিরে এলেন দুই বন্ধু।

এমন সময় শৈলজার লেখা গল্প "কয়লাকুঠি" নজরে পড়ল।

কে এই নবাগত? মাটির উপরকার শোভনশ্যামল আস্তরণ ছেড়ে একেবারে তার নিচে অন্ধকার গহ্বরে গিয়ে প্রবেশ করেছে? সেখান থেকে কয়লার বদলে তুলে আনছে হীরামণি?

ঠিকানা জানা হল—রূপসীপুর, জেলা বীরভুম। চিঠি পাঠানো হল গল্প চেয়ে। শৈলজা তার মুক্তোর অক্ষর সাজিয়ে লিখে পাঠাল গল্প। নাম "খুনিয়ারা"।

এ গল্প "সংহতি"র তারে ঠিক সুর তুলল না। মুরলীধর শৈলজার সঙ্গে পত্রালাপ চালাতে লাগলেন।

শৈলজা লিখে পাঠাল: 'নতুন উপন্যাসে হাত দিয়েছি। কারখানায় সিটি বেজেছে আর আমার আখ্যানও সুরু হল।'

মুরলীধর জবাব দিলেন: 'ছুটির সিটি বাজবার আগেই লেখাটা পাঠিয়ে দিন। অন্তত প্রথম কিস্তি। পত্রপাঠ।'

"বাঙ্গালী ভাইয়া" নাম দিয়ে শৈলজার সেই উপন্যাস বেরুতে লাগল "সংহতি"তে; পরে সেটা "মাটির ঘর" নামে পুস্তকাকৃত হয়েছে।

শৈলজা তো হল। তারপর? আর কোনো লেখক নেই? যজ্ঞের আর কোনো পুরোধা?

"শুধু কেরানী" আর "গোপনচারিণী" তখন প্রেমেনকে অতিমাত্রায় চিহ্নিত করেছে। মুরলীধর তাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। বীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নামে কলেজের এক ছাত্র (বর্তমান দিল্লীতে অধ্যাপক)

"সংহতির" দলের লোক। ইস্কুলে আমাদের তিনি অগ্রজ, চিনতেন প্রেমেনকে। বললেন, 'আরে, প্রেমেন তো এ পাড়ারই বাসিন্দে, কোথায় খুঁজছেন তাকে মফঃস্বলে? আর এ শুধু হাতের কাছের লোক নয়, তার লেখাও মনের কাছেকার। সম্প্রতি সে বস্তিজীবন নিয়ে উপন্যাস লিখছে—নাম "পাঁক"।'

মুরলীধর লাফিয়ে উঠলেন। কোথায় ধরা যায় প্রেমেনকে?

এদিকে মুরলীধর প্রেমেনকে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন আর প্রেমেন তাঁর বাড়ির দরজা থেকে নিরাশ মুখে ফিরে যাচ্ছে।

কিন্তু ফিরবে কোথায়? গোকুল আর ধীরাজ চলে গেল যে যার দিকে, কিন্তু আমাদের তিন জনের পথ যেন সেদিন আর শেষ হতে চায় না। একবার শৈলজার মেস শাঁখারীপাড়া রোড, পরে প্রেমেনের মেস গোবিন্দ ঘোষাল লেন, শেষে আমার বাসা বেলতলা রোড—বারে-বারে ঘোরাফিরা করতে লাগলাম। যেন এক দেশ থেকে তিন পথিক একই তীর্থে এসে মিলেছি।

বিকেলে আবার দেখা। বিকেলে আর আমরা "আপনি" নেই, "তুমি" হয়ে গিয়েছি। শৈলজা তার গল্প বলা সুরু করল:

'আমার আসল নাম কি জানো? আসল নাম শ্যামলানন্দ। ডাক-নাম শৈল। ইস্কুলে সবাই ডাকত শৈল বলে। সেই থেকে কি করে যে শৈলজা হয়ে গেলাম—'

প্রায় নীহারিকার অবস্থা!

'বাড়ি রূপসীপুর, জন্মস্থান অণ্ডাল মামাবাড়ি, আর—বিয়ে করেছি ইকড়া—বীরভূম জেলায়—'

বিয়ে করেছ এরি মধ্যে? কত বয়স? এই তেইশ-চব্বিশ। জন্মেছি ১৩০৭ সালে। তোমাদের চেয়ে তিন চার বছরের বড় হব।

'বাবা ধরণীধর মুখোপাধ্যায়। সাপ ধরেন, ম্যাজিক দেখান—'

তাকালাম শৈলজার হাতের দিকে। তাইতেই তার হাতের এই ওস্তাদি। এই ইন্দ্রজাল।

'বিশেষ কিছুই করতে পারলেন না জীবনে। মাকে হারিয়েছি যখন তিন বছর বয়স। বড় হয়েছি মামার বাড়িতে। দাদামশায় আমার মস্ত লোক। জাঁদরেল রায়সাহেব।'

তাঁর নাতির এই দীনদশা! আছে এই একটা থুথ্‌ রো ভাঙা মেসে! হাঁটতে-চলতে মনে হয় এই বুঝি পড়ল হুড়মুড় করে। দোতলা বাড়ি, পুব পশ্চিমে লম্বা, দোতলায় সুমুখের দিকে কাঠের রেলিং দেওয়া একফালি বারান্দা, প্রায় পড়ো-পড়ো, জায়গায়-জায়গায় রেলিং আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে। উপরতলায় মেস, নিচে সাড়ে বত্রিশ ভাজার বাসিন্দে। হিন্দুস্থানী ধোপা, কয়লা-কাঠের ডিপো, বেগুনি-ফুলুরির দোকান, চীনেবাদামওয়ালা কুলপিবরফওয়ালার আস্তানা। বিচিত্র রাজ্য। সংহতির সংকেত!

'দাদামশায় তাড়িয়ে দিলেন বাড়ি থেকে। "বাঁশরীতে" গল্প লিখেছিলাম "আত্মঘাতীর ডায়রি" বলে। গল্প কি কখনো আত্মকাহিনী হতে পারে? তবু ভুল বুঝলেন দাদামশায়, বললেন, পথ দেখ।'

মেসের সেই ঘরের চারপাশে তাকালাম আশ্চর্য হয়ে। শৈলজার মত আরো অনেকে মেঝের উপর বিছানা মেলে বসেছে। চারধারে জিনিস পত্রের হাবজা-গোবজা। কারু-বা ঠিক শিয়রে দেয়ালে-বেঁধা পেরেকের উপর জুতা ঝুলানো। পাশ-বালিশের জায়গায় বাক্স-প্যাটরা। পোড়াবিড়ির জগন্নাথক্ষেত্র! দেখলেই মনে হয় কতগুলি যাত্রী ট্রেনের প্রতীক্ষায় প্ল্যাটফর্মে বসে আছে। কোথাকার যাত্রী? "ধ্বংসপথের যাত্রী এরা।"

নিজেরা যদিও অভাবে তলিয়ে আছি, তবু শৈলজার দুঃস্থতায় মন নড়ে উঠল।" কী উপায় আছে, সাহায্য করতে পারি বন্ধুকে?

বললাম, 'কি করে তবে চালাবে ? সম্বল কি তোমার ?'

'সম্বল ?' শৈলজা হাসল : 'সম্বলের মধ্যে লেখনী, অপার সহিষ্ণুতা আর ভগবানে বিশ্বাস।'

তারপর গলা নামাল : 'আর স্ত্রীর কিছু অলঙ্কার, আর "হাসি" আর "লক্ষ্মী" নামে দুখানা উপন্যাস বিক্রির তুচ্ছ কটা টাকা।'

কিন্তু "কল্লোলে" এলে কি করে ?

'"কল্লোলে" আসব না ?' শৈলজার দৃষ্টি উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল : "কল্লোলে" না এসে পারি ? আজকের দিনে যত নতুন লেখক আছে শুদ্ধ হয়ে, সবাইর ভাষাই ঐ "কল্লোল"। সৃষ্টির কল্লোল, স্বপ্নের কল্লোল, প্রাণের কল্লোল। বিধাতার আশীর্বাদে তাই সবাই একত্র হয়েছি। মিলেছি এক মানসতীর্থে। শুধু আমরা কজন নয়, আরো অনেক তীর্থঙ্কর।'

শোনো, কেমন করে এলাম। হঠাৎ কথা থামিয়ে প্রশ্ন করল শৈলজা : 'পবিত্রকে চেন ? পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ?'

চিনি না, আলাপ নেই। অনুবাদ করেন, দেখেছি মাসিকপত্রে।

চিনবে শিগগির। বিশ্বজনের বন্ধু এই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। বুড়ো হোক, কচি হোক, বনেদী হোক, নির্বনেদ হোক, সকল সাহিত্যিকের সে স্বজন-বান্ধব। শুধু মনে মনে নয়, পরিচয়ের অন্তরঙ্গ নিবিড়তায়। শুধু উপর-উপর মুখ-চেনাচেনি নয়, একেবারে হাঁড়ির ভিতরের খবর নিয়ে সে হাঁড়ির মুখের সরা হয়ে বসবে। একেবারে ভিতরের লোক, আপনার জন। বিশ্বাসে অনড়, বন্ধুতায় নির্ভেজাল। এদল-ওদল নেই, সব দলেই সমান মান। পূর্ববঙ্গে বর্ষার সময় পথ-ঘাট খেত-মাঠ উঠান-আঙিনা সব ডুবে যায়, এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে হলে নৌকো লাগে। পবিত্র হচ্ছে সেই নৌকো। নানারকম ব্যবধানে সাহিত্যিকরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন এক সাহিত্যিকের ঘর থেকে আরেক সাহিত্যিকের

ঘরে একমাত্র এই একজনই অবাধে যাওয়া-আসা করতে পারে। এই একজনই সকল বন্দরের সদাগর!

আসল কথা কি জানো? লেশমাত্র অভিমান নেই, অহংকার নেই। নিষ্ঠুর দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে, তবু সব সময়ে পাবে নির্বারিত হাসি। আর, এমন মজার, ওর হাত-পা চোখ-মুখ সব আছে, কিন্তু ওর বয়স নেই। ভগবান ওকে বয়স দেননি। দিন যায়, মানুষ বড় হয়, কিন্তু পবিত্র যে-পবিত্র সেই পবিত্র। নট-নড়নচড়ন। আজ যেমন ওকে দেখছি, পঁচিশ বছর পরেও ওকে তেমনি দেখব। অন্তরে কী সম্পদ, কী স্বাস্থ্য থাকলে এই বয়সের ভার তুচ্ছ করা যায় ভেবে দেখো।

'নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে।'

'রহস্যের মধ্যে আমার যেমন বিড়ি ওর তেমনি খইনি। আর তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

সবাই হেসে উঠলাম।

সেই পবিত্র "প্রবাসীতে" কাজ করে। "প্রবাসী" চেন তো?

"প্রবাসী" চিনি না? বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা।

'কিন্তু নজরুল বলে, প্রকৃষ্টরূপে বাসি—প্রবাসী।'

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় "প্রবাসীর" তখন প্রধান কর্ণধার, এদিকে-ওদিকে আরো আছেন কজন মাঝিমাল্লা। আমার গল্প পড়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক। থাকি বাদুড়বাগান রো-র এক মেসে, চললাম কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট। সাধারণ ব্রাহ্মমন্দিরের পাশের গলিতে প্রবাসী-আপিস, গলির মাঝখানে ঝুলছে কাঠের ঢাউস সাইনবোর্ড। সেখান থেকে যাব বত্রিশ কলেজ স্ট্রিটের দোতলায়, "মোসলেম-ভারত" আপিসে, নজরুলের কাছে। সঙ্গে সর্বপ্রিয় পবিত্র। আমহার্স্ট স্ট্রিটে পড়েছি, অমনি পবিত্র সামনে কাকে দেখে "গোকুল" "গোকুল" বলে চেঁচিয়ে উঠল। আর যাই কোথা, ধরা পড়ে গেলাম। কথা কম বলে বটে কিন্তু অদম্য তার

আকর্ষণ। যেন মন্ত্রবলে টেনে নিয়ে গেল আমাকে "কল্লোল" আপিসে, সেই "এক মুঠো" ঘরে। "কল্লোল" সবে সেই প্রথম বেরুবে, আদ্ধেক প্রেসে, আদ্ধেক কল্পনায়। সাহিত্যের জগতের এক আগন্তুক পত্রিকার জগতের এক আগন্তুকের দুয়ারে এসে দাঁড়ালাম। আজ তারিখ কত?

বাইশে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১, বৃহস্পতিবার।

সেদিনটা চৈত্রের মাঝামাঝি, ১৩২৯ সাল। এক বছরের কিছু বেশি হল। ঘরে ঢুকে দেখি একটি ভদ্রলোক কোণের টেবিলের কাছে বসে নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকছে। পরিচয় হতে জানলাম ও-ই দীনেশরঞ্জন। বললে, '"কল্লোল" আপনার পত্রিকা, যে আসবে এ-ঘরে তারই পত্রিকা। লিখুন—লেখা দিন।' এমন প্রশস্তচিত্ততার সঙ্গে সংবর্ধিত হব ভাবতেও পারিনি। "প্রবাসী"র জন্যে লুকিয়ে পকেটে করে একটি গল্প নিয়ে চলেছিলাম। দ্বিরুক্তি না করে সেটি পৌঁছে দিলাম দীনেশের হাতে। দীনেশ একটি লাইনও না পড়ে লেখাটা রেখে দিলে তার দেরাজের মধ্যে। বললে, লেখা পেলাম বটে, কিন্তু তার চেয়েও বড় জিনিস পেলাম। পেলাম লেখককে। "কল্লোলের" বন্ধুকে। "কল্লোলের" সেই প্রথম সংখ্যার প্রথম গল্প আমার "মা"। আমি আছি সেই প্রথম থেকে।

বললাম, '"প্রবাসী" আপিসে গেলে না আর সেদিন?'

কোথায় "প্রবাসী" আপিস! নজরুলও বুঝি খারিজ হবার জোগাড়। চারজনে তখন আড্ডায় একেবারে বিভোর। তারপরে, সোনায় সোহাগার মত, এসে পড়ল রুটি, আলুর দম আর চা। এমন আড্ডার জয়জয়কার।

পবিত্র বললে, 'এই শুভসংযোগ নিত্যকারের ঘটনা। দীনেশের এই মুক্ত দ্বার আর মেজবৌদির এই মুক্ত দাক্ষিণ্য।'

একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে তবু থেকে যাচ্ছিল। বললাম, 'নজরুলের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? ওকে কি করে চিনলে?'

বা রে, ও যে আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আর-সবাই ডাকবে আমাকে

শৈলজা বলে, ও ডাকবে শৈল বলে। পাশাপাশি দুই ইস্কুলে একই ক্লাশে পড়েছি আমরা। আমি রানিগঞ্জে, নজরুল শিয়াড়শোল রাজার ইস্কুলে। মাইল দুয়েকের ছাড়াছাড়ি। থার্ড ক্লাশে এসে মিললাম দুজনে, আমি হিন্দু ও মুসলমান, আমি লিখি কবিতা—আশ্চর্য হচ্ছ—ও লেখে গল্প। তবু মিললাম দুজনে। সেই টানে মিললাম, যে টানে ধর্মাধর্ম নেই বর্ণাবর্ণ নেই—সৃষ্টির টান, সাহিত্যের টান। দুইজনে রোজ একসঙ্গে মিলি, ঘুরে বেড়াই, গল্প করি, কোনোদিন বা স্কুল পালাই। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরি, ধরি ই-আই-আরের লাইন, কোনোদিন বা চলে যাই শিশু-শালের অরণ্যে। তখন ইংরেজ-জার্মানিতে প্রথম লড়াই লেগেছে। আমরা দুজনে ম্যাট্রিক ক্লাশে উঠে প্রি-টেস্ট দিচ্ছি। শহরে-গাঁয়ে চলেছে তখন সৈন্যজোগাড়ের তোড়জোড়। হাতে-গরম মুখে-গরম বক্তৃতা। সবাই এগিয়ে গেল বীরত্বের ঘোড়দৌড়ে, বাঙালি হিন্দুমুসলমানই শুধু পিছিয়ে থাকবে? বলো, বীর, চির-উন্নত মম শির! বলো বন্দে মাতরম্!

দুই বন্ধু খেপে উঠলাম। পরীক্ষা দিয়েই দুজনে চুপিচুপি পালিয়ে গেলাম আসানসোল। সেখান থেকে এস-ডি-ওর চিঠি নিয়ে সটান কলকাতা। আসানসোলে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা—তার কাছে কিছু বাহাদুরি করতে গিয়েছিলাম কিনা মনে নেই—সে-ই বাড়ি ফিরে গিয়ে সব ভণ্ডুল করে দিলে। উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালি রেজিমেণ্টে ঢোকার সব ঠিকঠাক, ডাক্তার বললে, তোমার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আরেকবার মাপতে হবে। দ্বিতীয়বারের মাপজোকে নামঞ্জুর হয়ে গেলাম। কেন যে নামঞ্জুর হলাম জানলেন শুধু ভগবান আর সেই রায়সাহেব দাদামশায়। নজরুলকে যুদ্ধে পাঠিয়ে সাথীহারা হয়ে ফিরে এলাম গৃহকোণে—

তারপর কলেজে ঢুকলাম, অর্থাভাবে কলেজ ছাড়লাম। শিখলাম শর্টহাণ্ড-টাইপরাইটিং। চাকরি নিলাম কয়লাকুঠিতে। পোষাল না। শেষে এই সাহিত্য।

পাশা উলটো পড়েছিল ভাগ্যিস। তাই নজরুল কবি, তুমি হলে গল্পলেখক।

এমন সময় মুরলীদার আবির্ভাব।

প্রথম আলাপ-পরিচয়ের উত্তাল ঢেউটা কেটে যাবার পর মুরলীদা বললে, 'আসছে রবিবার, পঁচিশে জ্যৈষ্ঠ, কাজীর ওখানে আমাদের সবাইর নেমন্তন্ন—'

'আমাদের সবাইকার?' আমি আর প্রেমেন একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। যার সঙ্গে আলাপ নেই, তার ওখানে নেমন্তন্ন কি করে হতে পারে!

'হ্যাঁ, সবাইকার।' বললে মুরলীদা। 'সমস্ত "কল্লোলে"র নেমন্তন্ন।'

তা হলে তো আমাদেরও নেমন্তন্ন। নিঃসংশয়রূপে নিশ্চিন্ত হলাম। "কল্লোলে" তখনও লেখা এক আধটা ছাপা না হোক, তবু আমরা মনে-প্রাণে "কল্লোলে"র।

বললাম, 'কোথায় যেতে হবে?'

হুগলিতে। হুগলিতেই কাজী নজরুলের বাসা।

এই হুগলির বাসা উপলক্ষ্য করেই বুঝি কবি গোলাম মোস্তাফা লিখেছিল:

"কাজী নজরুল ইসলাম
বাসায় একদিন গিছলাম।
ভায়া লাফ দেয় তিন হাত
হেসে গান গায় দিন রাত।
প্রাণে ফুর্তির ঢেউ বয়
ধরায় পর তার কেউ নয়।"

এর পাল্টা-জবাবে নজরুল কি বলেছিল জানো?

"গোলাম মোস্তফা
দিলাম ইস্তফা।"

পাঁচ

কশ্চিৎ কান্তা—বিরহগুরুণা—স্বাধিকারপ্রমত্তঃ,

শাপেনাস্তং—গমিতমহিমা—বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ—

ললিতগম্ভীর সুমধুর কণ্ঠে একটু বা টেনে-টেনে আবৃত্তি করতে-করতে যে যুবকটি "কল্লোল"-আফিসে প্রবেশ করল প্রথম দর্শনেই তাকে ভালোবেসে ফেললাম। ভালোবাসতে বাধ্য হলাম বলা উচিত। এমন হৃদয়স্পর্শী তার ব্যক্তিত্ব। মাথাভরা দীর্ঘ উস্কখুস্ক চুল, পারিপাট্যহীন বেশবাস। এক চোখে গাঢ় ভাবুকতা, অন্য চোখে আদর্শবাদের আগুন। এই আমাদের নৃপেন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সে যুগের যন্ত্রণাহত যৌবনের রমণীয় প্রতিচ্ছবি। কিন্তু দেখব কি তাকে! কয়েক চরণ বাদ দিয়ে পূর্বমেঘ থেকে সে আবার আবৃত্তি সুরু করেছে তার অমৃতবর্ষী মনোহরণ কণ্ঠে :

আষাঢ়স্য—প্রথমদিবসে—মেঘমাশ্লিষ্টসানুং,

বপ্রক্রীড়া—পরিণতগজ—প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ॥

কতক্ষণ তুমুল আড্ডা জমাবার পর আবার সে হঠাৎ উদাস হয়ে পড়ল, চলে গেল আবার ভাবরাজ্যে। পূর্বমেঘ থেকে উত্তরমেঘে। আঙুল দিয়ে টেনে-টেনে চুলের ঘুরুলি তৈরি করছে আর আবৃত্তি করছে তন্ময়ের মত :

হস্তে লীলা—কমলমলকে—বালকুন্দানুবিদ্ধং,

নীতা লোধ্র—প্রসবরজসা—পাণ্ডুতামাননেশ্রীঃ।

চূড়াপাশে—নবকুরুবকং—চারু কর্ণে শিরীষং,

সীমন্তেচ—ত্বদুপগমজং—যত্র নীপং বধূনাম্॥

আবার কতক্ষণ হুল্লোড়, তর্কাতর্কি, আবার সেই ভাবুকের নির্লিপ্ততা।

নৃপেন এতক্ষণ হয়তো দেয়ালে পিঠ রেখে তক্তপোশের উপর পা ছড়িয়ে বসে ছিল, এবার শুয়ে পড়ল। বলা-কওয়া নেই, সমুদ্র পেরিয়ে চলে গেল ইংরিজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগে, শেলির ওড টু ওয়েস্ট উইণ্ডে সুর মেলাল :

Make me Thy lyre ! even as the forest is,
What if my thoughts are falling like its own,
The tumult of Thy mighty harmonies
Will take from both a deep autumnal tone
Sweet though in sadness—

জিগগেস করলাম, 'হুগলি যাবে না ? নজরুল ইসলামের বাড়ি ?'

'নিশ্চয়ই যাব।' বলে নৃপেন নজরুলকে নিয়ে পড়ল :

ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর ?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
এই তো রে তার আসার সময় ঐ রথ-ঘর্ঘর—
শোনা যায় ঐ রথ-ঘর্ঘর !
বধূরা প্রদীপ তুলে ধর !
ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

বললাম, 'কি করে চিনলে নজরুলকে ?'

নৃপেন তখন সিটি কলেজে আই-এ পড়ে ও আরপুলি লেনের এক বাড়িতে ছাত্র পড়ায়। দু-তিনখানা বাড়ির পরেই কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচির বাড়ি। সে সব দিনে—তখন সেটা ১৩২৮ সাল—বাগচি-কবির বৈঠকখানায় কলকাতার একটা সেরা সান্ধ্য মজলিস বসত। বহু গুণী—গায়ক ও সাহিত্যিক—সে-মজলিসে জমায়েত হতেন। বাংলা

দেশের সব জ্যোতির্ময় নক্ষত্র—গ্রহপতি স্বয়ং যতীন্দ্রমোহন। যতীন্দ্র-মোহনের অতিথিবাৎসল্য নগরবিশ্রুত। কোথায় কোন ভাঙা দেয়ালের আড়ালে 'নূতনের কেতন উড়ছে,' কোথায় কার মাঝে মৃদুতম সম্ভাবনা, ক্ষীণতম প্রতিশ্রুতি—সব সময়ে তাঁর চোখ-কান খোলা ছিল। আভাস একবার পেলেই উদ্বেল হৃদয়ে আহ্বান করে আনতেন। তাঁর বাড়ির দরজায় যে হাসনাহেনার গুচ্ছ ছিল তার গন্ধ প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের গন্ধ। নৃপেন দু-দুবার সে বাড়ির সুমুখ দিয়ে হেঁটে যায়, আর ভাবে, ঐ স্বর্গরাজ্যে তার কি কোনোদিন প্রবেশের অধিকার হবে? আদর্শতাড়িত যুবক, সাংসারিক দারিদ্র্যের চাপে সামান্য টিউশনি করতে হচ্ছে, বাগচি-কবি কি করে জানবেন তার অন্তরের সীমাতিক্রান্ত অনুরাগ, তার নির্জনলালিত বিদ্রোহের ব্যাকুলতা? নৃপেন যায় আর আসে, আর ভাবে, ঐ স্বর্গরাজ্যে কে তাকে ডাক দেবে, কবে, কার কণ্ঠস্বরে?

একদিন তার ছাত্র নৃপেনকে বললে, 'জানেন মাস্টার মশাই, আজ বাগচি-বাড়িতে 'বিদ্রোহী'র কবি কাজী নজরুল ইসলাম আসছেন।' 'বিদ্রোহী'র কবি! "আমি ইন্দ্রাণী-সুত, হাতে চাঁদ ভালে সূর্য্য; মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য্য।" "আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন; আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।" সেই 'বিদ্রোহী'র কবি? কেমন না জানি দেখতে! রাস্তার উপরে উৎসুক জনতা ভিড় করে আছে আর ঘরের মধ্যে কে একজন তরুণ গান গাইছে তারস্বরে। সন্দেহ কি, শুধু 'বিদ্রোহী'র কবি নয়, কবি-বিদ্রোহী। তার কণ্ঠস্বরে প্রাণবন্ত প্রবল পৌরুষ, হৃদয়স্পন্দী আনন্দের উত্তালতা। গ্রীষ্মের রুক্ষ আকাশে যেন মনোহর ঝড় হঠাৎ ছুটি পেয়েছে। কর্কশের মাঝে মধুরের অবতারণা। নিজেরো অলক্ষ্যে কখন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে নৃপেন। সমস্ত কুণ্ঠার কালিমা নজরুলের

নে মুছে গেছে। শুধু কি তাই? গানের শেষে অতর্কিতে

সাহিত্যালোচনায় যোগ দিয়ে বসেছে নৃপেন। কথা হচ্ছিল রুশ সাহিত্য নিয়ে, সব সুমহান পূর্ব্বসূরিদের সাহিত্য—পুশকিন, টলস্টয়, গোগল, ডস্টয়ভস্কি। নৃপেন রুশ সাহিত্যে মশগুল, প্রত্যেকটি প্রখ্যাত বই তার নখমুকুরে। তা ছাড়া সেই তরুণ বয়সে সব সময় নিজেকে জাহির করার উত্তেজনা তো আছেই। কে যেন ডস্টয়ভস্কির কোন উপন্যাসের চরিত্রের নামে ভুল করেছে, নৃপেন তা সবিনয়ে সংশোধন করলে। সঙ্গে-সঙ্গে প্রমাণ করলে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বিস্তৃতি। সকলের বিস্মিত চোখ পড়ল নৃপেনের উপর। নজরুলের চোখ পড়ল নবীন বন্ধুতার।

ঘর থেকে নেমে এসেছে পথে, পিছন থেকে কে ডাকল নৃপেনকে। কি আশ্চর্য! বিদ্রোহী কবি স্বয়ং, আর তার সঙ্গে তার বন্ধু আফজল-উল হক—"মোসলেম ভারতে"র কর্ণধার। মানে, যে কাগজে 'বিদ্রোহী' ছাপা হয়েছে সেই কাগজের। সুতরাং নৃপেনের চোখে আফজলও প্রকাণ্ড কীর্তিমান। আর, "প্রবাসীর" যেমন রবীন্দ্রনাথ, "মোসলেম ভারতে"র তেমনি নজরুল।

নজরুল বললে, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

'তা হলে আসুন, হাঁটি।'

নৃপেন তখন থাকে চিংড়িঘাটায়, কলকাতার পূব উপান্তে। নজরুল আর আফজল চলে এল নৃপেনের বাড়ি পর্যন্ত। নৃপেন বললে, আপনারা পথ চিনে ফিরতে পারবেন না, চলুন এগিয়ে দিই। এগিয়ে দিতে দিতে চলে এল কলেজ স্ট্রিট, নজরুলের আস্তানা। এবার ফিরি, বললে নৃপেন। নজরুল বললে, চলুন, ফের এগিয়ে দিই আপনাকে। সে কি কথা? নজরুল বললে, পথ তো চিনে ফেলেছি ইতিমধ্যে।

রাত গভীর হয়ে এল, সঙ্গে-সঙ্গে গভীর হয়ে এল হৃদয়ের কুটুম্বিতা। দৃঢ় করে বাঁধা হয়ে গেল গ্রন্থি।

নজরুল বললে, "ধূমকেতু" নামে এক সাপ্তাহিক বের করছি।

আপনি আসুন আমার সঙ্গে। আমি মহাকালের তৃতীয় নয়ন, আপনি ত্রিশূল! আসুন, দেশের ঘুম ভাঙাই, ভয় ভাঙাই—

নৃপেন উৎসাহে ফুটতে লাগল। বললে, এমন শুভকাজে দেবতার কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করবেন না? তিনি কি চাইবেন মুখ তুলে? তবু নজরুল শেষমুহূর্তে তাঁকে টেলিগ্রাম করে দিল। রবীন্দ্রনাথ কবে কাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন? তা ছাড়া, এ নজরুল, যার কবিতায় পেয়েছেন তিনি তপ্ত প্রাণের নতুন সজীবতা। শুধু নামে আর টেলিগ্রামেই তিনি বুঝতে পারলেন "ধূমকেতু"র মর্মকথা কি। যৌবনকে "চিরজীবী" আখ্যা দিয়ে "বলাকা"য় তিনি আধ-মরাদের ঘা মেরে বাঁচাতে বলেছিলেন, সেটাতে রাজনীতি ছিল না, কিন্তু, এবার "ধূমকেতু"কে তিনি যা লিখে পাঠালেন তা স্পষ্ট রাজনীতি, প্রত্যক্ষ গণজাগরণের সঙ্কেত।

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন,
অলক্ষণের তিলকরেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্দ্ধচেতন।

সাত নম্বর প্রতাপ চাটুজ্জের গলি থেকে বেরুল "ধূমকেতু"। ফুলস্কাপ সাইজ, চার পৃষ্ঠার কাগজ, দাম বোধ হয় দু পয়সা। প্রথম পৃষ্ঠায়ই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, আর তার ঠিক উপরে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা ব্লক করে কবিতাটি ছাপানো।

নৃপেনের মত আমিও ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। সপ্তাহান্তে বিকেলবেলা

আরো অনেকের সঙ্গে গুপ্তবাবুর বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, হকার কতক্ষণে "ধূমকেতু"র বাণ্ডিল নিয়ে আসে। হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কাগজের জন্যে। কালির বদলে রক্তে ডুবিয়ে ডুবিয়ে লেখা সেই সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। সঙ্গে "ত্রিশূলের" আলোচনা। শুনেছি স্বদেশী যুগের "সন্ধ্যা"তে ব্রহ্মবান্ধব এমনি ভাষাতেই লিখতেন। সে কী কশা, কী দাহ! একবার পড়ে বা শুধু একজনকে পড়িয়ে শান্ত করবার মত সে লেখা নয়। যেমন গদ্য তেমনি কবিতা। সব ভাঙার গান, প্রলয়-বিলয়ের মঙ্গলাচরণ।

কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্ত-জমাট, শিকলপূজার পাষাণবেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান! বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ
ধ্বংশ-নিশান উড়ুক প্রাচী-র প্রাচীর ভেদি!
গাজনের বাজনা বাজা! কে মালিক কে সে রাজা?
কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে?
হাহাহা পায় যে হাসি, ভগবান পরবে ফাঁসি
সর্ব্বনাশী শিখায় এ হীন তথ্য কে রে?
ওরে ও পাগলা ভোলা, দে রে দে প্রলয় দোলা
গারদগুলা জোরসে ধ'রে হেঁচকা টানে!
মার হাঁক হায়দরী হাঁক, কাঁধে নে দুন্দুভি-ঢাক
ডাক ওরে ডাক মৃত্যুকে ডাক জীবনপানে।
নাচে ঐ কালবোশেখী, কাটাবি কাল ব'সে কি?
দে রে দেখি ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি!
লাথি মার ভাঙরে তালা যত সব বন্দীশালা।
আগুন জ্বালা আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ি॥

"ধূমকেতু"র সেসব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সংকলিত থাকলে বাংলা-

সাহিত্যের একটা স্থায়ী উপকার হত। অন্তত সাক্ষ্য থাকত বাঙলা গদ্য কতটা কাব্যগুণান্বিত হতে পারে, "প্রসন্নগম্ভীরপদা সরস্বতী" কি করে "বিনিষ্ক্রান্তাসিধারিণী" সংহারকর্ত্রী মহাকালী হতে পারে। প্রসাদরম্য ললিত ভাষায় কি করে উৎসারিত হতে পারে অগ্নিগর্ভ অঙ্গীকার। একটা প্রবন্ধের কথা এখনো মনে আছে—নাম, "ম্যয় ভুখাহুঁ"। মহাকালী ক্ষুধার্ত হয়ে নরমুণ্ডের লোভে শ্মশানে বেরিয়েছেন তারই একটা ঘোরদর্শন বর্ণনা। বোধ হয় সে-সংখ্যাটা কালীপূজার সন্ধ্যায় বেরিয়েছিল। কালীপূজার দিন সাধারণ দৈনিক বা সাপ্তাহিক কাগজে যে মামুলি প্রবন্ধ বেরোয়—মুখস্তকরা কতকগুলো সমাসবদ্ধ কথা—এ সে জাতের লেখা নয়। দীপান্বিতার রাত্রির পরেই এ-দীপ নিবে যায় না। বাঙলাদেশের চিরকালীন যৌবনের রক্তে এর দ্যুতি জ্বলতে থাকে।

"ধূমকেতু"তে একটা কবিতা পাঠিয়ে দিলাম। অর্থাৎ, একটা সাঁকো ফেললাম নজরুলকে গিয়ে ধরবার জন্যে। সেই কবিতাটা ঠিক পরবর্তী সংখ্যায় বেরুল না। অনুৎসাহিত হবার কথা, কিন্তু আমার স্পর্ধা হলো নজরুল ইসলামের কাছে গিয়ে মুখোমুখি জবাবদিহি নিতে হবে। গেলাম তাই একদিন দুপুরবেলা। রঙিন লুঙ্গি পরনে, গায়ে আঁট গেঞ্জি —অসম্পাদকীয় বেশে নজরুল বসে আছে তক্তপোশে—চারদিকে একটা অন্তরঙ্গতার আবহাওয়া ছড়িয়ে। 'অগ্নিবীণা'র প্রথম সংস্করণে নজরুলের একটা ফোটো ছাপা হয়েছিল, সেটায় বড়-বেশি কবি-কবি ভাব—এখন চোখের সামনে একটা গোটা মানুষ দেখলাম, স্পষ্ট, সতেজ প্রাণপূর্ণ পুরুষ। বললাম,—আমার কবিতার কি হল? নজরুল চোখ তুলে চাইল: কোন কবিতা? বললাম—আপনার কবিতা যখন 'বিদ্রোহী', আমার কবিতা 'উচ্ছৃঙ্খল'। হাহাহা করে নজরুল হেসে উঠল। বললে—আপনি মনোনীত হয়েছেন।

কবিতাটা ছাপা হয়েছিল কিনা জানি না। হয়তো হয়েছিল, কিংবা হয়তো তার পরেই নজরুলকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশে। কিন্তু তার সেই কথাটা মনের মধ্যে ছাপা হয়ে রইল: আপনি মনোনীত হয়েছেন।

'নজরুলকে কিসের জন্যে ধরলে জানো?' জিগগেস করলে নৃপেন।

'কিসের জন্যে?'

'আগে লিখেছিল—রক্তাম্বর পর্ মা এবার জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেতবসন। দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন বাজে তরবারি ঝনন ঝন॥ এবারে লিখলে—আর কতকাল রইবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্ত্তি-আড়াল? স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল! এই লেখার জন্যে নজরুলের এক বছর জেল হয়ে গেল। সে যা জবানবন্দি দিলে তা শুধু সত্য নয়, সাহিত্য।'

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বসে ছিল একপাশে। বললে, 'তার জেলের কাহিনীটা আমার কাছ থেকে শোনো।'

'তোমার সঙ্গে নজরুলের আলাপ হল কবে?'

'নজরুল যখন করাচিতে, যখন ও শুধু-কবি নয়, হাবিলদার কবি। পল্টনে লেফট-রাইট করাতে হত তাকে। পল্টনও এমন পল্টন, লেফট-রাইট বোঝে না। তখন এক পায়ে ঘাস ও অন্য পায়ে বিচালি বেঁধে দিয়ে বলতে হত, ঘাস-বিচালি ঘাস। সেই সময়কার থেকে চেনা। আছি তখন 'সবুজপত্রে'—হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এক চিঠি আসে করাচি থেকে, সঙ্গে ছোট একটি কবিতা। লেখক উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালি পল্টনের একজন হাবিলদার, নাম কাজী নজরুল ইসলাম। কবিতাটি বড্ড রবীন্দ্রনাথ-ঘেঁসা। স্বকীয়তা খুঁজে পেলেন না বলে চৌধুরী মশায়ের পছন্দ হল না। আমার কিন্তু ভাল লেগেছিল। কবিতাটি নিয়ে গেলাম "প্রবাসী"র চারুবাবুর কাছে। চারুবাবু খুশি হয়ে ছাপলেন সে-কবিতা। বললেন, আরো চাই। এক জায়গায় পাঠানো কবিতা অন্য

জায়গায় চালিয়ে দিয়েছি লেখকের সম্মতি না নিয়ে, কুণ্ঠিত হয়ে চিঠি লিখলাম নজরুলকে। "দে গরুর গা ধুইয়ে"—নজরুল তা থোড়াই কেয়ার করে। প্রশস্ত সাধুবাদ দিয়ে চিঠি লিখলে আমাকে, এতটুকু ভুল বুঝলে না। নবীন আগন্তুককে প্রবেশ-পথে যে সামান্য সাহায্য করেছি এতেই তার বন্ধুতা যেন সে কায়েম করলে। তারপর পল্টন ভেঙে দেবার পর যখন সে কলকাতায় ফিরল, ফিরেই ছুটল "সবুজপত্রে" আমাকে খোঁজ করতে—'

একদিন জোড়াসাঁকো থেকে খবর এল—রবীন্দ্রনাথ পবিত্রকে ডেকেছেন। কি ব্যাপার? ব্যাপার রোমাঞ্চকর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বসন্ত"-নাটিকাটি নজরুলের নামে উৎসর্গ করেছেন। এখন একখানা বই ওকে জেলখানায় পৌঁছে দেওয়া দরকার। পারবে নাকি পবিত্র?

নিশ্চয়ই পারব। উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ নিজের নাম লিখে দিলেন। উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় ছাপা ছিল : 'শ্রীমান কবি কাজি নজরুল ইসলাম, কল্যাণীয়েষু'। তার নিচে তাঁর কাঁচা কালির স্বাক্ষর বসল। শুনেছি তাঁর আশেপাশে যে সব উন্নাসিক ভক্তের দল বিরাজ করত তারা কবির এই বদান্যতায় সেদিন বিশেষ খুশি হতে পারেনি। কিন্তু তিনি নিজে তো জানতেন কাজী নজরুল তাঁরই পরেকার যুগে প্রথম স্বতন্ত্র কবি, স্বীকার করতে হবে তার এই শক্তিদীপ্ত বিশিষ্টতাকে। তাই তিনি তাঁর অন্তরের স্নেহ ও স্বীকৃতি জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। "শ্রীমান" ও "কবি" এই কথা দুটির মধ্যে তাঁর সেই গভীর স্নেহ ও আন্তরিকতা অক্ষয় করে রাখলেন।

নজরুল মিঠে পান ও জর্দা ভালোবাসে, আর ভালোবাসে হেজলিন স্নো। এই সব ও আরো কটা কি বরাতী জিনিস নিয়ে পবিত্র একদিন আলিপুর সেণ্টাল জেলের দুয়ারে হাজির, নজরুলের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে। লোহার বেড়ার ওপার থেকে নজরুল চেঁচিয়ে জিগগেস করলে—সব

এনেছিস তো? পবিত্র হাসল। কী জানে নজরুল, কী জিনিস পবিত্র আজ নিয়ে আসছে তার জন্যে। কী দেবতা-দুর্লভ উপহার! কী এনেছিস? চেঁচিয়ে উঠল নজরুল। পবিত্র বললে, তোর জন্যে কবিকণ্ঠের মালা এনেছি। বলে "বসন্ত" বইখানা তাকে দেখাল। নজরুল ভাবলে, রবীন্দ্রনাথের "বসন্ত" কাব্যনাট্যখানা নিয়েই পবিত্র বুঝি একটু কবিয়ানা করছে। এই ছাখ। উৎসর্গ-পৃষ্ঠাটা পবিত্র খুলে ধরল তার চোখের সামনে। আর কী চাস! সব চেয়ে বড় স্তুতি আজ তুই পেয়ে গেলি। তার চেয়েও হয়তো বড় জিনিস। রবীন্দ্রনাথের স্নেহ!

রবীন্দ্রনাথ যে নজরুলকে দেশের ও সাহিত্যের একটা দামী সম্পদ বলে মনে করতেন তার আর একটা প্রমাণ আছে। নজরুল যখন হুগলি জেলে অনশন করছে তখন রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে তাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন—Give up hunger strike, our literature claims you. টেলিগ্রাম করেছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলে। সেই টেলিগ্রাম ফিরে এল রবীন্দ্রনাথের কাছে। কর্তৃপক্ষ লিখে পাঠাল: Addressee not found।

'এই সময়ে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। পবিত্র তা চেপে যাচ্ছে।' বললেন নলিনীকান্ত সরকার, আমাদের নলিনীদা। কৃষ্ণের যেমন বলরাম, নজরুলের তেমনি নলিনীদা। হাসির গানের তানসেন। নজরুল গায় আর হাসে, নলিনীদা গান আর হাসান। নজরুলের পার্শ্বাস্থি বলা যেতে পারে। নজরুলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, নলিনীদার কাছে সন্ধান নাও। নজরুলকে সভায় নিয়ে যেতে হবে, নলিনীদাকে সঙ্গে চাই। নজরুলকে দিয়ে কিছু করাতে হবে, ধরো নলিনীদাকে। নজরুল সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল।

'শোনো সে মজার কথা। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে নজরুল তখন বদলি হয়েছে হুগলি জেলে। হুগলি জেলে এসে নজরুল জেলের

শৃঙ্খলা ভাঙতে শুরু করল, জেলও চাইল তার পায়ে ভালো করে শৃঙ্খল পরাতে। লেগে গেল সংঘাত। শেষকালে নজরুল হাঙ্গার স্ট্রাইক করলে। আটাশ দিনের দিন সবাই আমাকে ধরলে জেলে গিয়ে নজরুলকে যেন খাইয়ে আসি। জানতাম নজরুল মচকাবার ছেলে নয়, তবু ভাবলাম একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি। গেলাম হুগলি জেলের ফটকে। আমি আর সঙ্গে, সকল অগতির গতি, এই পবিত্র। জেলে ঢুকতে পারলাম না, অনুমতি দিলে না কর্তারা। হতাশ মনে ফিরে এলাম হুগলি স্টেশনে। হঠাৎ নজরে পড়ল, প্ল্যাটফর্মের গা ঘেঁসেই জেলের পাঁচিল উঠে গেছে। মনে হল জেলের পাঁচিলটা একবার কোনোরকমে ডিঙোতে পারলেই নজরুলের সামনে সটান চলে যেতে পারব। আর এভাবে জেলের মধ্যে একবার ঢুকতে পারলে সহজে যে বেরুনো চলবে না তা এই দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। তবু বিষয়টা চেষ্টা করে দেখবার মত। পবিত্রকে বললাম, তুমি আগে উবু হয়ে বোসো, আমি তোমার দু কাঁধের উপর দু পা রেখে দাঁড়াই দেয়াল ধরে। তারপর তুমি আস্তে-আস্তে দাঁড়াতে চেষ্টা করো। তোমার কাঁধের থেকে যদি একবার লাফ দিয়ে পাঁচিলের উপর উঠতে পারি, তবে তুমি আর এখানে থেকো না। স্রেফ হাওয়া হয়ে যেয়ো। বাড়তি আরেক জনের জেলে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

বেলা তখন প্রায় দুটো, প্ল্যাটফর্মে যাত্রীর আনাগোনা কম। 'য়্যাকর্ডিং টু প্ল্যান' কাজ হল। পবিত্রর কাঁধের থেকে পাঁচিলের মাথায় কায়ক্লেশে প্রমোশন পেলাম। প্রমোশন পেয়েই চক্ষু চড়কগাছ! ভিতরের দিকে প্রকাণ্ড খাদ—খাই প্রায় অন্তত চল্লিশ হাত। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি পবিত্রর নামগন্ধ নেই। যা হবার তা হবে, দুদিকে দু ঠ্যাং ঝুলিয়ে জাঁকিয়ে বসলাম পাঁচিলের উপর ঘোড়সওয়ারের মত। যে দিকে নামাও সেই দিকেই রাজি আছি—এখন নামতে পারাটাই কাম্যকর্ম।

কিন্তু কই জেলখানার ভিতরের মাঠে লোক কই? খানিকপর স্যামধ্যায়ী মশাইকে দেখলাম—মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী। বেড়াতে বেড়াতে একটু কাছে আসতেই চীৎকার করে বললাম, নজরুলকে ডেকে দিন। নজরুলকে।

সার্কাসের ক্লাউন হয়ে বসে আছি পাঁচিলের উপর। জেলখানার কয়েদীরা দলে-দলে এসে মাঠে জুটতে লাগলো বিনা টিকিটে সে-সার্কাস দেখবার জন্যে। দুটি বন্দী যুবকের কাঁধে ভর দিয়ে দুর্বল পায়ে টলতে টলতে নজরুলও এগিয়ে আসতে লাগল। বেশি দূর এগুতে পারল না, বসে পড়ল। গলার স্বর অতদূরে পৌছুবে না, তাই জোড়হাত করে ইঙ্গিতে অনুরোধ করলাম যেন সে খায়। প্রত্যুত্তরে নজরুলও জোড়হাত করে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল এ অনুরোধ অপাল্য।

এ তো জানা কথা। এখন নামি কি করে? পবিত্র যে ঠিক "ধরো লক্ষ্মণের" মতই অবিকল ব্যবহার করবে এ যেন আশা করেও আশা করিনি। গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়ার চেয়ে পাঁচিলে তুলে কাঁধ সরিয়ে নেওয়া ঢের বেশি বিপজ্জনক। কিন্তু ভয় নেই। স্টেশনের বাবুরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আমার চোদ্দপুরুষের—আন্ত কি করে বলি—শেষ শ্রাদ্ধ করছেন। ধরণী, সিধা হও, বলে পাঁচিল থেকে পড়লাম লাফ দিয়ে। স্টেশনের মধ্যে আমাকে ধরে নিয়ে গেল, পুলিশের হাতে দেয় আর কি। অনেক কষ্টে বোঝানো হল যে আমি সন্ত্রাসবাদীদের কেউ নই। ছাড়া পেয়ে গেলাম। অবিশ্যি তার পরে পবিত্র আর কাছ-ছাড়া হল না—'

'তারপরে নজরুল অনশন ভাঙল তো?'

ভাঙল চল্লিশ দিনের দিন। আর তা শুধু তার মাতৃসমা বিরজাসুন্দরী দেবীর স্নেহানুরোধে।

নজরুলের বিদ্রোহ, প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ও আত্মভোলা বন্ধুত্বের পরিচয়

পেলাম। তারপরে স্বাদ পাব তার দারিদ্র্যজয়ী মুক্ত প্রাণের আনন্দ, বিরতিহীন সংগ্রাম ও দায়িত্বহীন বোহিমিয়ানিজম! সবই সেই কল্লোল-যুগের লক্ষণ।

কিন্তু তোমরা কে কি করে এলে "কল্লোলে"?

নৃপেন হঠাৎ একদিন একটা দীর্ঘ প্রেমপত্র পায়—তুমি এসো, আমার হাতের সঙ্গে হাত মেলাও। এ প্রেমপত্র তাকে কোনো তরুণী লেখেনি, লিখেছে "কল্লোলের" পরিকল্পক স্বয়ং দীনেশরঞ্জন। "ধূমকেতু"তে "ত্রিশূলের" লেখায় আকৃষ্ট হয়েই দীনেশরঞ্জন নৃপেনকে সম্ভাষণ করেন—আর, শুধু একটা লেখার জন্যে অনুরোধ নয়, গোটা লোকটাকেই নিমন্ত্রণ করে বসলেন। ভোজ্য সাজাতে, পরিবেশন করতে। নৃপেন চলে এল সেই ডাকে। মুখে সেই মধুর মন্দাক্রান্তা ছন্দ—

ছন্নোপান্তঃ—পরিণতফল—দ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ-
স্ত্বয্যারূঢ়ে—শিখরমচলঃ—স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে।
নূনং যাস্য—ত্যমবমিথুন—প্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ—স্তন ইব ভুবঃ—শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ॥

আর, পবিত্র একদিন ফোর আর্টস বা চতুষ্কলা ক্লাবে এসে পড়েছিল ওমরখৈয়ামের কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে। পুরানো ঘর ভেঙে যখন ফের নতুন ঘর বাঁধা হল, ছোট করে, বন্ধুতায় ঘন ও দৃঢ় করে, তখনও পবিত্রর ডাক পড়ল। ঘর ছোট কিন্তু চূড়া খুব উঁচু। সে চূড়া উঁচু আদর্শবাদের।

কান্তিচন্দ্র ঘোষকে দূর থেকে মনে হত সুকৃত্রিম আভিজাত্যের প্রতীক। এক কথায় স্নব। তিনিও নিজেকে dilettante বলতেন। "বিচিত্রা"য় থাকা কালে তাঁর সংস্পর্শে আসি। তখন বুঝতে পারি কত বড় রসিক কত বড় বিদগ্ধ মন তাঁর। তিনি "সবুজপত্রের" লোক। তাই সাহিত্যে সব সময় নব্যপন্থী, অচলায়তনী নন। রসবোধের গভীরতা থেকে

মনে যে স্নিগ্ধ প্রশান্তি আসে তা তাঁর ছিল—সে শান্তির স্বাদ পেয়েছে তাঁর নিকটবর্তীরা।

কিন্তু নজরুল এল কি করে?

পবিত্র যখন জেলে নজরুলকে "বসন্ত" দিতে যায় তখনই নজরুল কথা দেয় নতুন কবিতা লিখবে পবিত্রর ফরমায়েসে। "কল্লোলের" জন্যে কবিতা। লাল কালিতে লেখা কবিতা। জেল থেকে এল একদিন সেই কবিতা —সত্যিসত্যিই লাল কালিতে লেখা—"সৃষ্টি সুখের উল্লাসে"।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে।
আসল হাসি আসল কাঁদন, আসল মুক্তি আসল বাঁধন;
মুখ ফুটে আজ, বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে,
রিক্ত বুকের দুখ আসে—
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে॥

এই কবিতা ছাপা হল "কল্লোলের" প্রথম কি দ্বিতীয় সংখ্যায়। কবিতাটির জন্যে পাঁচ টাকা দেওয়া হয়েছিল। জেলে সেই টাকা পবিত্র পৌঁছে দিয়েছিল নজরুলকে।

এমন সময় কল্লোল-আপিসে কে আরেকটি যুবক এসে ঢুকল। ছিপছিপে ফর্সা চেহারা, খাড়া নাক, বড়-বড় চোখ, মুখে স্নিগ্ধ হাসি। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই বয়সেই কপালের উপর দু-চারটি রেখা বেশ গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। কে এ? এ সুকুমার ভাদুড়ি। একদিন এক গ্রীষ্মের দুপুরে হঠাৎ অনাহূত ভাবে কল্লোল-আপিসে চলে আসে। একটা গল্প হয়তো বেরিয়েছিল "কল্লোলে"—সেই অধিকারে। এসে নিঃসংকোচে দীনেশ ও গোকুলকে বললে, 'আমি আপনাদের দেখতে এসেছি।' আর ঘরের এক কোণে নিজের জায়গাটি পাকা করে রেখে যাবার সময় বললে, 'আমি কল্লোলের জন্যে কাজ করতে চাই।'

আনন্দের খনি এই সুকুমার ভাদুড়ি। কিন্তু কপালে ঐ দুশ্চিন্তার রেখা কেন? এমন সুন্দর সুকান্ত চেহারা, এমন স্নিগ্ধ উজ্জ্বল চক্ষু, কিন্তু বিষাদের প্রলেপ কেন?

নৃপেন বললে, 'এখন এসব থাক। এখন হুগলি চলো।'

বলে, এখন, এতক্ষণে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করলে :

হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী, তুমি দেবী অচঞ্চলা
তোমার রীতি সরল অতি নাহি জানো ছলাকলা।
জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা, নাইকো তাহে প্রতারণা
টানো যখন মরণ ফাঁসি বলো নাকো মিষ্টভাষ,
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করবো মোরা পরিহাস।

ছয়

'আপনি যাবেন না ?'

'তোমার কি মনে হয় ?' দুই চোখে কথা-ভরা হাসি নিয়ে তাকালেন দীনেশদা।

উজ্জ্বল দৃষ্টির মধ্য দিয়ে এমন বন্ধুতাপূর্ণ হাসি—এ আর দেখিনি কোনোদিন। সে-হাসিতে কোমল স্নেহের স্পর্শ মাখানো। পুঁজিপাটা তাঁর কিছুই ছিল না—শুধু হৃদয়ভরা নীরবনিবিড় স্নেহ আর দুই চোখের এই মাধুর্য্যময় মিত্রতা। যেন বা একটি অন্তিম আশ্রয়ের প্রশ্নহীন প্রতিশ্রুতি। সব হারিয়ে-ফুরিয়ে গেলেও আমি আছি এই অভয় ঘোষণা। তাই দীনেশরঞ্জন ছিলেন "কল্লোলে"র সব-পেয়েছির দেশ। সব-হারানোদের মধ্যমণি।

দেখতে সুপুরুষ ছিলেন। চৌরঙ্গি অঞ্চলে এস্ রায়ের খেলার সরঞ্জামের দোকানে যখন চাকরি করতেন, তখন সবাই তাঁকে পার্শি বলে ভুল করত। দু চার কথা আলাপ করেই বোঝা যেত ইনি যে শুধু বাঙালি তা নন, একেবারে বিশ্বাসী বন্ধুস্থানীয়। অল্প একটু হেসে দু'চারটি মিষ্টি কথায় দূরকে নিকট ও পরকে আপন করার আশ্চর্য জাদুমন্ত্র জানতেন। একটি বিশুদ্ধ প্রীতিস্বচ্ছ অন্তরের নির্ভুল ছায়া এসে সে-চোখে পড়ত বলেই সে-জাদুমন্ত্রের মায়ায় মুগ্ধ না হয়ে থাকা যেত না। এস্ রায়ের দোকান থেকে চলে আসেন তিনি লিণ্ডসে স্ট্রিটে এক ওষুধের দোকানে অংশীদার হয়ে। সমবেত রুগীদের এমন ভাবে যত্ন-আত্তি করতেন কে বলবে ইনিই ডাক্তার নন। মানুষের অন্তরে প্রবেশ করবার সহজ, সংক্ষিপ্ত ও ত্বরান্বিত যে পথ আছে তিনি ছিলেন সেই পথের পথকার। সে পথের প্রবেশে স্বচ্ছ-স্নিগ্ধ হাসি, প্রস্থানে অকপট

আন্তরিকতা। এই সময়ে প্রায়ই নিউ মার্কেটে ফুলের স্টলে বেড়াতে আসতেন। ফুল ভালবাসতেন খুব, কিন্তু কেনবার মত স্বচ্ছলতা ছিল না। মাসে দু-এক টাকার কিনতেন বড় জোর, কিন্তু যখনই দোকানের গলিতে এসে ঢুকতেন দোকানীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত—কে কোন ফুল তাঁকে উপহার দেবে। অম্লান ফুলের মতই যে এঁর হৃদয় ফুলের জহুরিরা বুঝতে পারত সহজেই। কথা-ভরা উজ্জ্বল চোখ, হাসি-ভরা মিষ্টি আলাপ আর অনন্যসাধারণ সরস সৌন্দর্যবোধ—সকলের থেকেই কিছু না কিছু আদায় করে নিত অনায়াসে। শুধু ক্ষণজীবনের ফুল নয়, আমার-তোমার ইহজীবনের ভালোবাসা। অজাতশত্রু শুনেছি, কিন্তু এই প্রথম দেখলাম—জাতমিত্র। এই একজন।

এই ফুলের স্টলে ঢুকেই গোকুলের কাছাকাছি এসে পড়েন। লক্ষ্য করেন একটি উদাসীন বিমনা যুবক ছিন্নবৃন্ত ফুলগুচ্ছের দিকে করুণ চোখে চেয়ে কি ভাবছে। হয়তো ভাবছে ফুল বেচে জীবিকার্জন করতে হবে এ কি পরিহাস! পরিহাসটা আরো বেশি মর্মান্তিক হয় যখন তা আঘ্রাণেও লাগে না.আস্বাদনেও লাগে না। পুরোপুরি অন্তত জীবিকার্জন-টাই করো। দীনেশরঞ্জন হাত মেলালেন গোকুলের সঙ্গে। তার বিপণি-বীথি নতুন ছন্দে সাজিয়ে দিলেন, নতুন বাচনে আলাপ করতে লাগলেন হলে-হতে-পারে খদ্দেরদের সঙ্গে। ফুল না নাও অন্তত একটু হাসি একটু সৌজন্য নিয়ে যাও বিনি-পয়সায়। আর এমন মজা, যেই একটু সেই হাসি দেখেছ বা কথা শুনেছ, নিজেরও অলক্ষিতে কিনে বসেছ ফুল। দেখতে-দেখতে গোকুলের মরা গাঙে ভরা কোটালের জোয়ার এল। তবু যেন মন ভরে না। এমন কিছু নেই যার সৌরভ অল্পস্থায়ী বা অল্পজীবী নয়? যা শুকায় না, বাসি হয় না? আছে নিশ্চয়ই আছে। তার নাম শিল্প, তার নাম সাহিত্য। চলো আমরা সেই সৌরভের সওদা করি। হোন তিনি এ সৃষ্টির কারিকর, তবু আমরা

পরের জিনিসে কারবার করব কেন? আমরা আমাদের নিজের জিনিস নিজেরাই নির্মাণ করব।

সেই থেকে ফোর আর্টস বা চতুষ্কলা ক্লাব। আর সেই চতুষ্কলার ক্ষীরবিন্দু "কল্লোল"।

মুরলীদা শৈলজা প্রেমেন আর আমি চারজন ভবানীপুর থেকে এক দলে, আর অন্য দলে ডি-আর গোকুল নৃপেন ভূপতি পবিত্র সুকুমার—সকলে সদলবলে হুগলিতে এসে উপস্থিত হলাম। প্ল্যাটফর্মে স্বয়ং নজরুল। "দে গরুর গা ধুইয়ে" অভিনন্দনের ধ্বনি উঠল। পূর্ব-পরিচয়ের নজির এনে ব্যবধানটা কমাবার চেষ্টা করা যায় কিনা সে-কথা ভেবে নেবার আগেই নজরুল সবল আলিঙ্গনে বুকে টেনে নিলে—শুধু আমাকে নয়, জনে-জনে প্রত্যেককে। তোমরা হেঁটে-হেঁটে একটু-একটু করে কাছে আস আর আমি লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝাপটে ধরি—সাঁতার জানা থাকতে সাঁকোর কি দরকার!

সেটা বোধ হয় নজরুলের বড় ছেলের "আকিকা" উৎসবের নিমন্ত্রণ। দিনের বেলায় গানবাজনা, হৈ-হল্লা, রাতে ভূরিভোজ। ফিরতি ট্রেন কখন তারপর? "দে গরুর গা ধুইয়ে।" ফিরতি ট্রেনের কথা ফিরতি ট্রেনকে জিগগেস করো।

দুপুরে নজরুলকে নিয়ে কেউ-কেউ চলে গেলাম নৈহাটি—সুবোধ রায়ের বাড়ি। সুবোধ রায় মুরলীদার সহপাঠী, তাছাড়া সেই বছরেই তার আর সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের হাতে এসে গিয়েছে "বিজলী"—মহানিশার অন্ধকারে সেই বিদ্যুজ্জ্বালাময়ী কথা। আর তার সঙ্গে আছে কিরণকুমার রায়, সংক্ষেপে কিকুরা। তীক্ষ্ণধী সুজন-রসিক বন্ধু। কিন্তু সে নিজের আত্মপরিচয় দিতে ভালবাসে চিরকেলে সাব-এডিটর বলে। বলেই বয়েৎ ঝাড়ে: এডিটর মে কাম, এডিটর মে গো, বাট আই গো অন ফর এভার। আরো একজন আছেন—তিনি শিল্পী—

নাম অরবিন্দ দত্ত, সংক্ষেপে এ-ডি। নিপুণ রূপদক্ষ। কিন্তু তিনি বলেন, তাঁর শিল্পের আশ্চর্য কৃতিত্ব তাঁর রঙে-তুলিতে-কাগজে-কলমে তত নয়, যত তাঁর আননমণ্ডলে। কেননা উত্তরকালে তিনি বহু সাধনায় তাঁর মুখখানাকে চার্চিল সাহেবের মুখ করে তুলেছেন। দাঁতের ফাঁকে একটা মোটা চুরুট শুধু বাকি।

ছোটখাটো বেঁটে মানুষটি এই সুবোধ রায়, অফুরন্ত উচ্চহাস্যের ও উচ্চরোলের ফোয়ারা। প্রচুর পান খান আর প্রচুর কথা বলেন। আর, উচ্চগ্রামের সেই কথায় আর হাসিতে নিজেকে অজস্র ধারায় অবারিত করে দেন। আজো, বহু বৎসর অতিক্রম করে এসেও, সেই সরল খুশির সবল উৎসার যেন এখনো শুনতে পাচ্ছি।

আসলে সেই যুগটাই ছিল বন্ধুতার যুগ, কমরেডশিপ বা সমকর্মিতার যুগ। যে যখন যার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, আত্মার আত্মজনের মত দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞাসা নেই, পরীক্ষা নেই, ব্যবধান নেই। সৃজন-সমুদ্রের উর্মিল উত্তালতায় এক ঢেউয়ের গায়ে আরেক ঢেউ—ঢেউয়ের পরে ঢেউ। সব এক জলের কলোচ্ছ্বাস! বাঁধ ভাঙা এক বন্যার বল।

কল্লোল-যুগের আরেক লক্ষণ এই সুন্দর সৌহার্দ্য, নিকটনিবিড় আত্মীয়তা। একজনের জন্যে আরেকজনের মনের টান। একজনের ডাকে আরেকজনের প্রতিধ্বনি। এক সহমর্মিতা।

নজরুল বিষের বাঁশি বাজাচ্ছে, আর সে-সুর সে-কথা সবাইর রক্তে বিদ্রোহের দাহ সঞ্চার করছে। গলার শির জোঁকের মত ফুলে উঠেছে, ঝাঁকড়া-চুলো মাথা দোলাচ্ছে অনবরত, আর কখনো-কখনো চড়ার কাছে গিয়ে গলা চিরে যাচ্ছে দু'তিন ভাগ হয়ে—সব মিলে হয়ত একটা অশালীন কর্কশতা—কিন্তু সব কিছু অতিক্রম করে সেই উন্মাদনার মাধুর্য—ইহসংসারে কোথাও তার তুলনা নেই। প্রখরতার মধ্যে সে যে কি প্রবলতা, কার সাধ্য তা প্রতিরোধ করে! কার সাধ্য সে অগ্নিমন্ত্রে না

দীক্ষা নেয় মনে-মনে! এ তো শুধু গান নয় এ আহ্বান—বন্ধনবর্জনের আর্তনাদ! কার সাধ্য কান পেতে না শোনে! বুক পেতে না গ্রহণ করে!

এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল!
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল॥
তোদের বন্ধ-কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে, ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।
এই বাঁধন পরেই বাঁধন তোদের করব মোরা জয়
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল ভাঙা কল॥
ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝঞ্চনা
এ যে মুক্তি পথের অগ্রদূতের চরণবন্দনা।
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল॥

একবার গান আরম্ভ করলে সহজে থামতে চায় না নজরুল। আর কার এমন ভাবের অভাব হয়েছে যে নজরুলকে নিবৃত্ত করে। হারমোনিয়মের রিডের উপর দিয়ে খটাখট খটাখট করে ক্ষিপ্তবেগে আঙুল চালায় আর দীপ্তস্বরে গান ধরে:

মোরা ভাই বাউল চারণ মানি না শাসন বারণ
জীবন মরণ মোদের অনুচর রে।
দেখে ঐ ভয়ের ফাঁসি হাসি জোর জয়ের হাসি
অ-বিনাশী নাইক মোদের ডর রে।
যা আছে যাক না চুলায়, নেমে পড় পথের ধূলায়
নিশান দুলায় ঐ প্রলয়ের ঝড় রে।
ধর হাত ওঠরে আবার দুর্যোগের রাত্রি কাবার
ঐ হাসে মার মূর্তি মনোহর রে॥

জীবনে এমন কয়েকটা দিন আসে যা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে স্মৃতিতে—অক্ষরও মুছে যায় ক্রমে-ক্রমে কিন্তু সেই স্বর্ণচ্ছটা জেগে থাকে আমরণ। তেমনি সোনার আলোয় আলো করা দিন এ। রেখা মুছে গেছে কিন্তু রূপটি আছে অবিনশ্বর হয়ে। দুপুরে গঙ্গায় স্নান, বিকালে গঙ্গায় নৌকাভ্রমণ, রাত্রে আহার—এ একটা অমৃতময় অভিজ্ঞতা। বায়ু জল তরু লতা তারা আকাশ সব মধুমান হয়ে উঠেছে—মৃত্যুজিৎ যৌবনের আস্বাদনে। স্থষ্টির উল্লাসে বলীয়ান হয়ে উঠেছে দুর্বার কল্পনা।

সেই রাত্রে আর গান নেই, সুরু হল কবিতা। প্রেমেন একটা কবিতা আবৃত্তি করলে—বোধ হয়, "কবি নাস্তিক"। "বুক দিলে যে, ভুখ দিলে যে, দুখ দিতে সে ভুলল না, মৃত্যু দিলে লেলিয়ে পিছে পিছে।" আমিও অনুসরণ করলাম। "দে গরুর গা ধুইয়ে।" এরা আবার কবিতাও লেখে নাকি? সবাই অভিনন্দন করে উঠল এই প্রথম ও অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারে। বলো, আরো বলো—আরও যটা মুখস্ত আছে।

ফিরতি ট্রেন কখন চলে গিয়েছে। নেমে এসেছে ক্লান্তিহরণ স্তব্ধতা। কিন্তু নৃপেন কাউকে ঘুমুতে দেবে না। যেন একটা ঘরছাড়া অনিয়মের জগতে চলে এসেছি সবাই। দেখলাম, বাড়ি ফিরে না গেলেও চলে, দিব্যি না ঘুমিয়ে আড্ডা দেওয়া যায় সারারাত। প্রতিবেশী হৃদয়ের উত্তাপের পরিমণ্ডলে এসে নবীন স্থষ্টির প্রেরণা লাভ করা যায়, কেননা আমরা জেনে নিয়েছি, আমরা সব এক প্রাণে প্রেরিত। এক ভবিষ্যতের দিশারী।

"বিষের বাঁশী"র ভূমিকায় নজরুল দীনেশরঞ্জনকে উল্লেখ করেছিল "আমার ঝড়ের রাতের বন্ধু" বলে। দীনেশরঞ্জন বয়সে আমাদের সকলের চেয়ে বড়, কিন্তু আশ্চর্য, বন্ধুতায় প্রত্যেকের সমবয়সী, একেবারে

নিভৃততম, দুঃসহতম মুহূর্তের লোক। কি আকর্ষণ ছিল তাঁর, তাঁর কাছে প্রত্যেকের নিঃসঙ্কোচ ও নিঃসংশয় হবার ব্যাকুলতা জাগত। অথচ এত ঘনিষ্ঠতার মাঝেও একদিনের জন্যেও তাঁর জ্যেষ্ঠত্বের সম্ভ্রম হারাননি। তাঁর দৃঢ়তাকে উচ্চতাকে অবনমিত করেননি। নিজে আর্টিস্ট ছিলেন, তাই একটি পরিচ্ছন্ন শালীনতা তাঁর চরিত্রে ও ব্যবহারে মিশে ছিল। তারই জন্যে এত আস্থা হত তাঁর উপর। মনে হত, নিজে নিঃসম্বল হলেও নিঃসম্বলদের ঠিক তিনি নিয়ে যাবেন পরিপূর্ণতার দেশে। নিজে নিঃসহায় হলেও নিঃসহায়দের উত্তীর্ণ করে দেবেন তিনি বিপদ-বাধার শেষে শ্যামলিম সমতলতায়।

দীনেশরঞ্জনের বিদ্রোহ রাজনৈতিক নয়, জীবনবাদের বিদ্রোহ। একটা আদর্শকে সমাজে-সংসারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বৈরাগ্যভূষণ সংগ্রাম। সাংসারিক অর্থে সাফল্য খোঁজেন নি, শুধু একটি ভাবকে সব কিছুর বিনিময়ে ফলবান করতে চেয়েছিলেন। সে হচ্ছে সত্যভাষণের আলো-কে সাহিত্যের পৃষ্ঠায় অনির্বাণ করে রাখা। প্রতিদিনকার সাংসারিক তুচ্ছতার ক্ষেত্রে অযোগ্য এই দীনেশরঞ্জন কত বিদ্রূপ-লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন জীবনে, কিন্তু আদর্শভ্রষ্ট হননি। তাঁর দীপায়নের উৎসবে ডাক দিয়ে আনলেন যত "হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথার" ঘরছাড়াদের। বললেন, অমৃতের পুত্রকে কে বলে গৃহহীন? এই ঘরছাড়াদের নিয়েই ঘর বাঁধব আমি। থাকব সবাই মিলে একটা ব্যারাক বাড়িতে। কেউ বিয়ে করব না। বিভক্ত হব না। থাকব অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতায়। সাহিত্যের ব্রতে একনিষ্ঠ হব। মৃত্যুর পরে কোনো সহজ সুন্দর পরলোক চাই না, এই জীবনকেই নব-নব সৃষ্টির ব্যঞ্জনায় অর্থ দেব, মূল্য দেব নব-নব পরীক্ষায়।

কিন্তু গোকুলের বিদ্রোহ সাহিত্যিক বিদ্রোহ। গোকুলকে থাকতে হত তার ব্রাহ্ম মামাবাড়িতে নানারকম বিধি-বিধানের বেড়াজালে।

সে বাড়িতে গোকুলকে গলা ছেড়ে কেউ ডাকতে পেত না বাইরে থেকে, কোনো মুহূর্তে জামা খুলে খালি-গা হতে পারত না গোকুল। এমন যেখানে কড়া শাসন,—সেখান থেকে আর্টস্কুলে গিয়ে ভর্তি হল। তার অভিভাবকদের ধারণা, আর্টস্কুলে যায় যত বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো ছেলে, এবার আর কি, রাস্তায়-রাস্তায় বিড়ি ফুঁকে বেড়াও গে। শুধু আর্ট স্কুল নয়, সেই বাড়ি থেকেই সিনেমায় যোগ দিলে গোকুল। "সোল অফ এ স্লেভ" ছবিতে নামল একটি বিদূষকের পার্টে। সহজেই বুঝতে পারা যায় কত বড় সংঘর্ষ করতে হয়েছিল তার সেদিনকার সেই পরিপার্শ্বের সঙ্গে। নীতি-রীতির কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে। কিছু-কিছু তার ছায়া পড়েছে "পথিকে" :

"মায়া উঠিয়া মুখ ধুইয়া আসিয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে গান ধরিল—

তোমার আনন্দ ঐ এলো দ্বারে
এলো—এলো—এলো গো !
বুকের আঁচলখানি I beg your pardon, miss—
সুখের আঁচলখানি ধূলায় পেতে
আঙ্গিনাতে মেল গো—'

নাঃ, আমার মুখটা দেখছি সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে। ভাগ্যিস কেউ ছিল না—'বুকের আঁচল' বলে ফেলেছিলাম !

দীপ্তি হাসিয়া বলিল—বাবা ! দিদি, তোকে পারবার যো নেই !

মায়া। কেন, দোষটা শুধরে নিলাম তাতেও অপরাধ ?

দীপ্তি। ওর নাম দোষ শুধরে নেওয়া ? ও ত চিমটি কাটা।

মায়া। তা হলে আমার দ্বারা হয়ে উঠল না সভ্য হওয়া। তোদের মত ভাল মেয়ের পাশে থেকে যে একটু-আধটু দেখে শুনেও শিখব, তাও দিবি না? আচ্ছা সবাই এত রেগে যায় কেন বলতে পারিস?

সেদিন যখন কমলা ঐ গানটা গাইছিল, মিসেস ডি এমন করে তার দিকে তাকালেন যে বেচারীর বুকের আঁচল বুকেই রইল, তাকে আর ধূলায় মেলতে হল না। মিসেস ডি বলে দিলেন, বই-এ ওটা ছাপার ভুল কমল, সুখের আঁচল হবে—

কমলা বলল—কিন্তু রবিবাবুকে আমি ওটা বুকের আঁচল—

মিসেস ডি বলিল—তর্ক কোর না, যা বলছি শোন। আর কমলাটারও আচ্ছা বুদ্ধি! না হয় রবিবাবু গেয়েছিলেন বুকের আঁচল—কিন্তু এদিকে বুকের আঁচলটা ধূলায় পাততে গেলে যে ব্যাপারটা হবে তার সম্বন্ধে কবির অনভিজ্ঞতাকে কি প্রশ্রয় দেওয়া উচিত?…"

"বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন—আজকের ব্যাপারের হোষ্টেস কে?

দীপ্তি। দিদি।

মায়া ফোঁস করিয়া উঠিল—হাঁ, তা-ত হবেই, ছাই ফেলতে এমন ভাঙা কুলো আর কে আছে বল?

করুণা বলিলেন—ঝগড়াঝাঁটির দরকার কি? মেয়েদের মত তোদের ত আর সঙ্গে নিয়ে এক টেবিলে খেতে হবে না—তোরা খাওয়াবি।

মায়া বলিল—তাও ত বটে।

সুবর্ণ। টেবিলে! তার মানে? ওরা কি কখনো টেবিলে খেয়েছে? একটা বিদঘুটে কাণ্ড না করে তোমরা ছাড়বে না দেখছি। চিবোনো জিনিষগুলো চারদিকে ছড়িয়ে ফেলবে—মুখে ভাত তোলার সময় সর-সর শব্দের সঙ্গে ঝর-ঝর করবে। হাতটা চাটতে চাটতে কনুই পর্য্যন্ত গিয়ে ঠেকবে—

মায়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা মা, তুমি কি কোনদিন ওঁদের খেতে দেখেছ?

স্থবর্ণ। দেখব আবার কি। মেসে থাকে, এক সঙ্গে পঞ্চাশজনে মিলে বাইরের কলে চান করে আর চেঁচামেচি কাড়াকাড়ি করে খায়—আমাদের কপূরীটোলা লেনের বাড়ীর ছাদ থেকে একটা মেস স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, ছেলেগুলো শুধু-গায়ে বিছানার ওপর শুয়ে শুয়ে পড়ে, আর পড়ে তো কত! খাটের ছৎরিতে ময়লা গামছা আর ঘরের কোণে গামলায় পানের পিক, এ থাকবেই।"

"কল্যাণী বলিল,—মুনিবাবু, আপনি আমার খুব কাছে কাছে থাকুন না—

মুনি কিছু বুঝিতে না পারিয়া কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিল।

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—জানেন না বুঝি, এটা ব্রাহ্মপাড়া। চারপাশের জানালাগুলোর দিকে একটু ভাল করে চেয়ে দেখুন, দেখবেন, কত ছোটবড় কত রকমের সব চোখ ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। আধঘণ্টার মধ্যেই গেজেট ছাপা হয়ে যাবে। ঐ যে প্রকাণ্ড হলদে রং-এর বাড়ীটা দেখছেন ওটা হচ্ছে মিসেস ডির বাড়ী, ওঁকে চেনেন না?

মুনি ভীতভাবে বলিল—চলুন নীচে যাই, দরকার নেই ওসব গণ্ডগোলে।

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—এই আপনার সাহস?

মুনি বলিল— তলোয়ারের চেয়ে জিভটাকে আমি ভয় করি। চলুন—

কল্যাণী বলিল—It's too late. ঐ দেখুন—

মুনি দেখিল প্রায় প্রত্যেক জানালা হইতে মেয়েরা বিশেষ আগ্রহের সহিত দেখিতেছে।"

"মিস লতিকা চ্যাটার্জ্জি তাহার মাতাকে বলিল—মা, আমি এই গোল্ড-গ্রে শাড়ীটার সঙ্গে বাফ ব্লাউজটা পরব?

মিসেস চ্যাটার্জ্জি। ওটা না তুই মিসেস গুপ্তর পার্টিতে পরে গিয়েছিলি!

লতিকা। তবে এই ফ্লেম কলারের শাড়ী আর স্যামন পিঙ্ক ব্লাউজটা পরি, কি বল মা?

মিসেস চ্যাটার্জ্জি। মরি মরি, যে না রূপের মেয়ে, ঠিক যেন কয়লার বস্তায় আগুন লেগেছে মনে হবে।

তাহার পর মাতা এবং কন্যার মধ্যে যে প্রহসন সুরু হইল তাহার দর্শক কেহ থাকিলে দেখিত, কাপড় জামা ঘরময় ছড়াইয়া লতিকা তাহার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় হাত-পা ছুঁড়িতেছে এবং তাহার মাথার কাছে বসিয়া মিসেস চ্যাটার্জ্জি তাহাকে কিলাইতেছেন।"

নজরুলের যেমন ছিল "দে গরুর গা ধুইয়ে", গোকুলের তেমনি ছিল, "কালী কুল দাও মা, নুন দিয়ে খাই।" এমনিতে ক্লান্ত-কঠিন গম্ভীর চেহারা, কিন্তু শুকনো বালি একটু খুঁড়তে পেলেই মিলে যাবে শীতল স্নিগ্ধ জলস্পর্শ। দীনেশ আর গোকুল দুজনেই সংসারসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত, দুজনেই অবিবাহিত—দুজনের মাঝেই দেখেছি এই স্নেহের জন্যে শিশুর মত কাতরতা। স্নেহ যে কত প্রবল, স্নেহ যে কত পবিত্র, স্নেহ যে মানুষের কত বড় আশ্রয় তা দুজনেই তাঁরা বেশি করে বুঝতেন বলে তাঁরা দুজনেই স্নেহে এত অফুরন্ত ছিলেন।

প্রেমেন ঢাকায় ফিরে যাবে, আমি আর শৈলজা তাকে শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে তুলে দিলাম। প্রেমেন লিখলে ঢাকা থেকে:

অচিন,

এই মাত্র 'কল্লোল' অফিস থেকে 'সংক্রান্তির' ফাইলের সঙ্গে তোর, শৈলজার আর দীনেশবাবুর চিঠি পেলুম।

সারাদিন মনটা খারাপই ছিল। খারাপ থাকবারই কথা। কলেজে যাই না, এখানেও জীবনটা অপব্যয় করছি। কিন্তু তোদের চিঠি পেয়ে এমন আনন্দ হল কি বলব।

ভাই, একটা কথা তোকে আগেও একবার বলেছি, আজও একবার বলব—না বলে পারছি না। ছাখ ভাই, জীবনে অনেক কিছুই পাইনি, কিন্তু যা পেয়েছি তার জন্যে একবার কৃতজ্ঞ হয়েছি কি? এই বন্ধুদের ভালবাসা—এর দাম কি কোন ভালবাসার চেয়ে কম? এর দাম আমরা সব চুকিয়ে কি দিতে পেরেছি?

আদিম মানুষ অর্ধসভ্য মানুষ ছিল একক, হিংস্র। সে আরেকটা পুরুষকে কাছে ঘেঁষতেও দিত না। (উদ্বর্তনের গোড়ার দিকের কথা বলছি) নারীর প্রতিও তার কাম তখনও প্রেমে রূপান্তরিত হয়নি। তারপর অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। তবু হুইটম্যান যখন sexless loveএর কথা প্রথম প্রচার করেছিলেন অনেকেই মনে-মনে হেসেছিল, এখনও অনেকে হয়ত হাসে। কিন্তু আমি জানি ভাই, মানুষ পশুত্বের সে-স্তর ছাড়িয়ে এখন যে-স্তরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে সেখানে যৌনসম্বন্ধ ছাড়াও আর একটা সম্বন্ধ মানুষের সঙ্গে মানুষের হওয়া সম্ভব। কথা ভাল করে হয়ত বোঝাতে পারলুম না। তবুও তুই বুঝতে পারবি জানি।

এই যে প্রেম, মানুষের অন্তরের এই যে নতুন এক প্রকাশ এটা এত দিন সম্ভব ছিল না। যৌনমিলনপিপাসা ও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে দরকারী ক্ষুধা ও প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করতেই একদিন মানুষের দিন কেটে যেত। নিজের অন্তরের গভীরতর সত্যকে তলিয়ে খুঁজে-বুঝে দেখবার অবসর তার ছিল না। আজ কয়েকজনের হয়েছে বা কয়েকজন সে অবসর করে নিয়েছে।

জীবনের চরম সার্থকতা এই প্রেমের জাগরণে। যতদিন না এই

প্রেম জাগে ততদিন মানুষ খণ্ডিত থাকে, সে নিজেকে পায় না সম্পূর্ণ করে। কিন্তু বন্ধুর মাঝে যেই সে আপনাকে প্রসারিত করে দিতে পারে তখনই সে-খণ্ডতার হীনতা দুঃখ ও লজ্জা থেকে মুক্তি পেয়ে সার্থক হয়। আমি যতদিন বন্ধুকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতে না পারি ততদিন আমার দরজা বন্ধ থাকে। যে পথে আনন্দময় পৃথিবীর চলাচল সে-পথ আমি পাই না।

কথাটাকে কিছুতেই গুছিয়ে ভাল করে বলতে পারছি না, শুধু অন্তরে অনুভব করছি এর সত্য। এইটুকু বুঝতে পারছি প্রিয়া আমার জীবনের যতখানি, বন্ধু তার চেয়ে কম নয়। এই কমরেডশিপের মূল্য হুইটম্যান প্রথম বোঝাতে চেষ্টা করেন। আমরাও একটু বুঝেছি মনে হয়। এখানে হুইটম্যান থাকলে সেই জায়গাটা একটু তুলে দিতুম।

বন্ধুত্ব, কমরেডশিপ ইত্যাদি কথাগুলো সব জাতির ভাষাতেই বহুকাল ধরে চলে আসছে, কিন্তু এই বন্ধুত্ব কথাটার ভেতরকার অর্থের গভীরতা দিন দিন মানুষ নতুন করে উপলব্ধি করছে। পঞ্চাশ বছর আগে এ কথাটার মানে যা ছিল আজ তা নেই, আকাশের মত এ কথাটার অর্থের আর সীমা, বিস্ময়ের আর পার নেই।

আমার অন্তরের দেবতা তোর অন্তরের দেবতার মিলন-প্রয়াসী, তাই তো তুই আমার বন্ধু। আমরা নিজেদের অন্তরের দেবতাকে চিনি না ভাল করে, ক্রমাগত চেনবার চেষ্টা করছি মাত্র। বন্ধুর ভেতর দিয়েই তাকে ভালো করে চিনি।

শুধু প্রিয়াকে পেল না বলে যে কাঁদে, সে হয় মূর্খ, নয় যৌনপিপাসার স্তরে আবদ্ধ অন্ধ। প্রিয়ার মাঝেও যতক্ষণ না এই বন্ধুকে খুঁজি ততক্ষণ প্রিয়াকে পূর্ণ করে পাই না। যে প্রেম বৃহৎ সে প্রেম মহৎ। সে প্রেম প্রিয়ার মাঝে এই বন্ধুকে খোঁজে বলেই বৃহৎ ও মহৎ। প্রিয়ার মাঝে শুধু নারীকে খুঁজত ও খোঁজে পশু।

অনেকক্ষণ বকলুম। তোর ভাল লাগবে কি এই একঘেয়ে বক্তৃতা? তবু না বলে পারি না, কারণ তুই যে আমার "বন্ধু"।

দিন-দিন নিজের অজ্ঞাতে একটা বিশ্বাস বাড়ছে যে মৃত্যুই চরম কথা নয়। "কিরণ*" অর্থহীন জীবন বুদ্বুদ ছিলনা—আরো কিছু—কি?

চিঠি দিস, ওখানকার সব খবর লিখিস। খুব লম্বা চিঠি দিবি। আভ্যুদয়িকের খবর, 'কল্লোল' আফিসের খবর, শৈলজা, মুরলীদা, শিশির, বিনয়ের খবর ইত্যাদি ইত্যাদি সব চাই। পড়াশুনা করছি না মোটে। কি লিখছিস আজকাল? সেদিন যিনি ফল খেতে দিলেন তিনিই কি তোর মা? তোর মাকে আমার প্রণাম দিস।—তোর প্রেমেন্দ্র মিত্র

* কিরণ দাশগুপ্ত। আমাদের বন্ধু। আত্মহত্যা করে।

সাত

ঘোর বর্ষায় পথ-ঘাট ডুবে গেলেও আড্ডা জমাতে আসতে হবে তোমাকে কল্লোল-আপিসে—তা তুমি ভবানীপুরেই থাকো বা বেলেঘাটায়ই থাকো। আর সোমনাথ আসত সেই কুমোরটুলি থেকে। সোমনাথের যেটা বাড়ি তার নিচেটা চালের আড়ত, সারবাঁধা চালের বস্তায় ভর্তি। উপরে উঠে গিয়ে চালের গাদি পেরিয়ে সোমনাথের ঘর। একটা জলজ্যান্ত প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদ শুধু তার ঘরে নয়, চেহারায়ও। গদির মালিকদের পরনে আটহাতি ধুতি, গা খালি, গলায় তুলসীর কণ্ঠী। সোমনাথের পরনে ঢিলেঢালা অঢেল পাঞ্জাবি, লম্বা লোটানো কোঁচা, অতৈললাঞ্ছিত চুল ফাঁপিয়ে-ফাঁপিয়ে ব্যাকব্রাশ করা। সব মিলিয়ে একটা উদ্ধত বিদ্রোহ সন্দেহ নেই, কিন্তু দেখতে যেমন সৌম্যদর্শন, শুনতেও তেমনি অতিনম্র। মোলায়েম মিষ্টি হেসে একটু বা চিবিয়ে-চিবিয়ে কথা বলে, কথায় পরিহাসের রসটাই বেশি। অথচ এদিকে খুব বেশি সিরিয়স—পড়ছে মেডিকেল কলেজে। ডাক্তারি করবে অথচ গল্প লিখছে "ভারতী"তে, কাগজ বের করেছে "ঝর্ণা" বলে। (একটা স্মরণীয় ঘটনার জন্যে ও কাগজের নাম থাকবে, কেননা ও-কাগজেই সত্যেন দত্তের "ঝর্ণা" কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।) এ হেন সোমনাথ, হঠাৎ শোনা গেল, ব্রাহ্ম হচ্ছে। সখের ব্রাহ্ম নয়, কেতাদুরস্ত ব্রাহ্ম। গোকুলই খবর নিয়ে এল তার দীক্ষার দিন কবে। স্থান ভবানীপুর সম্মিলন সমাজ। গেলাম সবাই মজা দেখতে। গিয়ে দেখি গলায় মোটা ফুলের মালা পরে সোমনাথ ভাবে গদ্‌গদ্‌ হয়ে বসে আছে আর আচার্য সতীশ চক্রবর্তী ফুল দিয়ে সাজানো বেদী থেকে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়ে তাকে দীক্ষিত করছেন। বহু চেষ্টা করে চোখের সঙ্গে চোখ মিলিয়েও তাকে টলানো

গেল না, ধর্মবিশ্বাসে সে এত অবিচল! ব্যাপার কি? মনোবনবিহারিণী কোনো হরিণী আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু, কি পরিহাস, কিছুকাল পরে বিধিমত হিন্দুমতে সমাজমনোনীত একটি পাত্রীর পাণিগ্রহণ করে বসল। সোমনাথ সাহা কল্লোল-যুগের এক ঝলক বাসন্তী হাওয়া।

সমস্ত বিকেলে হৈ-চৈ-হল্লার পর সন্ধ্যোত্তীর্ণ অন্ধকারে গোকুলের সঙ্গে একান্ত হবার চেষ্টা করতাম। কল্লোল-আপিসে একখানি যে চটের ইজিচেয়ার ছিল তা নিয়ে সারাদিন কাড়াকাড়ি গেছে—এখন, নিভৃতে তাইতেই গা এলিয়েছে গোকুল। পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে বুঝি? সারাদিন সুবোধকে "পথিকে"র শ্রুতলিপি দিয়েছে। তারই জন্যে কি এই ক্লান্তি? মনে হত, শুধু শারীরিক অর্থেই যেন এ ক্লান্তির ব্যাখ্যা হবে না। যেন আত্মার কোন গভীর নিঃসঙ্গতা একটি মহান অচরিতার্থতার ছায়া মেলেছে চারপাশে; হয়তো অন্ধকার আর একটু ঘন ও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেই তার আত্মার সেই গভীর স্বগতোক্তি শুনতে পাব।

কিন্তু নিজের কথা এতটুকুও বলতে চাইত না গোকুল। বলতে ভালোবাসত ছেলেবেলাকার কথা। সতীপ্রসাদ সেন—আমাদের গোরাবাবু—গোকুলের সতীর্থ, নিত্যি যাওয়া-আসা ছিল তার বাড়িতে, রূপনারায়ণ নন্দন লেনে। গোরাবাবুদের বাড়ির সামনের শীতলাতলায় বৈশাখ মাসে তিন দিন ধরে যাত্রা হত, শলমা-চুমকির পোশাক-পরা রাজা-রানি-সখির দল সরগরম করে রাখত সেই শীতলাতলা। প্রতি বৎসর গোরা-বাবুদের বাড়ির ছাদে বসে সারারাত যাত্রা শুনত গোকুল—একবার কেমন বেহালা নিয়ে এসেছিল সখীদের গানগুলো বেহালায় তুলে নেবার জন্যে। কিম্বা বলতে চাইত আরো আগের কথা। সেই যখন সাউথ সুবার্বান স্কুলে ফিফ্‌থ ক্লাশে এসে ভর্তি হল। অত্যন্ত লাজুক মুখচোরা ছেলে, ক্লাশের লাস্ট বেঞ্চিতে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা। আলিপুরে মামার বাড়িতে থাকে, মামা ব্রাহ্ম, তাই তার কথাবার্তায় চালচলনে একটা চকচকে গোছ-

গাছ ভাব সকলের নজরে না পড়ে যেত না। তার উপর মার্বেল ডাণ্ডাগুলি চু-কপাটি খেলবে না কোনোদিন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে, আর নাকি খাতার পাতায় ছবি আঁকে, কবিতা লেখে। রাষ্ট্র হয়ে গেল, ও বেহ্মজ্ঞানী। সে নাজানি কি রকম জীব, ছেলেরা মন খুলে মিশত না, কপট কৌতূহলে উঁকিঝুঁকি মারত। মাস্টার-পণ্ডিতরাও টিটকিরি দিতে ছাড়তেন না। ফোর্থ ক্লাশে যখন পড়ে তখন ওর খাতায় কবিতা আবিষ্কার করে ওর পাশের এক ছাত্র পণ্ডিতমশায়ের হাতে চালান করে দেয়। পড়ে পণ্ডিতমশায় সরাসরি চটে উঠতে পারলেন না, ছন্দে-বন্ধে কবিতাটি হয়তো নিখুঁত ছিল। শুধু নাক সিঁটকে মুখ কুঁচকে বলে উঠলেন: 'এতে যে তোদের রবিঠাকুরের ছায়া পড়েছে! কেন, মাইকেল হেম নবীন পড়তে পারিস না? রবিঠাকুর হল কিনা কবি! তার আবার কবিতা! আহা, লেখার কি নমুনা! 'রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়, রাজার মেয়ে যেত তথা—' "তথা"—কথাটা এমন মুখভঙ্গি করে ও হাত নেড়ে উচ্চারণ করলেন যে ক্লাশশুদ্ধ ছেলেরা হেসে উঠল।

মেজবৌদি গোকুলের জন্যে খাবার পাঠিয়ে দিলেন। কি করে খবর পেয়েছেন তিনি গোকুল আজ সারাদিন ধরে উপবাসী। বাড়িতে ফিরতে তার দেরি হয় বলে সে সাফাই নিয়েছে বাইরে খেয়ে-আসার। তার মানে, প্রায় দিনই একবেলা অভুক্ত থাকবার। কোনো-কোনোদিন আরো নির্জন হবার অভিলাষে সে বলত, চলো, এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত হাঁটি, তার মানে তখনো বুঝতে পারিনি পুরোপুরি। তার মানে, গোকুলের কাছে পুরোপুরি ট্র্যামভাড়া নেই।

অথচ এই গোকুল কোনো-কোনোদিন নৃপেনের পাশ ঘেঁসে বসে অলক্ষ্যে তার বুক-পকেটে টাকা ফেলে দিয়েছে যখন বুঝেছে নৃপেনের অভাব প্রায় অভাবনীয়।

অথচ যখন কথা বলতে যাও গোকুলের মুখে হাসি আর রসিকতা ছাড়া কিছু পাবে না। সুর করে যখন সে পূর্ববাংলার কবিতা বলত তখন অপরূপ শোনাত :

পদ্মা-পাইড়া রাইয়তগ লাঠি হাতে হাতে
গাঙের দিকে মুখ ফিরাইয়া ভাত মাখেন পাতে।
মাখা ভাতটি না ফুরাতেই ভাইঙ্গা পড়ে ঘর
সানকির ভাত কোছে ভইরা খোজেন আরেক চর।
টানদেশী গিরস্তগ ঘাপকালান্ত্যা ঘটি
আটুজলে ডুব দেন আর বুকে ঠেকে মাটি।
আপনি পাও মেইল্যা বইস্যা উক্কায় মারেন টান,
একপহরের পথ ভাইঙ্গা বউ জল আনবার যান।

সাতাশ নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে একটা একদুয়ারী এক চিলতে ঘরে "কল্লোলে"র পাবলিশিং হাউস খোলা হয়। আপিস থাকে সেই পটুয়াটোলা লেনেই। তার মানে সন্ধের দিকের তুমুল আড্ডাটা বাড়ির বৈঠকখানায় না হয়ে হাটের মাঝখানে দোকানঘরেই হওয়া ভালো। সেই চিলতে ঘরে সবাইর বসবার জায়গা হত না, ঘর ছাপিয়ে ফুটপাতে নেমে পড়ত। সেই ঘরকেই নজরুল বলেছিল "একগাদা প্রাণভরা একমুঠো ঘর।" সেই একমুঠো ঘরেই একদিন মোহিতলাল এসে আবির্ভূত হলেন। আমরা তখন এক দিকে যেমন যতীন সেনগুপ্তের পেসিমিজম-এ মশগুল, তেমনি মোহিতলালের ভাবঘন বলিষ্ঠতায় বিমোহিত। মোহিতলালকে আমরা মাথায় তুলে নিলাম। তিনি এসেই কবিতা আবৃত্তি করতে সুরু করলেন, আর সে কি উদাত্তনিস্বন মধুর আবৃত্তি! কবিতার গভীর রসে সমস্ত অনুভূতিকে নিষিক্ত করে এমন ভাবব্যঞ্জক আবৃত্তি শুনিনি বহুদিন। দেবেন সেনই আবৃত্তি করতে ভালোবাসতেন। আজো তাঁর সেই ভাবগদগদ

কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি, দেখছি তাঁর সেই অর্ধমুদ্রিত চক্ষুর সূক্ষ্ম শুভ্ররেখা।

চাহি না আনার যেন অভিমানে ক্রূর
আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজসুন্দরীর,
চাহিনাক 'সেউ' যেন বিরহবিধুর
জানকীর চিরপাণ্ডু বদন রুচির।
একটুকু রসে ভরা চাহি না আঙুর
সলজ্জ চুম্বন যেন নববধূটির,
চাহিনা 'গয়া'র স্বাদ, কঠিনে মধুর
প্রগাঢ় আলাপ যেন প্রৌঢ় দম্পতির।

কল্লোল-পাবলিশিং হাউস থেকে প্রথম বই বেরোয় সুবোধ রায়ের "নাটমন্দির"—তিনটি একাঙ্ক নাটিকার সঙ্কলন। আর চতুষ্কলা ক্লাবের খানকয় পুরানো বই, "ঝড়ের দোলা" বা "রূপরেখা"—তার বিষয়বিভব। আর, সর্বোপরি, নজরুলের "বিষের বাঁশী" জমায় রেখে হুহু করে যে বেচতে পারছে এই তার ভবিষ্যতের ভরসা।

তেরোশ একত্রিশ সালের পূজার ছুটিতে কলকাতার বাইরে বেড়াতে যাই। সেখানে দীনেশদা আমাকে চিঠি লিখেন :

সোমবার
৩রা কার্তিক, ১৩৩১
সন্ধ্যা ৭-৩০ টা

পথের ভাই অচিন্ত্য,

কিছুদিন হল তোমার সুন্দর চিঠিখানি পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি। তোমাকে ছাড়া আমাদেরও কষ্ট হচ্ছে—কিন্তু যখন ভাবি হয়ত ওখানে থেকে তোমার শরীর একটু ভাল হতে পারে তখন মনের অতখানি কষ্ট থাকে না।

হয়ত এরই মধ্যে পবিত্র ও ভূপতির বড় চিঠি পেয়েছ। কি লিখেছে তারা তা জানি না, তবে এটা শুনেছি যে পত্র দুখানাই খুব বড় করে লিখেছে।

আজ সারাদিন খুব গোলমালে গেল। এই কিছুক্ষণ আগে মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা আমার শেষ হল। শৈল, মুরলী, গোকুল, নৃপেন, পবিত্র ভূপতি প্রভৃতি কল্লোল আপিস ছেড়ে গেল। আমি স্নান সেরে এসে নিরালায় তাই তোমার কাছে এসেছি। এইটুকু আমার সময়—কিন্তু তাও কেউ কেউ আসেন কিংবা মনের ভিতরই গোলমাল চলতে থাকে।

কাল রবিবার গেল, মুরলীদার বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা জোর আড্ডা বসেছিল। চা, পান, গান, মান, অভিমান সবই খুব হল। বীরেনবাবু ও জ্ঞানাঞ্জন পাল মহাশয়রাও ছিলেন।

"রূপরেখা"র বেশ একটা রিভিয়ূ বেরিয়েছে Forward-এ কালকের।

"নাটমন্দির"ও আজ বেরিয়ে গেল। এবার তোমাদের পালা। একখানা করে সবাইকার বের করতেই হবে। কেমন? অন্তত একশটি টাকা আমাকে প্রথম এনে দাও, আর তোমাদের লেখাগুলি, তা হলেই কাজ স্ুরু করে দিতে পারি।

প্রেমেন এসেছে ফিরে, তাকেও জোর দিয়েছি। সে তো একটু seriouslyই ভাবছে।

শৈলজার "রাঙাশাড়ী"খানা যদি পাওয়া যায়—যেতেও পারে—তা হলে তো কথাই নেই।

তোমার "চাষা-কবি" এখনও পেলাম না কেন? এতই কি কাজ যে কপি করে আজও পাঠাতে পারলে না? তোমার কবিতাটিই যে আগে যাবে, সুতরাং কবিতা পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত করবে। এবারে প্রেমেনের "কমলা কেবিন"টা ফিরিয়ে পেলে হয়তো যাবে। তুমি না থাকাতে তার

যথেষ্ট একলা লাগছে বুঝতে পারি। সত্যি, বেচারার একটা আস্তানা নেই যে খাবে থাকবে।

কিন্তু এরকমই থাকব সব? না, তা হবে না—এই মাটি খুঁড়ে তা হলে শেষ চেষ্টা করে যাব। আমরা তো সইলাম আর বুঝলাম কিছু-কিছু। কিন্তু যে কষ্ট নিজেরা পেলাম তা কি পরকে জেনে-শুনে দিতে পারি? ঐ সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনাগত অযুত সংখ্যক কালকের মানুষের দল, তারা এসেও কি এই ভোগই ভুগবে? আমাদের এই সত্যের নির্বাক যুদ্ধ জয় করে রাখবে বাংলার প্রাণের প্রান্তে-প্রান্তে সবুজ পাতার বাসা। নীড়হারা পথহারা নীল-আকাশের রং-লাগানো নীলপাখীর দল একেবারে সোজা সবুজ পাতার বাসায় গিয়ে আশ্রয় নেবে। পথের বাঁকের বিরাট আয়ুবৃদ্ধ বটগাছ দেখবে বাংলার প্রান্ত হতে প্রান্তে রুক্ষরূপের বক্ষভেদ করে ফুটে আছে অপরাজিতার দল।

কি জানি কতদূর হবে! যদি না থাকি!

আহা, বাঁচুক তারা যারা আসছে। বেচারারা কিছু জানে না, বিশ্বাস ভাঙিয়ে সাদা মনের সওদা কিনতে গিয়ে কিনছে কেবল ফুটো আর পচা! তারা যে তখন কাঁদবে। আহা, যদি তাদের মধ্যে এমন কেউ থাকে যে সে ভেঙে পড়বে, পৃথিবীকে অভিশাপ দিয়ে ফেলবে? না, না, তাদের জন্য কিছু রেখে যেতে পারব না আমরা কজনে?

পলিটিক্স বুঝি না, ধর্ম মানি না, সমাজ জানি না—মানুষের মনগুলি যদি সাদা থাকে—ব্যস্, তা হলেই পরমার্থ।

তোমাকে একটা কথা বলছি কানে-কানে। মনটার জন্য একটা চাবুক কেনো। চাবুক মেরো না যেন কখনও, তাহলে বিগড়ে যাবে। মাঝে-মাঝে কেবল সপাং-সপাং করে আওয়াজ করবে—মনের ঘরের যে যেখানে ছিল দেখবে সব এসে হাজির। ভয়ও না ভাঙে, ভয়ও না থাকে—এমনি করে রাখতে হবে।

আর একটা কথা—ভালবাসাটাকে খুঁজে বেড়িও না। ওটা ঘোড়ার পায়ের নালও নয় আর মাটির তলায় মোহরের কলসীও নয়। হাতড়ে চললেই হোঁচট খাবে। তবে কোথায় আর কবে সত্যিকারের ভালবসবার মত ভালবাসাটুকুকে পাবে তা জানবার চেষ্টাও করো না। থানেখানে পাওয়া যায়—সবটুকু রসগোল্লার মত একজায়গার তাল পাকিয়ে রসের গামলায় ভাসেনা।

ঝড়ের দিনে শিল কুড়োয়না ছেলেমেয়েরা? কুড়োতে-কুড়োতে দু একটা মুখেই দিয়ে ফেলে আর সব জড় করে একটা তাল পাকায়, সেটা আর চোষে না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আর দেখে। কত রঙের খেলা ঘুরতে থাকে—আর মাঝে-মাঝে ঠাণ্ডা হাত নিজেরই কপালে চোখে বুলোয়। কুড়োবার সময়ও ঝড়ের যেমন মাতন, যারা শিল কুড়োয় তাদেরও তেমনি ছুটোছুটি হট্টগোল! কোনটা ঠকাস করে মাথায় পড়ে, কোনটা পায়ের কাছে ঠিকরে পড়ে গুঁড়িয়ে যায়, কোনটা বা এক ফাঁকে গলার পাশ দিয়ে গলে গিয়ে বুকের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কুড়োনো শেষ হলে আর গোল থাকে না, সব চুপচাপ করে তাল পাকায় আর নিজের সংস্থান ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে।

বিয়ে করতে চাও? চাকরী দেখ। অন্ততঃপক্ষে দেড়শ টাকার কমে হবেই না। তাও নেহাৎ দরিদ্রমতে—প্রেম করা চলবে না। যদি সমাজকে ডিঙিয়ে যেতে চাও—তাহলে অন্তত দুশো আড়াই শো।

শরীরের খবর দিও। লেখা immediately পাঠাবে। দেরী করোই না। ভালবাসা জেনো।

তোমাদের দীনেশদা

এর দিন কয়েক পরে গোকুলের চিঠি পাই:

'কল্লোল'

১০-২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা
১১ই কার্তিক, ৩১

স্নেহাস্পদেষু

তোমার চিঠি যখন পাই তখন উত্তর দেবার অবস্থা আমার ছিল না। অবস্থা যখন ফিরে পেলাম তখন মনে হল—কি লিখব? লেখবার কিছু আছে কি? চোখের সামনে বসে পবিত্র পাতার পর পাতা তোমায় লিখেছে দেখেছি, ভূপতি নাকি এক ফর্মা ওজনের এক চিঠি লিখেছে, দীনেশও সম্ভবত তাই। আর কে কি করেছে তা তুমিই জান, কিন্তু আমার বেয়াদবি আমার কাছেই অসহ্য হয়ে উঠছিল। তাই আজ ভোরে উঠেই তোমাকে লিখতে বসেছি। আমার শরীর এখন অনেকটা ভাল। তোমার প্রথমকার লেখা চিঠিগুলো থেকে যেকথা আমার মনে হয়েছিল তোমার পবিত্রকে লেখা দ্বিতীয় চিঠিতে ঠিক সেই সুরটি পেলাম না। কোথায় যেন একটু গোল আছে। প্রথমে পেয়েছিলাম তোমার জীবনের পূর্ণ বিকাশের আভাস, কিন্তু দ্বিতীয়টা অত্যন্ত melodramatic. দেখ অচিন্ত্য, যে বলে 'দুঃখকে চিনি', সে ভারী ভুল করে। 'অনেক দুঃখ পেয়েছি জীবনে' কথাটার সুর অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। মনের যে কোন বাসনা ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অতৃপ্ত থাকলেই যে অশান্তি আমরা ভোগ করি তাকেই বলি 'দুঃখ', কিন্তু বাস্তবিক ও দুঃখ নয়। যে বুকে দুঃখের বাসা সে বুক পাথরের চেয়েও কঠিন, সে বুক ভাঙ্গে না টলে না। দুঃখের বিষদাঁত ভেঙ্গে তাকে নির্বিষ করে যে বুকে রাখতে পারে সেই যথার্থ দুঃখী। ভিখারী, প্রতারিত, অবমানিত, ক্ষুধার্ত—এরা কেউই 'দুঃখী' নয়। খৃষ্ট দুঃখী ছিলেন না, তিনি চিরজীবন চোখের জল ফেলেছেন, নালিশ করেছেন, অভিশাপ দিয়েছেন, অভিমান করেছেন। গান্ধী যথার্থ দুঃখী। এবার ক্ষুধা, অশান্তি, ব্যথার প্রত্যেকটি stage-এর সঙ্গে মিলিয়ে নাও, বুঝতে পারবে দুঃখ কত বড়। সবাই যে কবি হতে পারেনা তার কারণ

এই গোড়ায় গলদ। অত্যন্ত promising হয়েও melodramatic monologue-এর সীমা এড়িয়ে যেতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তিগত অতৃপ্তি ও অশান্তির ফর্দ করে যায়, তাই সেটাকে মানুষ বলে সখের দুঃখ। যাক বাজে কথা, কতকগুলো খবর দিই :

হঠাৎ কেন জানি না পুলিশের কৃপাদৃষ্টি আমাদের উপর পড়েছে, আমাদের আপিস দোকান সব খানাতল্লাস হয়ে গেছে, আমরা সবাই এখন কতকটা নজরবন্দী—'1818 Act 3' তে।

নৃপেন বিজলী আপিসে কাজ করছে। শৈলজার 'বাংলার মেয়ে' বেরিয়েছে, সে এখন ইকড়ায়। মুরলীর জ্বর হয়েছিল। প্রেমেনের 'অসমাপ্ত' আমি পড়েছি, সম্ভবত পৌষ থেকে ছাপব। ভূপতি এখন পুরুলিয়ায়। 'পথিক' ছাপা আরম্ভ হয়েছে, 1st formএর অর্ডার দিয়েছি। আমাদের চিঠি না পেলেও মাঝে মাঝে যেখানে হোক লিখো। শুভ ইচ্ছা জেনো। ইতি। শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ।

নজরুলের 'বিষের বাঁশীর' জন্যই পুলিশ হানা দিয়েছিল। মনে করেছিল সবাই এরা রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদী। ভাবনৈতিক সন্ত্রাসবাদীদের দিকে তখনো চোখ পড়েনি। তখনো আসেননি তারক সাধু।

"কাগজে পড়েচো কলকাতায় ধরপাকড়ের ধুম লেগে গেছে।" পবিত্র লিখল : "কাজীর বিষের বাঁশী নিষিদ্ধ হয়েছে। কল্লোলের আপিস ও দোকান খানাতল্লাসী হয়েচে। সকলের মধ্যেই একটা প্রচণ্ড আশঙ্কাভীতি এসে গেছে। সি আই ডি-র উপদ্রবও সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড রকম বেড়ে গেছে। কলকাতা শহরটাই তোলপাড় হয়ে গেছে। যেখানেই যাও চাপাগলায় এই আলোচনা। যারা ভুলেও কখনও রাজনীতির চিন্তা মনে আনে নাই তাদের মধ্যেও একটা সাড়া পড়ে গেছে—"

সেই সাড়াটা "কল্লোলের" লেখকদের মধ্যেও এসে গেল। চিন্তায় ও প্রকাশে এল এক নতুন বিরুদ্ধবাদ। নতুন দ্রোহবাণী। সত্যভাষণের তীব্র প্রয়োজন ছিল যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে, তেমনি ছিল অচলপ্রতিষ্ঠ স্থবির সমাজের বিপক্ষে।

আট

"কল্লোল"কে নিয়ে যে প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস এসেছিল তা শুধু ভাবের দেউলে নয়, ভাষারও নাটমন্দিরে। অর্থাৎ "কল্লোলের" বিরুদ্ধতা শুধু বিষয়ের ক্ষেত্রেই ছিল না, ছিল বর্ণনার ক্ষেত্রে। ভঙ্গি ও আঙ্গিকের চেহারায়। রীতি ও পদ্ধতির প্রকৃতিতে। ভাষাকে গতি ও ভাবকে দ্যুতি দেবার জন্যে ছিল শব্দসৃজনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রচনাশৈলীর বিচিত্রতা। এমন কি, বানানের সংস্করণ। যারা ক্ষুদ্রপ্রাণ, মূঢ়মতি, তারাই শুধু মামুলি হবার পথ দেখে—আরামরমণীয় পথ—যে পথে সহজ খ্যাতি বা কোমল সমর্থন মেলে, যেখানে সমালোচনার কাঁটা-খোঁচা নেই, নেই বা নিন্দার অভিনন্দন। কিন্তু "কল্লোলের" পথ সহজের পথ নয়, স্বকীয়তার পথ।

কেননা তার সাধনাই ছিল নবীনতার, অনন্যতার সাধনা। যেমনটি আছে তেমনটিই ঠিক আছে এর প্রচণ্ড অস্বীকৃতি। যা আছে তার চেয়েও আরো কিছু আছে, বা যা হয়েছে তা এখনো পুরোপুরি হয়নি তারই নিশ্চিত আবিষ্কার।

এই আবিষ্কারের প্রথম সহায় হলেন প্রমথ চৌধুরী। সমস্ত কিছু সবুজ ও সজীবের যিনি উৎসাহস্থল। মাঝে-মাঝে সকালবেলা কেউ-কেউ যেতাম আমরা তাঁর বাড়িতে, মে-ফেয়ারে। "কল্লোলের" প্রতি অত্যন্ত প্রসন্নপ্রশ্রয় ছিলেন বলেই যখনই যেতাম সম্বর্ধিত হতাম। প্রতিভা-ভাসিত মুখ স্নেহে সুকোমল হয়ে উঠত। বলতেন, প্রবাহই হচ্ছে পবিত্রতা—স্রোত মানেই শক্তি। গোড়ায় আবিলতা তো থাকবেই, স্রোত যদি থাকে তবে নিশ্চয়ই একদিন খুঁজে পাবে নিজের গভীরতাকে।

মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করতাম, লিখে যাব আমরণ। অমন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে বসে অমন প্রতিজ্ঞা করার সাহস আসত।

বলতেন, 'এমন ভাবে লিখে যাবে যেন তোমার সামনে আর কেউ দ্বিতীয় লেখক নেই। কেউ তোমার পথ বন্ধ করে বসে থাকেনি। লেখকের সংসারে তুমি একা, তুমি অভিনব।'

'আমার সামনে আর কেউ বসে নেই?' চমকে উঠতাম।

'না।'

'রবীন্দ্রনাথ?'

'রবীন্দ্রনাথও না! তোমার পথের তুমিই একমাত্র পথকার। সে তোমারই একলার পথ। যতই দল বাঁধো প্রত্যেকে তোমরা একা।'

মনে রোমাঞ্চ হত। কথাটার মাঝে একটা আশীর্বাদের স্বাদ পেতাম।

বলেই ফের জের টানতেন: "নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা, আমি যা খেলিতে বলি সে খেলা খেলাও হে।' এ কথা ভারতচন্দ্র লিখেছিল। চাই সেই শক্তিমান স্রষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব, সেই অনন্তপূর্বতা। যদি সর্বক্ষণ মনে কর, সামনে রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন, তবে নিজের কথা আর বলবে কি করে? তবে তো শুধু রবীন্দ্রনাথেরই ছায়ানুসরণ করবে। তুমি ভাববে তোমার পথ মুক্ত, মন মুক্ত, তোমার লেখনী তোমার নিজের আজ্ঞাবহ।'

রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল "কল্লোল"। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলেকায়।

প্রমথ চৌধুরী প্রথম এই সরে-আসা মানুষ। বিষয়ের দিক থেকে না হোক, মনোভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে। আর দ্বিতীয় মানুষ নজরুল।

যেমন লেখায় তেমনি পোশাকে-আশাকেও ছিল একটা রঙিন উচ্ছৃঙ্খলতা। মনে আছে, অভিনবত্বের অঙ্গীকারে আমাদের কেউ-কেউ তখন কোঁচা না ঝুলিয়ে কোমরে বাঁধ দিয়ে কাপড় পরতাম—পাড়-হীন থান ধুতি—আর পোশাকের পুরাতন দারিদ্র্য প্রকট হয়ে থাকলেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতাম না। নৃপেন তো মাঝে মাঝে আলোয়ান পরেই চলে আসত। বস্তুত পোশাকের দীনতাটা উদ্ধতিরই উদাহরণ বলে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু নজরুলের ঔদ্ধত্যের মাঝে একটা কবিতার সমারোহ ছিল, যেন বিহ্বল, বর্ণাঢ্য কবিতা। গায়ে হলদে পাঞ্জাবি, কাঁধে গেরুয়া উড়ুনি। কিংবা পাঞ্জাবি গেরুয়া, উড়ুনি হলদে। বলত, আমার সম্ভ্রান্ত হবার দরকার নেই, আমার বিভ্রান্ত করবাব কথা। জমকালো পোশাক না পরলে ভিড়ের মধ্যে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব কি করে?

মিথ্যে কথা। পোশাকের প্রগলভতার দরকার ছিল না নজরুলের। বিস্তীর্ণ জনতার মাঝেও সহজে চিহ্নিত হত সে, এত প্রচুর তার প্রাণ, এত রোধবন্ধহীন তার চাঞ্চল্য। সব সময়ে উচ্চরোলে হাসছে, ফেটে পড়ছে উৎসাহের উচ্ছলতায়। বড়-বড় টানা চোখ, মুখে সবল পৌরুষের সঙ্গে শীতল কমনীয়তা। দূরে থাকলেও মনে করিয়ে দেবে অন্তরের চিরন্তন মানুষ বলে। রঙ শুধু পোশাকে কি, রঙ তার কথায় তার হাসিতে তার গানের অজস্রতায়।

হরিহর চন্দ্র তখন 'বিশ্বভারতী'র সহ-সম্পাদক, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে তার আপিসের দোতালায় ফোর আর্টস ক্লাবের বার্ষিক উৎসব হচ্ছে। হরিহর আর "কল্লোল" প্রায় হরিহর আত্মার মত। সুগৌর সুন্দর চেহারা—পরিহাসচ্ছলে কেউ-কেউ বা ডাকত তাকে রাঙাদিদি বলে। তার স্ত্রী অশ্রু দেবী আসলে কিন্তু আনন্দ দেবী। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে 'আনন্দ মেলা' নিয়ে মেতে থাকত। ছোট বড় ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলাধূলা

ও নাচগানের আসরই নামান্তরে 'আনন্দ মেলা'। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে, রামমোহন লাইব্রেরিতে বা মার্কাস স্কোয়ারে এই মেলা বসত, কল্লোলের দল নিমন্ত্রিতদের প্রথম বেঞ্চিতে। কেননা হরিহর কল্লোল-দলের প্রথমাগতদের একজন, তাই "কল্লোল" প্রথমাত্মীয় নামধেয়। গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন জোগাড় করে, প্রুফ দেখে দিয়ে কত ভাবে যে দীনেশ-গোকুলকে সাহায্য করত ঠিক-ঠিকানা নেই। ব্যবহারে প্রীতির প্রলেপ, সৌজন্যের স্নিগ্ধতা—একটি শান্ত, দৃঢ়, সুস্থ মনের সৌরভ ছড়াত চারদিকে।

সেই হরিহরের ঘরে সভা বসেছে। দীর্ঘদীপিতদেহা কয়েকজন সুন্দরী মহিলা আছেন। গান হচ্ছে মধুকণ্ঠে। এমন সময় আবির্ভাব হল নজরুলের। পরনে সেই রঙের ঝড়ের পোশাক। আর কথা কি, হার্মোনিয়ম এবার নজরুলের একচেটে। নজরুল টেনে নিল হার্মোনিয়ম, মহিলাদের উদ্দেশ করে বললে, 'ক্ষমা করবেন, আপনারা সুর, আমি অসুর।'

হেসে উঠল সবাই। অসুরের সুরে ঘর ভরে উঠল।

যতদূর মনে পড়ে সেই সভায় উমা গুপ্ত ছিলেন। যেমন মিঠে চেহারা তেমনি মিঠে হাতে কবিতা লিখতেন তিনি। তিনি আর নেই এই পৃথিবীতে। জানি না তাঁর কবিতা কটিও বা কোনখানে পড়ে আছে।

এই অস্থির এলোমেলোমি নজরুলের শুধু পোশাকে-আশাকে নয়, তার লেখায়, তার সমস্ত জীবনযাপনে ছড়িয়ে ছিল। বন্যার তোড়ের মত সে লিখত, চেয়েও দেখত না সেই বেগ-প্রাবল্যে কোথায় সে ভেসে চলেছে। যা মুখে আসত তাই যেমন বলা তেমনি যা কলমে আসত তাই সে নির্বিরোধে লিখে যেত। স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতার জন্যে বিচার করে দেখত না বর্জন-মার্জনের দরকার আছে কি না। পুনর্বিবেচনায় সে

অভ্যস্ত নয়। যা বেরিয়ে এসেছে তাই নজরুল, 'কুবলা খান'-এ যেমন কোলরিজ। নিজের মুখে কারণে অকারণে সে স্নো ঘসত খুব, কিন্তু তার কবিতার এতটুকু প্রসাধন করতে চাইত না। বলত, অনেক ফুলের মধ্যে থাক না কিছু কাঁটা, কণ্টকিত পুষ্পই তো নজরুল ইসলাম। কিন্তু মোহিতলাল তা মানতে চাইতেন না। নজরুলের গুরু ছিলেন এই মোহিতলাল। গজেন ঘোষের বিখ্যাত আড্ডা থেকে কুড়িয়ে পান নজরুলকে। দেখেন উদ্বেলতা যেমন আছে আবিলতাও কম নয়। স্রোতশক্তিকে ফলদায়ী করতে হলে তীরের বন্ধন আনতে হবে, আনতে হবে সৌন্দর্য আর সংযম, জাগ্রত বুদ্ধির বশে আনতে হবে ভাবের উদ্দামতাকে। এই বুদ্ধির দীপায়নের জন্যে চাই কিছু পড়াশোনা—অনুভূতির সঙ্গে আলোচনার আগ্রহ। নিজের পরিবেষ্টনের মাঝে নিয়ে এলেন নজরুলকে। বললেন, পড়ো শেলি-কীটস, পড়ো বায়রন আর ব্রাউনিং। দেখ কে কি লিখেছে, কি ভাবে লিখেছে, মনে স্থৈর্য আনো, হও নিজে নিজের সমালোচক, কল্পনার সোনার সঙ্গে চিন্তার সোহাগা মেশাও। 'দে গরুর গা ধুইয়ে—' নজরুল থোড়াই কেয়ার করে 'লেখাপড়া'। মনের আনন্দে লিখে যাবে সে অনর্গল, পড়বার বা বিচার করবার তার সময় কই। খেয়ালী সৃষ্টিকর্তা মনের আনন্দে তৈরি করে ছেড়ে দিয়েছে গ্রহ-নক্ষত্রকে, পড়ুয়া জ্যোতিষীরা তার পর্যালোচনা করুক। সেও সৃষ্টিকর্তা।

ভাবের ঘরে অবনিবনা হয়ে গেল। কোনো বিশেষ এক পাড়া থেকে নজরুল-নিন্দা বেরুতে লাগল প্রতি সপ্তাহে। ১৩৩:-এর কার্তিকের "কল্লোলে" নজরুল তার উত্তর দিলে কবিতায়। কবিতার নাম 'সর্ব্বনাশের ঘণ্টা':

"রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্ব্বনাশের নেশা,
রুধির-নদীর পার হতে ঐ ডাকে বিপ্লব-হ্রেষা।

হে দ্রোণাচার্য্য ! আজি এই নব জয়-যাত্রার আগে
দ্বেষ-পঙ্কিল হিয়া হতে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে
শিষ্য তোমার ; দাও গুরু দাও তব রূপ-মসী ছানি
অঞ্জলি ভরি শুধু কুৎসিত কদর্যতার গ্লানি ।...
চিরদিন তুমি যাহাদের মুখে মারিয়াছ ঘৃণা-ঢেলা
যে ভোগানন্দ দাসেদের গালি হানিয়াছ দুই বেলা,
আজি তাহাদের বিনামার তলে আসিয়াছ তুমি নামি,
বাঁদরেরে তুমি ঘৃণা করে ভালবাসিয়াছ বাঁদরামি ।
হে অস্ত্র-গুরু ! আজি মম বুকে বাজে শুধু এই ব্যথা,
পাণ্ডবে দিয়া জয়-কেতু হলে কুক্কুর-কুরু নেতা ।
ভোগ-নরকের নারকীর দ্বারে হইয়াছ তুমি দ্বারী
ব্রহ্ম অস্ত্র ব্রহ্ম দৈত্যে দিয়া হে ব্রহ্মচারী !
তোমার কৃষ্ণ রূপ-সরসীতে ফুটেছে কমল কত,
সে কমল ঘিরি নেচেছে মরাল কত সহস্র শত,
কোথা সে দীঘির উচ্ছল জল কোথা সে কমল রাঙা,
হেরি শুধু কাদা, শুকায়েছে জল, সরসীর বাঁধ ভাঙা ।...
মিত্র সাজিয়া শত্রু তোমারে ফেলেছে নরকে টানি
ঘৃণার তিলক পরাল তোমারে স্তাবকের শয়তানী !
যাহারা তোমারে বাসিয়াছে ভালো করিয়াছে পূজা নিতি
তাহাদের হানে অতি লজ্জায় ব্যথা আজ তব স্মৃতি ।...
আমারে যে সবে বাসিয়াছে ভালো, মোর অপরাধ নহে,
কালীয়দমন উদিয়াছে মোর বেদনার কালীদহে—
তাহার দাহ তো তোমারে দহেনি, দহেছে যাদের মুখ
তাহারা নাচুক জলুনীর চোটে । তুমি পাও কোন সুখ
দগ্ধমুখ সে রাম-সেনাদলে নাচিয়া হে সেনাপতি,

শিবসুন্দর সত্য তোমার লভিল এ কি এ গতি ?…
তুমি ভিড়িওনা গো-ভাগাড়ে-পড়া চিল শকুনের দলে
শতদলদলে তুমি যে মরাল শ্বেত সায়রের জলে।
ওঠ গুরু, বীর, ঈর্ষা-পঙ্ক-শয়ন ছাড়িয়া পুনঃ,
নিন্দার নহ নান্দীর তুমি, উঠিতেছে বাণী শুন—
উঠ গুরু উঠ, লহ গো প্রণাম বেঁধে দাও হাতে রাখী,
ঐ হের শিরে চক্কর মারে বিপ্লব-বাজপাখী!
অন্ধ হয়ো না, বেত্র ছাড়িয়া নেত্র মেলিয়া চাহ
ঘনায় আকাশে অসন্তোষের বিদ্রোহ-বারিবাহ।
দোতলায় বসি উতলা হয়ো না শুনি বিদ্রোহ-বাণী
এ নহে কবির, এ কাঁদন ওঠে নিখিল-মর্ম্ম হানি।…
অর্গল এঁটে সেথা হতে তুমি দাও অনর্গল গালি,
গোপীনাথ ম'ল ? সত্য কি ? মাঝে মাঝে দেখো তুলি জালি।
বরেন ঘোষের দ্বীপান্তর আর মির্জ্জাপুরের বোমা
লাল বাংলার হুমকানী—ছি ছি এত অসত্য ওমা,
কেমন ক'রে যে রটায় এ সব ঝুটা বিদ্রোহী দল!
সখী গো আমায় ধর ধর! মাগো কত জানে এরা ছল!…
এই শয়তানী ক'রে দিনরাত বল আর্টের জয়,
আর্ট মানে শুধু বাঁদরামি আর মুখ-ভ্যাঙচানো নয়।…
তোমার আর্টের বাঁশরীর সুরে মুগ্ধ হবে না এরা
প্রয়োজন-বাঁশে তোমার আর্টের আর্টশালা হবে নেড়া।…
যত বিদ্রূপই কর গুরু তুমি জান এ সত্য বাণী
কারুর পা চেটে মরিব না, কোনো প্রভু পেটে লাথি হানি
ফাটিবে না পিলে, মরিব যেদিন মরিব বীরের মত
ধরা মার বুকে আমার রক্ত রবে হয়ে শাশ্বত।

আমার মৃত্যু লিখিবে আমার জীবনের ইতিহাস
ততদিন গুরু সকলের সাথে করে নাও পরিহাস !"

মনে আছে এই কবিতা নজরুল কল্লোল-আপিসে বসে লিখেছিল এক বৈঠকে। ঠিক কল্লোল-আপিসে হয়তো নয়, মণীন্দ্রর ঘরে। মণীন্দ্র চাকী "কল্লোলের" একক কর্মচারী। নীরব, নিঃসঙ্গ। মুখে একটি হ্রস্ব নির্মল হাসি, অন্তরে ভাবের স্বচ্ছতা। ঠিকমত মাইনে-পত্র পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন অভাবের রুক্ষ রাজপথ দিয়ে হাঁটছে। অথচ এক বিন্দু অভিযোগ নেই, অবাধ্যতা নেই। ভাবখানা এমনি, "কল্লোলের" জন্যে সেও তপশ্চারণ করছে, হাসিমুখে মেনে নিচ্ছে দারিদ্র্যের নির্দয়তাকে। লেখকরা যেমন এক দিকে সেও তেমনি আরেক দিকে। সে কম কিসে! সে লেখে না বটে কিন্তু কাজ করে, সেবা করে। সেও তো এক নৌকোর সোয়ারি।

খোলার চালে ঘুপসি একখানা বিচ্ছিন্ন ঘর ওই মণীন্দ্রর। কল্লোল-আপিসের সঙ্গে শুধু একফালি ছোট্ট একটা গলির ব্যবধান। মণীন্দ্রর ঘর বটে, কিন্তু যে-কাউকে সে যে-কোনো সময় তা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। নিয়মিত সময়ে নজরুল কবিতা লিখে দিচ্ছে না, বন্ধ করো তাকে সেই ঘরে, কবিতা শেষ হলে তবে খুলে দেয়া হবে ছিটকিনি। কাশী থেকে দৈবাৎ সুরেশ চক্রবর্তী এসে পড়েছে, থাকবার জায়গা নেই, চলে এস মণীন্দ্রর ঘরে। প্রেমেন এসেছে ছুটিতে, মেসের দরজা বন্ধ তো মণীন্দ্রর দরজা খোলা। দুপুরবেলা ব্রে খেলতে চাও—সেই কালো বিবি-গছানো কালান্তক খেলা—চলে যাও মণীন্দ্রর আস্তানায়। চারজনের মামলায় ষোলো জন মোক্তারি করে হুল্লোড় বাধাও গে। কখন হঠাৎ শুনতে পাবে তোমার পাশের থেকে আশু ঘোষ লাফিয়ে উঠেছে তারস্বরে: 'আহাহাহা, করস কি, দুরির উপর তিরি মারিয়া দে—'

গুপ্ত ফ্রেণ্ডস-এর আশু ঘোষ। কি সুবাদে যে "কল্লোলে" এল কে

বলবে। কিন্তু তাকে ছাড়া কোনো আড্ডাই যেন দানা বাঁধে না একটা নতুন স্বাদ নিয়ে আসত, ঋজু ও দৃপ্ত একটা কাঠিন্যের স্বাদ। নির্ভীক সারল্যের দারুচিনি। আশুকে কোনোদিন পাঞ্জাবি গায়ে দিতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না—শার্ট-কোট তো সুদূরপরাহত। চিরকাল গেঞ্জি-গায়েই আনাগোনা করল, খুব বেশি শালীনতার প্রয়োজন বোধ করলে পাঞ্জাবিটা বড়জোর কাঁধের উপর স্থাপন করেছে। আদর্শের কাছে অটলপ্রতিজ্ঞ আশু ঘোষ, পোশাকেও দৃঢ়পিনদ্ধ। অল্পেই সন্তুষ্ট তাই পোশাকেও যথেষ্ট। তার প্রীতির উৎসারই হচ্ছে তিরস্কারে—আর সে কি ক্ষমাহীন নির্মম তিরস্কার! কিন্তু এমন আশ্চর্য, তার কশাঘাতকে কশাঘাত মনে হত না, মনে হত রসাঘাত, —যেন বিদ্যুতের চাবুক দিয়ে মেঘ তাড়িয়ে রোদ এনে দিচ্ছে। খাঁটি, শক্ত ও অটুট মানুষের দরকার ছিল "কল্লোলে"।

আশু ঘোষের গেঞ্জিও যা, দীনেশরঞ্জনের ফ্রিল-দেয়া হাতা-ওয়ালা পাঞ্জাবিও তাই। দুইই এক দুর্দিনের নিশানা। আমাদের তখন এমন অবস্থা, একজনে একা পুরো আস্ত একটা সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কাঁচি, এবং আরো কাঁচি চললে, পাসিং শো। সিগারেট বেশির ভাগ জোগাত অজিত সেন, জলধর সেনের ছেলে। "কল্লোলের" একটি নিটুট খুঁটি, তক্তপোশের ঠিক এক জায়গায় গ্যাট-হয়ে বসা লোক। কথায় নেই হাসিতে আছে, আর আছে সিগারেট-বিতরণে। কুণ্ঠা আছে একটু, কিন্তু কৃপণতা নেই। সবাই দাদা বলতাম তাকে। আশ্চর্য, জলধর সেনকেও দাদা বলতাম। আই-সি-এসের ছেলে আই-সি-এস হয়েছে একাধিক, কিন্তু দাদার ছেলের দাদা হওয়া এই প্রথম। যেমন কুলগুরুর ছেলে কুলগুরু। নিয়ম ছিল সিগারেট টানতে গিয়ে যেই গায়ের লেখার প্রথম অক্ষরটুকু এসে ছোঁবে অমনি আরেকজনকে বাকি অংশ দিয়ে দিতে হবে। পরবর্তী লোক

জিতল বলে সন্দেহ করার কারণ নেই, কারণ শেষ দিকের খানিকটা ফেলা যাবে অনিবার্য। তবে পরবর্তী লোক যদি পিন ফুটিয়ে ধরে টানতে পারে শেষাংশটুকু, তবে তার নির্ঘাৎ জিত।

এ দিনের দৈন্যের উদাহরণস্বরূপ দুটো চিঠির টুকরো তুলে দিচ্ছি। একটা প্রেমেনের, আমাকে লেখা :

"কিন্তু সুখের বা দুঃখের বিষয় হোক, Testএ পাশ হয়ে গেছি সসম্মানে। এখন 'ফি-এর টাকা জোগাড় করে উঠতে পারছি না। তাই আজ সকালে তোকে চিঠি লিখতে বসব এমন সময় তোর চিঠি এল। এবার তুই কোন ওজর দেখাতে পাবিনা। যা করে হোক, দশটা টাকা আমাকে পাঁচ দিনের মধ্যে পাঠিয়ে দিবি। আমি পরে কলকেতায় গিয়ে শোধ করব। সত্যি জানিস Testএর ফি দিতে পারছি না। কলকেতায় দিদিমার কাছে একটি পয়সা নেই, এখন বুড়িকে বিড়ম্বিত করাও যায় না। এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু লিখলাম না, তোর যা সাধ্য তা তুই করবি জানি। তোর ভরসায় রইলুম।

Finalএ পাশ হব কি না জানি না, কিন্তু ছুটি যে একেবারে নেব, খাব কি? একটা কথা আমি ভালোরকমেই জানি যে দারিদ্র্য সমস্ত idealismকে শুকিয়ে মারতে পারে। আমি বড়লোক হতে মোটেই চাই না, কিন্তু অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম আর সাহিত্যসৃষ্টি এই দু'কাজ একসঙ্গে করবার মত প্রচুর শক্তি আমার নেই। সে আছে যার সেই মহাপুরুষ শৈলজাকে আমি মনে-মনে প্রায় প্রণাম করে থাকি।

এবার কলকেতায় গিয়ে যদি গোটা ত্রিশ টাকা মাইনের এমন একটা কাজ পাই যাতে অতিরিক্ত একঘেয়ে খাটুনি নেই, তা হলে আমি তাতেই লেগে যাব এবং তাহলে আমার একরকম চলে যাবে। কোনো স্কুলের Librarian-মত হতে পারলে মন্দ হয় না। অবশ্য কেরানীগিরি আমার পোষাবে না।

শরীর ভালো নয়। ঢাকার জল হাওয়া মাটি মানুষ কিছুই ভালো লাগছে না। হয়তো জীবনের উপরই বিতৃষ্ণার এই সূচনা।"

আরেকটা শৈলজার চিঠি, দীশেরঞ্জনকে লেখা :

বৃহস্পতিবার, বারবেলা

" দাদা দীনেশ,

...দু দিন আমি পটুয়াটোলার মোড় থেকে ফিরে এসেছি। জানি, এতে আমার নিজের দোষ কিছু নেই, কিন্তু যে পরাজয়ের লজ্জা আমার অষ্টাঙ্গ বেষ্টন করে ধরেছে তার হাত থেকে আজ পর্যন্ত নিষ্কৃতি পাচ্ছি না যে। আমার মত লোকের বই ছাপানো যে কত দূর অন্যায় হয়েছে তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। তাই সমস্ত বোঝার ভার আপনার ঘাড়ে চড়িয়ে দিয়ে আমি একটুখানি সরে দাঁড়াতে চাই।

এখন কি হয়েছে শুনুন। কাবলিওয়ালার মত তাগাদা দিয়ে রায়-সাহেবের কাছে 'হাসি' 'লক্ষ্মীর' জন্য ৫০০ পাঁচ শ' টাকা আদায় করেছি, তার পরেও শ' খানেক টাকা বাকী ছিল। এখন তিনি সে টাকা দিতে অস্বীকার করেছেন। কাজেই বোঝা এসে পড়েছে আমার ঘাড়ে। এ নিঃস্ব ভিখারীর পক্ষে শ' খানেক টাকার বোঝাও যে ভারী দাদা।...কিন্তু এখন আমি করি কি? গত দু'দিন আমি বই লিখে প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে উপযাচকের মত একশটি টাকার জন্যে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু এ অভাগার দুর্ভাগ্য, কারও কাছ থেকে একটা আশ্বাসের বাণীও আমার ভাগ্যে জোটেনি।...আমি এ অন্ধকার আবর্তের মধ্যে পড়ে ভাববার কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

আমায় একবার এ সব দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিন। লোটা কম্বল সম্বল করে 'ব্যোম্ কেদারনাথ' বলে আমি একবার বেরিয়ে পড়তে

চাই। এ সব সর্ব্বনাশা আবর্জ্জনার মধ্যে প্রাণ আমার সত্যসত্যই ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে।....

'হাসি' 'লক্ষ্মী'র আবেষ্টনের মধ্যে হাত-পা যেন বাঁধা হয়ে রয়েছে, তাই 'কুছ পরোয়া নেই' বলতে কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছে। এ বন্ধন থেকে যদি শনিবার দিন মুক্তি পাই তাহলে বুক ঠুকে বলছি—কুছ পরোটা নাই! তাহলে—

স্বষ্টি-সুখের উল্লাসে
মুখ হাসে মোর চোখ হাসে আর টগবগিয়ে খুন হাসে।

লিখেছেন,—হাসছ তো শৈলজা? আঃ, কি আর বোলব ভাই, এমন সান্ত্বনার বাণী অনেকদিন শুনিনি। আজ আমার মনে পড়ছে—সে আজ বহুদিনের কথা—আর একজন, তার নিজের বেদনার্ত্ত বক্ষের গাঢ় রক্তাক্ত ক্ষতমুখ দুহাত দিয়ে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে কয়েছিল—মেয়েদের মত তোমার এ কান্না সাজে না, তুমি কেঁদো না।....

সে কথা হয়ত আজ ভুলে ছিলুম, তাই আমার ক্ষণে-ক্ষণে মনে হয়—

হাসি? হায় সখা, এ তো স্বর্গপুরী নয়,
পুষ্পে কীট সম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্ম্মমাঝে।

আশা করি সকলেই কুশলে আছেন। আমার ভালোবাসা গ্রহণ করুন। শনিবার দিন রিক্তহস্তে এ দীন দীনেশের দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে—তার অন্তরের বিরাট ক্ষুধা একটুখানি সহানুভূতির নিবিড় করুণা চাওয়ার প্রত্যাশী!"

এই সময় আমি এক টেক্সট-বুক প্রকাশকের নেকনজরে পড়ি। সেই আমার পুস্তক প্রকাশকের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার। অনুরোধ হল, নিচু ক্লাশের স্কুলের ছাত্রদের জন্যে বাঙলায় একখানা রচনা-পুস্তক লিখে দিতে হবে—হাতি-ঘোড়া উষ্ট্র-ব্যাঘ্র নিয়ে রচনা। তনখা

পঞ্চাশ টাকা। সানন্দচিত্তে রাজি হয়ে গেলাম, প্রায় একটা দাঁও পাওয়ার মত মনে হল। লেখা শেষ করে দিলাম অল্প কয়েক দিনের মধ্যে —লেখার চেয়েও লেখা শেষ করতে পারাটাই বেশি পছন্দ হল প্রকাশকের। টাকার জন্যে হাত বাড়ালে প্রকাশক মাত্র একটি টাকা দিয়েই ক্ষান্ত হলেন। বললাম—বাকিটা? আস্তে-আস্তে দেব, বললেন প্রকাশক, একসঙ্গে একমুস্তে সব টাকা দিয়ে দিতে হবে পষ্টাপষ্টি এমন কথা হয়নি। ভালোই তো, অনেক দিন ধরে পাবেন। কিন্তু একদিন এই অনেক দিনের সান্ত্বনাটা মন মেনে নিতে চাইল না। হন্তদন্ত হয়ে দোকানে ঢুকে বললাম, টাকা দিন। প্রকাশক মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, এত হন্তদন্ত হয়ে চলেছেন কোথায়? বললাম, খেলা দেখতে। খেলা দেখতে? যেন আশ্বস্ত হলেন প্রকাশক। সরবে হিসেব করলেন শুনিয়ে-শুনিয়েঃ গ্যালারি চার আনা আর ট্র্যাম ভাড়া দশ পয়সা। সাড়ে ছ আনাতেই হবে, সাড়ে ছ আনাই নিয়ে যান! বলে সত্যি-সত্যি সাড়ে ছ আনা পয়সাই গুনে দিলেন।

বাঙলা দেশের প্রকাশকের পক্ষে তখন এও সম্ভব ছিল!

নয়

সান-ইয়াৎ-সেন আসত "কল্লোলে"। সান-ইয়াৎ-সেন মানে আমাদের সনৎ সেন। সনৎ সেনকে আমরা সান-ইয়াৎ-সেন বলতাম। 'অর্দ্ধাঙ্গিণী' নামে একখানা উপন্যাস লিখেছিল বলে মনে পড়ছে। আধপোড়া চুরুট মুখে দিয়ে প্রায়ই আসত আড্ডা দিতে, প্রসন্ন চোখে হাসত। দৃষ্টি হয়তো সাহিত্যের দিকে তত নয় যত ব্যবসার দিকে। 'বাণিজ্যে বাঙ্গালীর স্থান' বলে কিছু একটা লিখেওছিল এ বিষয়ে। হঠাৎ একদিন 'ফাঁসির গোপীনাথ' বলে বই বের করে কাণ্ড বাধালে। কল্লোল-আপিসেই কাণ্ড, কেননা "কল্লোল"ই ছিল ঐ বইয়ের প্রকাশক। একদিন লাঠি ও লালপাগড়ির ঘটায় কল্লোল-আপিস সরগরম হয়ে উঠল। জেলে গোপীনাথের যেমন ওজন বেড়েছিল বইএর বিক্রির অঙ্কটা তেমনি ভাবে মোটা হতে পেল না। সরে পড়ল সান-ইয়াৎ সেন। পস্টাপর্ স্টি ব্যবসাতে গিয়েই বাসা নিলে।

কিন্তু বিজয় সেনগুপ্তকে আমরা ডাকতাম 'কবরেজ' বলে। শুধু বদ্যি বলে নয়, তার গায়ের চাদর-জড়ানো বুড়োটে ভারিক্কিপনা থেকে। এককোণে গা-হাত-পা ঢেকে জড়সড় হয়ে বসে থাকতে ভালবাসত, সহজে ধরা দিতে চাইত না। কিন্তু অন্তরে কাষ্ঠ কার্পণ্য নিয়ে "কল্লোলের" ঘরে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারো এমন তোমার সাধ্য কি। আস্তে-আস্তে সে ঢাকা খুললে, বেরিয়ে এল গাম্ভীর্যের কোটর থেকে। তার পরিহাস-পরিভাষে সবাই পুলকস্পন্দিত হয়ে উঠল। একটি পরিশীলিত সূক্ষ্ম ও স্নিগ্ধ মনের পরিচয় পেলাম। তার জমত বেশি সুকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে। হয়তো দুজনেই কৃষ্ণনগরের লোক এই সুবাদে। বিজয় পড়ছে সিকসথ ইয়ার ইংরিজি, আর সুকুমার

এম এস সি আর ল। দুজনেই পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট। কিংবা হয়তো আরও গভীর মিল ছিল যা তাদের রসস্ফূর্ত আলাপে প্রথমে ধরা পড়ত না। তা হচ্ছে দুজনেরই কায়িক দিনযাপনের আর্থিক কৃচ্ছ্রতা।

কষ্টে-ক্লেশে দিন যাচ্ছে, পড়া-থাকার খরচ জোগানো কঠিন, অবন্ধু সংসারের নির্দয় রুক্ষতায় পদে পদে বিপন্ন, কিন্তু সরসবচনে সুখ-সৃষ্টিতে আপত্তি কি।

বিজয় হয়তো বললে, 'সুকুমারটা একটা ফল্‌স্‌।'

সুকুমার পালটা জবাব দিলে, 'বিজয়টা একটা বোগাস।'

হাসির হল্লোড় পড়ে যেত। ঐ সামান্য দুটো কথায় এত হাসবার কি ছিল আজকে তা বোঝানো শক্ত। অবিশ্যি উক্তির চেয়ে উচ্চারণের কারুকার্যটাই যে বেশি হাসাত তাতে সন্দেহ নেই। তবু আজ ভাবতে অবাক লাগে তখনকার দিনে কত তুচ্ছতম ভঙ্গিতে কত মহত্তম আনন্দলাভের নিশ্চয়তা ছিল। দুটি শব্দ—'ইয়ে', আর 'উহু';—বিজয় এমন অদ্ভুতভাবে উচ্চারণ করত যে মনে হত এত সুন্দর রসাত্মক বাক্য বুঝি আর সৃষ্টি হয়নি। নৃপেনকে দেখে 'নেপোয় মারে দই' কিংবা আফজলকে দেখে কেউ যদি বলত 'ডাবজল,' নামত অমনি হাসির ধারাবর্ষণ। আজকে ভাবতে হাসি পায় যে হাসি নিয়ে জীবনে তখন ভাবনা ছিল না। বুদ্ধি-বিবেচনা লাগত না যে হাসিটা সত্যিই বুদ্ধিমানের যোগ্য হচ্ছে কিনা। অকারণ হাসি, অবারণ হাসি। কবিতার একটা ভালো মিল দিতে পেরেছি কিংবা মাথায় একটা নতুন গল্পের আইডিয়া এসেছে এই যেন যথেষ্ট সুখ। প্রাণবহনের চেতনায় প্রতিটি মুহূর্ত স্বর্ণঝলকিত। কোন দুর্গম গলির দুর্ভেদ্য বাড়িতে নিভৃত মনের বাতায়নে উদাসীনা প্রেয়সী অবসর সময়ে বসে আছেন এই ম্লান দিগন্তের দিকে চেয়ে—এই যেন পরম প্রেরণা। আয়োজন নেই, আড়ম্বর নেই, উপচার-উপকরণ নেই—

একসঙ্গে এতগুলি প্রাণ যে মিলেছি এক তীর্থসত্রে, জীবনের একটা ক্ষুদ্র ক্ষণকালের কোঠায় খুব ঘেঁসাঘেঁসি করে যে বসতে পেরেছি একাসনে—এক নিমন্ত্রণে—এই আমাদের বিজয়-উৎসব।

সুকুমারের গল্পে নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারের সংগ্রামের আভাস ছিল, বিজয়ের গল্প বিশুদ্ধ প্রেম নিয়ে। যে প্রেমে আলোর চেয়ে ছায়া, ঘরের চেয়ে ঘরের কোণটা বেশি স্পষ্ট। যেখানে কথার চেয়ে স্তব্ধতাটা বেশি মুখর। বেগের চেয়ে বিরতি বা ব্যাহতি বেশি সক্রিয়। এক কথায় অপ্রকট অথচ অকপট প্রেম। অল্প পরিসরে সংযত কথায় সূক্ষ্ম আঙ্গিকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলত বিজয়। দুটি মনের দুদিকের দুই জানালা কখন কোন হাওয়ায় একবার খুলছে আবার বন্ধ হচ্ছে তার খেয়ালিপনা। দেহ সেখানে অনুপস্থিত, একেবারে অনুপস্থিত না হলেও নিরুচ্চার। শুধু মনের ঢেউয়ের ঘূর্ণিপাক। একটি ইচ্ছুক মনের অদ্ভুত ঔদাসীন্য, হয়তো বা একটি উদ্যত মনের অদ্ভুত অনীহা। তেরোশ তিরিশের প্রায় গোড়া থেকেই বিজয় এসেছে "কল্লোলে", কিন্তু তার হাত খুলেছে তোরোশ একত্রিশ থেকে। তেরোশ একত্রিশ-বত্রিশে কটি অপূর্ব প্রেমের গল্প সে লিখেছিল। যে প্রেম দূরে-দূরে সরে থাকে তার শূন্যতাটাই সুন্দর, না, যে প্রেম কাছে এসে ধরা দেয় তার পূর্ণতাটাই চিরস্থায়ী—এই জিজ্ঞাসায় তার গল্পগুলি প্রাণস্পন্দী। একটি ভঙ্গুর প্রশ্নকে মনের নানান আঁকাবাঁকা গলিঘুঁজিতে সে খুঁজে বেড়িয়েছে। আর যতই খুঁজেছে ততই বুঝেছে এ গোলকধাঁধার পথ নেই, এ প্রশ্নের জবাব হয় না।

বিজয় কিন্তু আসে মণীশ ঘটকের সঙ্গে। দুজনে বন্ধু ছিল কলেজে, সেই সংসর্গে। একটা বড় রকম অমিল থেকেও বোধহয় বন্ধুত্ব হয়। বিজয় শান্ত, নিরীহ; মণীশ দুর্ধর্ষ, উদ্দাম। বিজয় একটু বা কুনো, মণীশ নির্বারিত। ছ-ফুটের বেশি লম্বা, প্রস্থে কিছুটা

দুঃস্থ হলেও বলশালিতার দীপ্তি আছে তার চেহারায়। অতখানি দৈর্ঘ্যই তো একটা শক্তি। "কল্লোলে" আত্মপ্রকাশ করে সে যুবনাশ্বের ছদ্মনাম নিয়ে। সেদিন যুবনাশ্বের অর্থ যদি কেউ করত 'জোয়ান ঘোড়া', তাহলে খুব ভুল করত না, তার লেখায় ছিল সেই উদ্দীপ্ত সবলতা। কিন্তু এমন বিষয় নিয়ে সে লিখতে লাগল যা মান্ধাতার বাপের আমল থেকে চলে এলেও বাংলা-দেশের 'সুনীতি সঙ্ঘের' মেম্বাররা দেখেও চোখ বুজে থাকছেন। এ একেবারে একটা নতুন সংসার, অধন্য ও অকৃতার্থের এলাকা। কাণা খোঁড়া ভিক্ষুক গুণ্ডা চোর আর পকেটমারের রাজপাট। যত বিকৃত জীবনের কারখানা। বলতে গেলে, মণীশই "কল্লোলে"র প্রথম মশালচী। সাহিত্যের নিত্যক্ষেত্রে এমন সব অভাজনকে সে ডেকে আনল যা একেবারে অভূতপূর্ব। তাদের একমাত্র পরিচয় তারাও মানুষ, জীবনের দরবারে একই সই-মোহর-মারা একই সনদের অধিকারী। মানুষ? না, মানুষের অপচ্ছায়া? কই তাদের হাতে সেই বাদশাহী পাঞ্জার ছাপ-তোলা সনদ? তারা যে সব বিনা-টিকিটের যাত্রী। আর, সত্যি করে বলো এটা কি দরবার, না বেচাকেনার মেছোহাটা? তারা তো সব সস্তায় বিকিয়ে যাওয়া ভুষিমাল।

যুবনাশ্বের ঐ সব গল্পে হয়তো আধুনিক অর্থে কোনো সক্রিয় সমাজসচেতনতা ছিল না, কিন্তু জীবন সম্বন্ধে ছিল একটা সহজ বিশালতাবোধ। যে মহৎ শিল্পী তার কাছে সমাজের চেয়েও জীবনই বেশি অর্থান্বিত। যে জীবন ভগ্ন, রুগ্ন, পর্যুদস্ত, তাদেরকে সে সরাসরি ডাক দিলে, জায়গা দিলে প্রথম পংক্তিতে। তাদের নিজেদের ভাষায় বলালে তাদের যত দগদগে অভিযোগ, জীবনের এই খলতা এই পঙ্গুতার বিরুদ্ধে কশায়িত তিরস্কার। দেখালে তাদের ঘা, তাদের পাপ, তাদের নির্লজ্জতা। সমস্ত কিছুর পিছনে

দয়াহীন দারিদ্র্য। আর সমস্ত কিছু সত্ত্বেও একটি নিষ্পঙ্ক ও নীরোগ জীবনের হাতছানি।

ভাবতে অবাক লাগে যুবনাশ্বের সেই সব গল্প আজও পর্যন্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। চব্বিশ বছর আগে বাংলাদেশে এমন প্রকাশক অবিশ্যি ছিল না যে এ গল্পগুলি প্রকাশ করে নিজেকে সম্রান্ত মনে করতে পারত। কিন্তু আজকে অনেক দৃষ্টিবদল হলেও এদিকে কারু চোখ পড়ল না। ভয় হয়, অগ্রনায়ক হিসেবে যুবনাশ্বের নাম না একদিন সবাই ভুলে যায়। অন্তত এই অগ্রদৌত্যের দিক থেকে এই গল্পগুলি সাহিত্যের ইতিহাসে গণনীয় হয়ে থাকবে। এরাই বাংলা সাহিত্যে নতুন আবাদের বীজ ছড়ালে। বাস্তবতা সম্বন্ধে সরল নির্ভীকতা ও অপধ্বস্ত জীবনের প্রতি সশ্রদ্ধ সহানুভূতি এই দুই মহৎ গুণ তার গল্পে দীপ্তি পাচ্ছে।

'কালনেমি'-র ডাকু জোয়ান মরদ—রেলে কাটা পড়ে কাজের বার হয়ে যায়। কোথাও আশ্রয় না পেয়ে স্ত্রী ময়নাকে নিয়ে পটলডাঙার ভিখিরিপাড়ায় এসে আস্তানা নেয়। ডাকুকে রোজ রাস্তার মোড়ে বসিয়ে দিয়ে ময়না দলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে ভিক্ষের সন্ধানে, ফিরে এসে আবার স্বামীকে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু সেই ভিখিরিপাড়ায় স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের কোনো অস্তিত্ব নেই, নিয়ম নেই থাকবার। সেখানে প্রতি বছরই ছেলে জন্মায়, কিন্তু বাপ-মার ঠিক-ঠিকানা জানবার দরকার হয় না। কেউ কারু একলার নয়। ময়না এ জগতে একেবারে বিদেশী, কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারে না এই বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে। তাই একদিন রতনার আক্রমণে সে রুখে ওঠে।

স্বামীকে গিয়ে বলে—তু একটা বিহিত করবিনে ?

একটু চুপ করে থেকে ডাকু তাকে বুকে সাপটিয়ে ধরে। বলে—তা হোকগে। থাকতেই হবে যখন হেতায় তখন কি হবে আর ঘাঁটিয়ে ?—আয় তুই …

ময়না চারিদিকে তাকিয়ে আশ্রয় খোঁজে। গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় স্বামীর কবল থেকে।

ডাকু বলে—চললি কোতা?

রতনার কাছে।

কিন্তু ডাকু তাতে দমে না। বলে—দোহাই তোর, আমাকে একেবারে ফাঁকি দিসনে। একটিবার আসিস রেতে—

'গোষ্পদ' গল্পে অন্য রকম সুর। একটি ক্ষণকালিক সদিচ্ছায় কাহিনী। খেঁদি-পিসি পটলডাঙার ভিখিরিদলের মেয়ে-মোড়ল। একদিন পথে ভদ্রঘরের একটি বিবর্জিত বউকে কুড়িয়ে পায়। তাকে নিয়ে আসে বস্তিতে। প্রথমেই তো সে ভিক্ষুকের ছাড়পত্র পেতে পারে না, সেই শেষ পরিচ্ছেদের এখনো অনেক পৃষ্ঠা বাকি। তাই প্রথমে খেঁদি ধমক দিয়ে উঠল। বললে, 'আমাদের দলে যাদের দেখলে, সবই ত ওই করত এককালে। পরে, বুড়ো হয়ে, কেউ ব্যায়রামে পড়ে পথে বেরিয়েছে। তোমার এই বয়সে অমন চেহারা—তা বাপু, নিজে বোঝ—'

মেয়েটি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এবার আর খেঁদি কান্না শুনে খিট-খিট করে উঠল না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভাবল। হয়তো ভাবল এই অবুঝ মেয়েটাকে বাঁচানো যায় কিনা। যায় না, তবু যত দিন যায়। তাই সে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল,—আচ্ছা থাকো। কিন্তু এ চেহারা নিয়ে কলকাতা হেন জায়গায় কি সামলে থাকতে পারবে? আমার খবরদারিতে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ অবিশ্যি ভয় নেই। কিন্তু সব সময় কি আমি চোখ রাখতে পারব?

না, ভয় নেই। থাকো, কোথায় যাবে এই জঙ্গলে? যতক্ষণ ঘরে খেঁদি আছে ততক্ষণ, ততটুকু সময় তো মেয়েটি নিরাপদ।

'মৃত্যুঞ্জয়' প্রেমের গল্প—গোবরগাদায় পদ্মফুল। ও-তল্লাটে চঞ্চু সবচেয়ে ঝানু বদমাইস, হৃদয়হীন জানোয়ার। থাকত ক্ষ্যান্তর ঘরে—ক্ষ্যান্ত হচ্ছে খেঁদির ডান-হাত। দলের সেরা হচ্ছে চঞ্চু, তাই তার ডেরাও মজবুত—ক্ষ্যান্তর ঘর। এ হেন চঞ্চু একদিন ময়লা, রোগা আর বোবা এক ছুঁড়িকে নিয়ে এসে দলে ভর্তি করে দিলে। কিন্তু সেই থেকে, কেন কে জানে, তার আর ভিক্ষেয় বেরোতে মন ওঠে না। শুধু তাই নয়, সেদিন সে পটলাকে চড়িয়ে দিয়েছে একটা মেয়ের হাত থেকে বালা ছিনিয়ে নেবার সময় তার আঙুল মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে ব'লে। চঞ্চুর এই ব্যাপার দেখে সবাই খাপ্পা হয়ে খেঁদিকে গিয়ে ধরল। বললে,—'এর একটা বিহিত তোকে আজই করতে হবে পিসি। নইলে সব যে যেতে বসেছে। ড্যাকরার কি যে হয়েছে কদিন থেকে—সাধুগিরি ফলাতে সুরু করেছে মাইরি।'

খেঁদি গিয়ে পড়ল চঞ্চুকে নিয়ে। মুখিয়ে উঠল: 'বল মুখপোড়া, তুই ভেবেছিস কি? দলের নাম ডোবাতে বসেছিস যে।'

চঞ্চু হাঁ-না কোনো জবাব দিল না।

একজন বলল, 'আরে, ও তো এমন ছেল না। ওই শুঁটকি মাগী এসেই তো ওকে বিগড়েছে! ওকে না তাড়ালে চঞ্চুকে ফেরাতে পারবি না—'

খেঁদি বলল, 'সত্যি করে বল তুই, ও-মাগী তোর কে? আমি কেন, দশজনে দেখছে, ওই তোকে সারছে। ও কে তোর?'

বোবা-মেয়েটাও ইতিমধ্যে এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। চঞ্চু তার দিকে তাকিয়ে রইল স্পষ্ট করে। বললে, 'ও আমার বোন।'

বোন? খেঁদির দলে বোন? মা-বোনের ছোঁয়াচ তো তের দিনই সবাই এড়িয়ে এসেছে।

—'শোন, এই তোকে বলছি—'খেঁদি খেঁকিয়ে উঠল—'ও মাগীকে

তোর ছাড়তে হবে। যেখান থেকে ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিস, কাল গে সেইখানে রেখে আসবি নইলে—'

চঞ্চু তাকাল খেঁদির দিকে।

—'নইলে দল ছাড়তে হবে তোকে। আগেকার মত যদি হতে পারিস তবেই থাকতে পারবি, নইলে আর নয়। বুঝেছিস?'

ভোর রাতের আবছা আলোয় খেঁদি পিসির আস্তানা থেকে বেরিয়ে এল চঞ্চু, সেই বোবা মেয়েটার হাত-ধরা। অনেক দিন চলে গেল, আর তাদের হদিস নেই।

রতন টিপ্পনি কাটল,—'বলেছিনু কিনা। শক্ত একটা কিছু বেঁধেছে বাবা। নইলে চঞ্চুর মত স্যায়না ঘাগী—'

তেরোশ বত্রিশের "কল্লোলে" যুবনাশ্ব তিনটি গল্প লেখে 'মন্বশেষ', 'ভুখা ভগবান' আর 'দুর্যোগ'। এর মধ্যে 'দুর্যোগ' অপরূপ। পটলডাঙার গল্প নয়, পদ্মার উপরে ঝড় উঠেছে—তার মধ্যে যাত্রীবাহী স্টিমার—'বাজার্ডে'র গল্প। জোরালো হাতে লেখা। কলম যেন ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে।

"গতিক বড় সুবিদার না জোগন্নাথ, ঝোরি-বিষ্টি আইব মনে লয়।… বুচি লো, চুন দে দেহি এট্টু—'

সতরঞ্চির ওপর হুঁকো ও গামছা-বাঁধা জলতরঙ্গ টিনের তোরঙ্গে ঠেস দিয়ে আজানু গোলাপী পাঞ্জাবি ও তদুপরি নীল স্ট্রাইপ-দেওয়া টুইলের গলফ-কোট গায়ে একটি বছর সাতাশ-আটাশের মদনমোহন শুয়েছিল। বোধ করি তারই নাম জগন্নাথ। সে চট করে কপালের লতায়িত কেশগুচ্ছের ওপর হাত বুলিয়ে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে,—

'ডাইল! হালায় আপনের যত গাজাখুরি কথা। হুদাহুদি ঝরি আইব ক্যান্? আর আহেই যদি হালার ডর কিসের? আমরা ত হালার জাইল্যা ডিঙিতে যাইত্যাছি না।'

আকাশের দিকে চেয়ে মনে হল, ঝড় আসা বিচিত্র নয়। সমস্ত আকাশের রং পাংশু-পিঙ্গল, ঈশান কি নৈঋত কি একটা কোণে হিংস্র শ্বাপদের মত একরাশ ঘোর কালো মেঘ শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়বার আগের মুহূর্তের মতই ওৎ পেতে বসেছে। তীরে গাছের পাতা স্পন্দহীন, কেবল স্টিমারের আশপাশ ঘুরে গাং-চিলের ওড়ার আর বিরাম নেই। চারদিকে কেমন একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা থমথম করছে।···

হঠাৎ চোখে পড়ল একটি লোক আমার পাশ কাটিয়ে কিমেল-কম্পার্টমেণ্টের ধারে গিয়ে আপাদগ্রীবা সতরঞ্চি মুড়ি দিয়ে উবু হয়ে বসল। বসে সন্তর্পণে একবার কপালের কেয়ারিতে হাত বুলোতেই চিনতে পারলাম সে পূর্বোক্ত শ্রীমান জগন্নাথ। হাবভাবে বুঝলাম, শ্রীমান ভীত হয়েছেন।

বাইরে তাকিয়ে দেখি কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব ওলটপালট হয়ে গেছে। আকাশ-কোণের শ্বাপদজন্তুটা দেহ-বিস্তার করে আকাশের অর্ধেকের বেশি গ্রাস করে ফেলেছে। অন্ধকারে কিছু চোখে পড়ে না, থেকে-থেকে চারদিক মৃদু আলোক-কম্পনে চমকে-চমকে উঠছে। সে আলোয় ধূসর বৃষ্টি-ধারা ভেদ করে দৃষ্টি চলে না, একটু গিয়েই প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। শিকার কায়দায় পেয়ে ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন উদ্বিগ্ন আনন্দে গোংরাতে থাকে, সমস্ত আকাশ জুড়ে তেমনি শব্দ হচ্ছে ···।

'যান যান, আপন-আপন জায়গায় যান। গাদি করবেন না এক মুড়ায়—ছ্যাহেন না হালার চা'জ কাইত অইয়া গেছে—'

উপদেশ শোনা ও তদনুসারে কাজ করবার মত স্থান ও কাল সেটা নয়, তাই নিজ-নিজ জায়গার ওপর কারো বিশেষ আকর্ষণ দেখা গেল না; যিনি পরামর্শ দিচ্ছিলেন, তাঁরও না।

বাহিরে অষ্ট দিকপালের মাতামাতি সমানে চলছে। অবিরল বৃষ্টি,

অশ্রান্ত বিদ্যুৎ, আকাশের অশান্ত সরব আস্ফালন, সমস্ত ডুবিয়ে উন্মত্ত বায়ুর অধীর হুহুঙ্কার। তারই ভেতর দিয়ে আমাদেব একমাত্র আশ্রয়স্থল 'বাজার্ড' স্টিমার বায়ুতাড়িত হয়ে কোন এক ঝড়ের পাখীর মতই সবেগে ছুটে চলেছে।

হঠাৎ মনে হল কে যেন ডাকছে। কাকে, কে জানে। ওকি,—আমাকেই—

'শুনুন একবার এদিকে—''

চেয়ে দেখি মেয়ে-কামরার দরজার কাছে দাঁড়িযে বছর বুড়ি-বাইশের একটি সাদাসিধে হিন্দু ঘবের মেয়ে। আমি এগিয়ে যেতেই তিনি ব্যগ্রভাবে বললেন—'অবি—অবিনাশবাবুকে ডেকে দেবেন একটু? অবিনাশ বোস। অনেকক্ষণ হল নীচে গেছেন, ফেরেন নি। তিনি আমার স্বামী।'

বিধ্বস্ত জনসংঘের মধ্যে হাতড়ে-হাতড়ে অনেক কষ্টে অবিনাশবাবুর সন্ধান পাওয়া গেল। ডেক, সেলুন, হস্পিটাল কোথাও তিনি নেই—জাহাজ ডুবছে—এই মহামারণ দুর্যোগে তিনি শুঁটকি মাছের চ্যাঙারিব মধ্যে বসে আছেন নিশ্চিন্ত হয়ে। নিশ্চিন্ত হয়ে? হঁ্যা, ঘাড় দাবিয়ে উবু হয়ে বসে বিপন্না অপরিচিতার স্বামী শ্রীঅবিনাশ বোস পাশের একটি অর্ধনগ্ন জোয়ান কুলি-মেয়ের দিকে তাকিয়ে কাব্যচর্চা করছেন।" নিশ্চিন্ততা, না, দুর্যোগ?

মণীশের চেয়েও দীর্ঘকায় আরো একজন সাহিত্যিক ক্ষণকালের জন্যে এসেছিল "কল্লোলে", গল্পলেখার উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি নিয়ে। নাম দেবেন্দ্রনাথ মিত্র। কত দিন পরে চলে গেল সার্থক জীবিকার সন্ধানে, আইনের অলি গলিতে। দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও ওকালতিতে গেল বটে, কিন্তু টিকে ছিল শেষ পর্যন্ত, যত দিন "কল্লোল" টিকে ছিল। মণীশের সঙ্গেই সে আসে আর আসে সেই উদ্দাম প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে।

ছাত্র হিসাবে কৃতী, রসবোধের ক্ষেত্রে প্রধী, চেহারায় সুন্দর-সুঠাম—দেবীদাস "কল্লোলে"র বীণার একটি প্রধান তন্ত্রী ছিল। উচ্চ তানের তন্ত্রী সন্দেহ নেই। ঝড়ের ঝংকার নিয়ে আসত, দুর্নিবার আনন্দের ঝড়। নিয়ে আসত অনিয়মের উন্মাদনা। উজ্বরোল, উতরোল, হুল্লোড় পড়ে যেত চারদিকে। দেবীদাস কিন্তু রবাহূত হয়ে আসেনি। এসেছে স্বাধিকারবলে, সাহিত্যিকের ছাড়পত্র নিয়ে। "কল্লোলে" একবার গল্প-প্রতিযোগিতায় দেবীদাসের গল্পই প্রথম পুরস্কার পায়। যত দূর মনে পড়ে, এক কুষ্ঠরুগী নিয়ে সে গল্প। একটা কালো আতঙ্কের ছায়া সমস্ত লেখাটাকে ঢেকে আছে। সন্দেহ নেই, শক্তিধরের লেখনী।

"কল্লোলে" ভিড় যত বাড়ছে ততই মেজবৌদির রুটির পাজা শীর্ণ হয়ে আসছে—সে জঠরারণ্যের খাণ্ডবদাহ নিবৃত্ত করবার সাধ্য নেই কোনো গৃহস্থের। চাঁদা দাও, কে-কে অপারগ হাত তোল, চাঁদায় না কুলোয় ধরো কোনো ভারী পকেটের খদ্দেরকে। এক পয়সায় একখানা ফুল্‌কো লুচি, মুখভরা সন্দেশ একখানা এক আনা, কাছেই পুঁটিরাম মোদকের দোকান, নিয়ে এস চ্যাঙারি করে। এক চ্যাঙারি উড়ে যায় তো আরেক চ্যাঙারি। অতটা রাজাহার না জোটে, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিটের মোড়ে বুড়ো হিন্দুস্থানীর দোকান থেকে নিয়ে এস ডালপুরি। একটু দগ্ধভক্ষ্য খাবে নাকি, যাবে নাকি অশাস্ত্রের এলাকায়? অশাসনের দেশে আবার শাস্ত্র কি, শেয়ালদা থেকে নিয়ে এস শিককাবাব। সঙ্গে ছন্দ রেখে মোগলাই পরোটা!

আর, তেমন অশন-আচ্ছাদনের ব্যবস্থা যদি না জোটাতে পারো, চলে যাও ফেভরিট কেবিনে, দু পয়সার চায়ের বাটি মুখে করে অফুরন্ত আড্ডা জমাও।

মির্জাপুর স্ট্রিটে ফেভরিট কেবিনে কল্লোলের দল চা খেত। গোল শ্বেতপাথরের টেবিল, ঘন হয়ে বসত সবাই গোল হয়ে। দোকানের

মালিক, চাটগেঁয়ে ভদ্রলোক, নাম যতদূর মনে পড়ে, নতুনবাবু, স্বজনসুলভ স্নিগ্ধতায় আপ্যায়ন করত সবাইকে। সে সম্বর্ধনা এত উদার ছিল যে চা বহুক্ষণ শেষ হয়ে গেলেও কোনো সঙ্কেতে সে যতিচিহ্ন আঁকত না। যতক্ষণ খুশি আড্ডা চালিয়ে যাও জোর গলায়। কে জানে হয়তো আড্ডাই আকর্ষণ করে আনবে কোনো কৌতূহলীকে, তৃষার্তচিত্তকে। পানের অভাব হতে পারে কিন্তু স্থানের অভাব হবে না। এখুনি বাড়ি পালাবে কি, দোকান এখন অনেক পাতলা হয়েছে, এক চেয়ারে গা এলিয়ে আরেক চেয়ারে পা ছড়িয়ে দিয়ে বোস। শাদা সিগারেট নেই একটা? অন্তত একটা খাকি সিগারেট?

বহু তর্ক ও আস্ফালন, বহু প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যচিত্রন হয়েছে সেই *ফেভরিট কেবিনে। কল্লোল সম্পূর্ণ* হত না যদি না সেদিন ফেভরিট কেবিন থাকত।

এক-একদিন শুকনো চায়ে মন মানত না। ধোঁয়া ও গন্ধ-ওড়ানো তপ্ত-পক্ক মাংসের জন্যে লালসা হত। তখন দেলখোস কেবিনের জেল্লাজমক খুব, নাতিদূরে ইণ্ডোবর্মার পরিচ্ছন্ন নতুনত্ব। কিন্তু খুব বিরল দিনে খুব সাহস করে সে-সব জায়গায় ঢুকলেও সামান্য চপ-কাটলেটের বেশি জায়গা দিতে পকেট কিছুতেই রাজি হত না। পেট ও পকেটের এই অসামঞ্জস্যের জন্যে ললাটকে দায়ী করেই শান্ত হতাম। কিন্তু সাময়িক শান্তি অর্থ চিরকালের জন্যে ক্ষান্ত হওয়া নয়। অন্তত নৃপেন জানত না ক্ষান্ত হতে। তার একমুখো মন ঠিক একটা না-একটা ব্যবস্থা করে উঠতই।

একদিন হয়তো বললে, 'চল কিছু খাওয়া যাক পেট ভরে। বাঙালি পাড়ায় নয়, চীনে পাড়ায়।'

উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। 'পয়সা?'

'পয়সা যে নেই তুইও জানিস আমিও জানি। ও প্রশ্ন করে লাভ নেই।'

'তবে ?'

'চল, বেরিয়ে পড়া যাক একসঙ্গে। বেগ-বরো-অর-ষ্টিল, একটা হিল্লে নিশ্চয়ই কোথাও হবে। আশা করি চেয়ে-চিন্তে ধারধুর করেই জুটে যাবে। শেষেরটার দরকার হবে না।'

দুজনে হাঁটতে সুরু করলাম, প্রায় বেলতলা থেকে নিমতলা, সাহাপুর থেকে কাশীপুর। প্রথম প্রথম নৃপেন ষোল আনা চেনা বাড়িতে ঢুকতে লাগল, শেষকালে দু-আনা এক-আনা চেনায়ও পেছপা হল না। মুখচেনা নামচেনা কিছুতেই তার উদ্যম-ভঙ্গ নেই। আমাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে একেকটা বাড়িতে গিয়ে ঢোকে আর বেরিয়ে আসে শূন্য মুখে, বলে, কিছুই হল না, কিংবা বাড়ি নেই কেউ, কিংবা ছোট একটি অভিশপ্ত নিশ্বাস ছেড়ে দুচরণ মেঘদূত আওড়ায়। এমনিতে স্থির হয়ে বসে থাকতে যা হত হাঁটার দরুন খিদেটা বহুগুণ চনচনে হয়ে উঠল। যত তীব্র তোমার ক্ষুধা তত দূর তোমার যাত্রা। সুতরাং থামলে চলবে না, না থামাটাই তো তোমার খিদে-পাওয়ার সত্যিকার সাক্ষ্য। কিন্তু রাত সাড়ে আটটা বাজে, ডিনার টাইম প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, আর মায়া বাড়িয়ে লাভ কি, এবার ভাল ছেলের মত বাড়ি ফিরে যং প্রাপ্তং তং ভক্ষিতং করি গে। হাত ধরে বাধা দিলাম নৃপেনকে, বললাম, 'এ পর্যন্ত ঠিক কত পেয়েছিস বল সত্যি করে ?'

হাতের মুঠ খুলে অম্লান মুখে নৃপেন বললে, 'মাইরি বলছি, মাত্র দুটাকা।'

দু টাকা! দুটাকায় প্রকাণ্ড খ্যাট হবে। ঈষদূন খাওয়া যাবে আকণ্ঠ। তবে এখনো চীন দেশে না গিয়ে শ্যামরাজ্যে আছি কেন ?

হতাশমুখে নৃপেন বললে, 'এ দুটাকায় কিছুই হবে না, এ দুটাকা আমার কালকের বাজার-খরচ।'

এই আমাদের রোমান্টিক নৃপেন, একদিকে বিদ্রোহী, অন্যদিকে

ভাবানুরাগী। ভাগ্যের রসিকতায় নিজেও ভাগ্যের প্রতি পরিহাসপ্রবণ। বস্তুত কল্লোল যুগে এ দুটোই প্রধান সুর ছিল, এক, প্রবল বিরুদ্ধবাদ; দুই, বিহ্বল ভাববিলাস। একদিকে অনিয়মাধীন উদ্দামতা, অন্যদিকে সর্বব্যাপী নিরর্থকতার কাব্য। একদিকে সংগ্রামের মহিমা, অন্যদিকে ব্যর্থতার মাধুরী। আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নিবারিত হচ্ছে—এই যন্ত্রণাটা সেই যুগের যন্ত্রণা। শুধু বন্ধ দরজায় মাথা খুঁড়ছে, কোথাও আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না, কিংবা যে জায়গায় পাচ্ছে তা তার আত্মার আনুপাতিক নয়—এই অসন্তোষে এই অপূর্ণতায় সে ছিন্নভিন্ন। বাইরে যেখানে বা বাধা নেই সেখানে বাধা তার মনে, তার স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের অবনিবনায়। তাই একদিকে যেমন তার বিপ্লবের অস্থিরতা, অন্যদিকে তেমনি বিফলতার অবসাদ।

যাকে বলে 'ম্যালাডি অফ দি এজ' বা যুগের যন্ত্রণা তা "কল্লোলের" মুখে স্পষ্টরেখায় উৎকীর্ণ। আগে এর প্রচ্ছদপটে দেখেছি একটি নিঃসম্বল ভাবুক যুবকের ছবি, সমুদ্র পারে নিঃসঙ্গ ঔদাস্যে বসে আছে—ফেন-উত্তাল তরঙ্গশৃঙ্গটা তার থেকে তখনও অনেক দূরে। তেরোশ একত্রিশের আশ্বিনে সে-সমুদ্র একেবারে তীর গ্রাস করে এগিয়ে এসেছে, তরঙ্গতরল বিশাল উল্লাসে ভেঙে ফেলছে কোন পুরোনো না পোড়ো মন্দিরের বনিয়াদ। এই দুই ভাবের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিল "কল্লোলে"। কখনো উন্মত্ত, কখনো উন্মনা। কখনো সংগ্রাম, কখনো বা জীবনবিতৃষ্ণা। প্রায় টুর্গেনিভের চরিত্র। ভাবে শেলীয়ান, কর্মে হ্যামলেটিশ।

((এ সময়টায় আমরা মৃত্যুর প্রেমে পড়েছিলাম। বিপ্লবীর জন্যে সে সময় মৃত্যুটা বড়ই রোমান্টিক ছিল—সে বিপ্লব রাজনীতিই হোক বা সাহিত্যনীতিই হোক। আর, সঙ্গ বা পরিপার্শ্ব অনুসারে রাজনীতি না হয়ে আমাদের ভাগে সাহিত্য। নইলে দুই ক্ষেত্রেই এক বিদ্রোহের আগুন, এক ধ্বংসের অনিবার্যতা। এক কথায়, একই যুগ-যন্ত্রণা। তাই

সেদিন মৃত্যুকে যে প্রেয়সীর সুন্দর মুখের চেয়েও সুন্দর মনে হবে তাতে আর বিচিত্র কি।

সেই দিন তাই লিখেছিলাম :

নয়নে কাজল দিয়া
উলু দিও সখি, তব সাথে নয়, মৃত্যুর সাথে বিয়া।

আর প্রেমেন লিখেছিল :

আজ আমি চলে যাই
চলে যাই তবে,
পৃথিবীর ভাই বোন মোর
গ্রহতারকার দেশে,
সাক্ষী মোর এই জীবনের
কেহ চেনা কেহ বা অচেনা।
তোমাদের কাছ হতে চলে যাই তবে।
যে কেহ আমার ভাই যে কেহ ভগিনী,
এই ঊর্মি-উদ্বেলিত সাগরের গ্রহে
অপরূপ প্রভাত-সন্ধ্যার গ্রহে এই
লহ শেষ শুভ ইচ্ছা মোর,
বিদায়পরশ, ভালোবাসা ;
আর তুমি লও মোর প্রিয়া
অনন্তরহস্যময়ী,
চিরকৌতূহল-জ্বালা—
অসমাপ্ত চুম্বনখানিরে
তৃপ্তিহীন।...
যত দুঃখ সহিয়াছি
বহিয়াছি যত বোঝা, পেয়েছি আঘাত

কাটায়েছি স্নেহহীন দিন
হয়ত বা বৃথা,
আজ কোনো ক্ষোভ নাই তার তরে
কোনো অনুতাপ আজ রেখে নাহি যাই—

আর নৃপেনের গলায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি :

মৃত্যু তোর হোক দূরে নিশীথে নির্জনে,
হোক সেই পথে যেথা সমুদ্রের তরঙ্গগর্জনে,
গৃহহীন পথিকেরি
নৃত্যচ্ছন্দে নিত্যকাল বাজিতেছে ভেরী
অজানা অরণ্যে যেথা উঠিতেছে উদাসমর্মর
বিদেশের বিবাগী নির্ঝর
বিদায় গানের তালে হাসিয়া বাজায় করতালি,
যেথায় অপরিচিত নক্ষত্রের আরতির থালি
চলিয়াছে অনন্তের মন্দিরসন্ধানে,
পিছু ফিরে চাহিবার কিছু যেথা নাই কোনোখানে।
দুয়ার রহিবে খোলা, ধরিত্রীর সমুদ্রপর্বত
কেহ ডাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ।
শিয়রে নিশীথরাত্রি রহিবে নির্বাক,
মৃত্যু সে যে পথিকেরে ডাক॥

পথিকেরা সেই ডাক যেন তখন একটু বেশি-বেশি শুনছিল। পথিকদের তার জন্যে খুব দোষ দেয়া যায় না। তাদের পকেট গড়ের মাঠ, ভবিষ্যৎ অনির্ণেয়। অভিভাবক প্রতিকূল, সমালোচক যমদূতের প্রতিমূর্তি। ঘরে-বাইরে সমান খড়্গাহস্ততা। এক ভরসাস্থল প্রণয়িনী, তা তিনিও পলায়নপর, বামলোচন। আর তাঁর যারা অভিভাবক তারা আকাট গুণ্ডামার্কা। এই অসম্ভব পরিস্থিতিতে কেউ যদি মরণকে "শ্যামসমান" বলে, মিথ্যে বলে না।

জিজ্ঞাসা ও নৈরাশ্য, সংগ্রাম ও অপূর্ণতা এই দুই যতির মধ্যে দুলছে তখন "কল্লোলের" ছন্দ। সে সময়কার প্রেমেনের দুটো চিঠি—প্রথমটা এই:

"অচিন, আমি অধঃপাতে চলেছি। তাও যদি ভালো ভাবে যেতে পারতুম! জীবন নিয়ে কি করতে চাই ভালো করে বুঝি না, যা বুঝি তাও করতে পারি না। মাঝে-মাঝে ভাবি, বোঝবার দরকার কিছু আছে কি? এই যে দার্শনিক কবি মানবহিতৈষী মহাপুরুষেরা মাথা ঘামিয়ে মরছেন এ ঘর্ম্ম বোধ হয় একেবারেই নিরর্থক। জীবনটাকে যে বেঁকিয়ে দুমড়ে বিকৃত করে ছেড়ে গেল, আর যে প্রাণপণ শক্তিতে জীবনকে কবিতা করার চেষ্টা করলে, দুজনেই বাজে কাজে হায়রান হল সমানই। তুমি বলবে আনন্দ আর দুঃখ—আমি বলি, তার চেয়ে ছেড়ে দাও, যার আদি বুঝি না অন্ত বুঝি না, ছেড়ে দাও তাকে নিজের খেয়ালে। হাসি পেলে হাস, আর যেদিন শ্রাবণের আকাশ অন্ধকারে আর্দ্র হয়ে উঠবে সেদিন জেনো ও মেনো কাঁদতে পাওয়াটাই পরম সৌভাগ্য। কোন দিন যদি খুশী হয়, নিজের সমস্ত সত্যকে মিথ্যার খোলসে ঢেকে নিজের সঙ্গে খুব বড় একটা পরিহাস কোরো, কোন ক্ষতি হবে না।

আমরা ছোট মানুষ, কুয়োর ব্যাঙ, কিছু জানি না, তাই ভাবি আমরা মস্ত একটা কিছু। নিজেদের জগতে চলাফেরা করি, ছোট্ট চেতনার আলোকে নিজের ঘরে নিজের সত্তার প্রকাণ্ড ছায়াটা দেখি আর মনে-মনে 'বড়-বড়' খেলা করি। কিন্তু ভাই আজ যদি এই পৃথিবীর গায়ের চুলকানির কীটের মত এই সমস্ত মানুষ জাতটার সবাই মিলে পণ করে

উচ্ছন্নে যাই, এই বিপুল নিখিলে এই বিরাট আকাশে কোনখানে এতটুকু কান্না জাগবে না, উল্কাপাত হবে না, অগ্নিবৃষ্টি হবে না, প্রলয় হবে না, বিরাট নিখিলে একটি চোখের পালক খসবে না।

তবে যদি মানুষকে একটা কথা শেখাতে চাও, আমি তোমার মতে—যদি এই নির্বোধ মানুষ জাতটাকে শেখাও শুধু স্ফূর্তির, নিছক স্ফূর্তির উপাসনা—এই দেবতা-ঠাকুরকে দূর করে দিয়ে, ঝেঁটিয়ে ফেলে সব সমাজশাসন সব নীতির অনুশাসন—শুধু জীবনটাকে আনন্দের সরাবখানায় অপব্যয় করতে—তবে রাজী আমি।

কিন্তু আনন্দ, সত্যকারের আনন্দ পেতে হলে চাই আবার সেই বন্ধন, চাই আবার সেই সমাজশাসন, যদিও উদারতর; চাই সত্যের ভিৎ, যদিও দৃঢ়তর—চাই সচেতন সৃষ্টিপ্রতিভা, চাই বিভিন্ন জীবনপ্রেরণার এমন সংযম ও সংযোগ যা সঙ্গীত।

সুতরাং এতক্ষণ সব বাজে বকেছি—বাজে বকব বলেই বাজে বকেছি। কারণ চিঠি লেখার চরম উদ্দেশ্য জীবনের নির্মম বাস্তবতাকে কিছুক্ষণের জন্যে অপদস্থ করে হাস্যাস্পদ করা।

আজ এখানে বেজায় বাদল, কাল থেকেই সুরু হয়েছে। শাল মুড়ি দিয়ে এলোমেলো বিছানায় বসে চিঠি লিখছি। এখন রাত সাড়ে সাতটা হবে। খুব সম্ভব তুই এখন গল্প লিখছিস—লিখছিস হয়ত বিরহী নায়ক তার প্রিয়ার ঘরের প্রদীপের আলোকে নিজের ব্যর্থ কামনার মৃত্যু দেখছে। হয়ত কোন ব্যথিত প্রণয়ী তোর হৃদয়ের কান্নার উৎসে জন্ম নিয়ে আজ চলল মানুষের আনন্দলোকের অবিনাশী মহাসভায়—যেখানে কালিদাসের যক্ষ আজো বিলাপ করছে, যেখানে পৃথিবীর সমস্ত মানবস্রষ্টার সৃষ্টি অমর হয়ে আছে।

একদিন নাকি পৃথিবীতে কান্না থাকবে না, কাঁদবার কিছু থাকবে না। সেদিনকার হতভাগ্য মানুষেরা হয়ত শখ করে তোদের সভায় কাঁদতে

আসবে আর আশীর্বাদ করবে এই তোদের, যারা তাদের ক্রন্দনহীন জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিবি।”

দ্বিতীয় চিঠি :

“বড় দুঃখ আমার এই যে কোন কাজই ভাল করে করতে পারলুম না। জীবনের মানেও বুঝতে পারি না। জানি শক্তিসংগ্রহে সুখ, পূর্ণ উপভোগ সুখ। কিন্তু সুখ আর কল্যাণ কোথায় এক হচ্ছে বুঝতে পারি না।

জীবনটা যখন চলা তখন একটা দিকে ত চলা দরকার, চার দিকে সমানভাবে দৌড়াদৌড়ি করলে কোন লাভ হবে না নিশ্চয়ই। সেই পথের লক্ষ্যটা একমাত্র আনন্দ ছাড়া আর কি করা যেতে পারে ভেবে পাচ্ছি না।···

আনন্দ কল্যাণের সঙ্গে না মিশলেই যায় সব ভেঙে। অনেক ধনী হয়ে অনেক টাকা বাজে অপব্যয় করার আনন্দ আছে, খুব ব্যভিচারী লম্পট হওয়াতেও আনন্দ আছে, সর্বত্যাগী বৈরাগী তপস্বী সন্ন্যাসী হওয়াতে আনন্দ আছে, কিন্তু কল্যাণের সঙ্গে আনন্দ মেশে না, তাই গোল। এগিয়েও ভুল করতে পারি, পেছিয়েও। পাল্লা সমান রেখে কেমন করে চলা যায় তাও ত ভেবে পাই না।

আমার মনে হয় আনন্দ আমার কাছে আনন্দ আর দুঃখ দুঃখ, শুধু এই জন্যেই যে, আনন্দ জীবনের সার্থকতার প্রমাণ আর দুঃখ মৃত্যুর ভ্রূকুটি। কথাটা একটু হেঁয়ালি ঠেকছে। আর যখন দেখা যায় আনন্দ জীবনের মূলচ্ছেদেও মাঝে মাঝে পাওয়া যায় তখন আরো হেঁয়ালি দাঁড়ায় বটে কথাটা। তবু আমার মনে হয় কথাটা সত্যি।

আর এ ছাড়াও, অর্থাৎ এ যদি সত্যি না হয়, তবু আনন্দ ছাড়া জীবনের পথের পাণ্ডা আর আমাদের কেউ নেই। যারা কর্তব্য-কর্তব্য বা বিবেক-বিবেক বলে চেঁচিয়ে মরে তারা আমার মনে হয় একেবারে

অন্ধ, না হয় একেবারে পাগল। কি কর্তব্য আর বিবেক কি বলে এটা যদি ঠিক করতেই পারা যাবে তাহলে আর এত গোল কেন? জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই তো বিবেক তৈরি হয়েছে আর কর্তব্য-অকর্তব্য প্রাণ পেয়েছে!

এই যে পাণ্ডাটি আমাদের, এ মাঝে-মাঝে ভুল করে, কিন্তু নাচার হয়ে আমাদের তাকেই সঙ্গে নিতে হবে পথ দেখাতে।

এমনিতর অনেক কথা ভাবি কিন্তু কিছু ঠিক করতে পারি না। ছেলেবেলা একটা সহজ idealism ছিল, ভালো মন্দ বেশ সুস্পষ্টভাবে মনে বিভক্ত হয়ে থাকত। মনে হত পথটা জানি চলাটাই শক্ত—এখন দেখছি চলার চেয়ে পথটা জানা কম কথা নয়।

এই ধর জীবনের একটা programme দিই। বিদ্যা জ্ঞান স্বাস্থ্য শক্তি সৌন্দর্য শিল্পসাধনা গেল প্রথম। দ্বিতীয় ভালবাসা পাবার। ধর পেলুম কিম্বা পেলুম না। তারপর আরো সাধনা পরিপূর্ণতার জন্যে। পরের উপকার, বিশ্বমানবের জন্যে দরদ, পৃথিবীজোড়া দুঃখ দারিদ্র্য হাহাকারের প্রতিকার চেষ্টায় যথাসাধ্য নিজেকে লাগান। তৃতীয় সারা জীবন ধরেই ভূমার জন্য তপস্যা, সারাজীবন ধরে দুঃখকে অবহেলা করবার ব্যর্থতাকে তুচ্ছ করবার মৃত্যুকে উপহাস করবার শক্তি অর্জন।

বেশ! মন্দ কি। কিন্তু যত সহজ দেখাচ্ছে ব্যাপারটা, আসলে মোটেই এমনি সহজে মীমাংসা হয় না। কি যে ভূমা আর কি যে পরিপূর্ণতা, কি যে মানুষের উপকার আর কি যে শিল্প আর জ্ঞান তা কি মীমাংসা হল?....

না। মাথা গুলিয়ে যায়। আসল কথা হচ্ছে এই যে, আফ্রিকার সব চেয়ে আদিম অসভ্য Bushman-এর একটা বিংশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ এরোপ্লেন পেলে যে অবস্থা হয় আমাদের এই জীবনটা নিয়ে হয়েছে তাই। আমরা জানি না এটা কি এবং কেন? এর কোথায় কি তা

তো জানিই না, এর সার্থকতা ও উদ্দেশ্য কি তাও জানি না। হয়ত আমাদের আনাড়ি নাড়াচাড়ায় কোন একটা কল নড়ে-চড়ে পাখাটা একবার ঘুরে উঠছে, আমরা ভাবছি হাওয়া খাওয়াই এর উদ্দেশ্য, কিম্বা হয়ত পাখা লেগে কারুর গা হাত-পা কেটে যাচ্ছে তখন ভাবছি এটা একটা উৎপীড়ন।

উপমাটা ঠিক হল না। কারণ অবস্থা ওর চেয়ে খারাপ এবং আফ্রিকার Bushman-এর কাছে একটা এরোপ্লেন যত জটিল ও অর্থহীন, অদ্ভুত জীবনটা আমাদের কাছে তার চেয়ে ঢের বেশি। মানুষ কত কোটি বছর পৃথিবীতে এসেছে এ নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের তর্ক আজও শেষ হয়নি, সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি, কিন্তু জীবনের অর্থ যে আজও পাওয়া যায়নি এ নিয়ে মতভেদ নেই বোধ হয়।

কবিত্ব করা যায় বটে এই বলে যে বোঝা যায়না বলেই জীবন অপরূপ মধুর সুন্দর, কিন্তু ভাই, মন হা হা করে। কি করি এই দুর্বোধ অনধিগম্য জীবন নিয়ে? যতদিন না মৃত্যু-শীতল হাত থেকে আপনি খসে পড়বে ততদিন এমনি করে ছুটোছুটি করে মরব আর কেঁদে কাটাব?

তা ছাড়া শুধু সুখ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবার উপায়ও যদি থাকত! তাও ত নেই। আমি হয়ত কুৎসিত আর একজন চিররুগ্ন, আর একজন নির্বোধ, আর একজন অন্ধ বা পঙ্গু, আর একজন দীন ভিখারীর মেয়ে। বলছ আনন্দ না পাও আনন্দের সাধনা কর, কেমন? কিন্তু জন্মান্ধের দেখতে পাবার সাধনা খঞ্জের নৃত্যসাধনা করা বোকামি নয় কি? স্থূল জগতে যেমন দেখছি মনের জগতেও অমনি নেই কে বলতে পারে? বোবা হয়ে গানের সাধনা তপস্যা করতে বল কি? জীবনের কোন গানের সাধনায় আমি বোবা তাত জানি না। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ি যদি, হয় ত আমার গায়েই লাগবে।"

কি হবে এত সব জিজ্ঞাসায় জর্জরিত হয়ে, সক্রেটিসীয় দার্শনিকের মত মৃত্যুরূপী পরিপূর্ণতার প্রতীক্ষা করে? তার চেয়ে চলো, মাঠে চলো, মোহনবাগানের খেলা দেখে আসি।

মোহনবাগান! আজকাল আর যেন তেমন করে বাজে না বুকের মধ্যে। সেই ইস্ট ইয়র্কস নেই, ব্ল্যাক-ওয়াচ ডারহামস এইচ-এল-আই ডি-সি-এল-আই নেই, সেই মোহনবাগানও নেই। আজকালকার মোহনবাগান যেন 'মোহন' সিরিজের উপন্যাসের মতই বাসি।

কিন্তু সে-সব দিনের মোহনবাগান মৃত দেশের পক্ষে সঞ্জীবনী ছিল। বলা বাহুল্য হবে না, রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন ছিল 'বন্দেমাতরম' তেমনি খেলার ক্ষেত্রে 'মোহনবাগান'। পলাশীর মাঠে যে কলঙ্কঅর্জন হয়েছিল তার স্খালন হবে এই খেলার মাঠে। আসলে, মোহনবাগান একটা ক্লাব নয়, দল নয়, সে সমগ্র দেশ—পরাভূত, পদানত দেশ, সেই দেশের সে উদ্ধত বিজয়-নিশান।

এ কথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে মোহনবাগানের খেলার মাঠেই বাঙলা দেশের জাতীয়ভাবোধ পরিপুষ্ট হয়েছিল। যে ইংরেজবিদ্বেষ মনে-মনে ধূমায়িত ছিল মোহনবাগান তাতে বাতাস দিয়ে বিশুদ্ধ আগুনের সুস্পষ্টতা এনে দিয়েছে। অত্যাচারিতের যে অসহায়তা থেকে 'টেররিজম' জন্ম নেয় হয়তো তার প্রথম অঙ্কুর মাথা তুলেছিল এই খেলার মাঠে। তখনো খেলার মাঠে সাম্প্রদায়িকতা ঢোকেনি, মোহনবাগান তখন হিন্দু-মুসলমানের সমান মোহনবাগান—তার মধ্যে নেবুবাগান কলাবাগান ছিল না। সেদিন যে 'ক্যালকাটা' মাঠের সবুজ গ্যালারি পুড়েছিল তাতে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, একজন এনেছিল পেট্রল, আরেকজন এনেছিল দিয়াশলাই। সওয়ার পুলিশের উচ্ছৃঙ্খল ঘোড়ার খুরে একসঙ্গে জখম হয়েছিলে দুজনে।

সে-সব দিনে খেলার মাঠে ঢোকার লাঞ্ছনার কথা ছেড়ে দিই, খেলার

মাঠে ঢুকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে যে অবিচার অনুষ্ঠিত হতে দেখেছে দেশের লোক, তাতে রক্ত ও বাক্য দুইই তপ্ত হয়ে উঠেছে ইংরেজের বিরুদ্ধে। আর এই তপ্ত বাক্য আর রক্তই ঘরে-বাইরে স্বাধীন হবার সংকল্পে ধার জুগিয়েছে। সে-সব দিনের রেফারিগিরি করা ইংরেজের একচেটে ছিল, আর সেই একচোখো রেফারি পদে-পদে মোহনবাগানকে বিড়ম্বিত করেছে। অবধারিত গোল দেবে মোহনবাগান, হুইসল দিয়েছে অফসাইড বলে। ফাউল করলে ক্যালকাটা, ফাউল দিলে না, যদি বা দিলে, দিলে মোহনবাগানের বিপক্ষে। কিছুতেই মোহনবাগানকে দাবানো যাচ্ছে না, বিনামেঘে বজ্রপাতের মত বলা-কওয়া-নেই দিয়ে বসল পেনাল্টি। একেকটা জোচ্চুরি এমন দুকান-কাটা ছিল যে সাহেবদের কানও লাল না হয়ে থাকতে পারত না। একবার এমনি ক্যালকাটার সঙ্গে খেলায় মোহনবাগানের বিরুদ্ধে রেফারি হঠাৎ পেনাল্টি দিয়ে বসল। যেটা খুবই অসাধারণ, ব্যাক থেকে কলভিন না বেনেট এল শট করতে। শট করে সে-বল সে গোলের দিকে না পাঠিয়ে কয়েক মাইল দূর দিয়ে পাঠিয়ে দিলে। সেটা রেফারির গালে প্রায় চড় মারার মত—দিবালোকের মত এমন নির্লজ্জ ছিল সেই পেনাল্টি। খেলোয়াড়ের পক্ষে রেফারিকে মারা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম সন্দেহ নেই, কিন্তু তিক্তবিরক্ত হয়ে সেদিন যে ড্যালহৌসির মাঠে বলাই চাটুজ্জে ক্লেটন সাহেবকে মেরেছিল সেটা অবিস্মরণীয় ইতিহাস হয়ে থাকবে।

শুধু রেফারি কেন, সমস্ত শাসকবংশই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রী ছিল। নইলে ১৩৩০ সালে মোহনবাগানকে ক্যালকাটার বিরুদ্ধে শিল্ড-ফাইন্যালে খেলানো হত না। সেদিন রাত থেকে ভুবনপ্লাবন বর্ষা, সারা দিনে এক বিন্দু বিরাম নেই। মাঠে এক-হাঁটু জল, কোথাও বা এক কোমর, হেদো না থাকলে সে-মাঠে অনায়াসে ওয়াটার-পোলো খেলা চলে। ফুটবল বর্ষাকালের খেলা সন্দেহ নেই, কিন্তু বর্ষারও একটা

সীমা আছে সভ্যতা আছে। মোহনবাগান তখন দুর্ধর্ষ দল, ফরোয়াডে শরৎ সিঙ্গি, কুমার আর রবি গাঙ্গুলি—তিন তিনটে অভ্রান্ত বুলেট—আর ব্যাকে সেই দুর্ভেদ্য চীনের দেয়াল—গোষ্ঠ পাল। ক্যালকাটা ভাল করেই জানে শুকনো মাঠে এই দুর্বারণ মোহনবাগানকে কিছুতেই শায়েস্তা করা যাবে না। সুতরাং বান-ভাসা মাঠে একবার তাকে নামাতে পারলেই সে কোনঠাসা হয়ে যাবে! শেষদিকে বৃষ্টি বন্ধ করানো গেলেও খেলা কিছুতেই বন্ধ করানো গেল না। ক্যালকাটা কর্তৃপক্ষের সে অসঙ্গত অনম্রতা পরোক্ষে দেশের মেরুদণ্ডকেই আরো বেশি উদ্ধত করে তুললে। যে করে হোক পরাভূত করতে হবে এই দম্ভদৃপ্তকে। যে সহজ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এসেও ভুলতে পারে না সে উপরিতন, সে একতন্ত্রী।

আর, মোহনবাগানকেও বলিহরি। খেলছিস ফুটবল, ছুটতে গিয়ে যেখানে প্রতিপদে আছাড় খেতে হবে, পায়ে বুট পরে নিস না কেন? উপায় কি, বুট পরলে আর ছুট দিতে পারব না, ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস যে। দেশে-গাঁয়ে যখন বাতাবি নেবু পিটেছি তখন থেকে, সেই সুরুর থেকেই তো খালি-পা। জুতো কিনি তার সঙ্গতি কই? স্কুল-কলেজে যাবার জন্যে এক জোড়া জোটানোই কষ্টকর, তায় মাঠে-মাঠে লাফাবার জন্যে আরেক জোড়া? মোটে মা রাঁধেন না, তপ্ত আর পান্তা। দেখ না এই খালি পায়েই কেমন পক্ষিরাজ ঘোড়া ছুটাই। কেমন দিগ্বিজয় করে আসি। ভেব না, তাক লাগিয়ে দেব পৃথিবীর। খালি পায়েই ঘায়েল করব বুটকে। উনিশশো এগারো সনে এই খালি পায়েই শিল্ড এনেছিলাম। এবার পারলাম না, কিন্তু, দেখো, আরবার পারব। যেও সব তোমরা।

যাব তো ঠিক, কিন্তু দুপুরের দিকে হঠাৎ কোথা থেকে এক টুকরো কালো মেঘ ভেসে এসেছে, অমনি নিমেষে সকলের মুখ কালো হয়ে গেল। হে মা কালীঘাটের কালী, হে মা কালীতলার

কালী, তোমরা কে বেশি কালো জানি না, কিন্তু এ মেঘ তোমাদের গায়ে মেখে-মেখে মুছে দাও মা, তোমাদের কালো কেশে উড়িয়ে নিয়ে যাও কৈলাসে। কত তুকতাক, কত মানৎ, কত ইষ্টমন্ত্র, হাওয়া উঠুক, ধুলো উড়ুক, মেঘ লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক। সব সময় প্রার্থনা কি আর শোনে! মেঘের পরে মেঘ শুধু জমাটই হতে থাকে, ঘন নৈরাশ্যের পর ঘনতর মনস্তাপ। সে যে কী দুঃসময় তা কে বা বোঝে, কাকে বা বোঝাই! ঘাড় গলা উঁচু করে শুধু আকাশের দিকে তাকানো আর মেঘের অবয়ব আর চরিত্র নিয়ে গবেষণা। পশ্চিমের মেঘ যে অমোঘ হয় এই মর্মন্তুদ সত্য চার আনার সবুজ গ্যালারিতে বসেই প্রথম উপলব্ধি করেছি। ফটিকজল পাখি আছে শুনেছি, এখন দেখলাম ফটিকরোদ পাখি। যারা জল চায় না রোদ চায়, মেঘের বদলে মরুস্থলীর জন্যে হা হা করে। হেনে বৃষ্টি আসবার ছড়া আছে, মেঘ-মারণমন্ত্রের প্রথম ছড়া সৃষ্টি হয় এই মোহনবাগানের মাঠে!

ওরে মেঘ দূরে
যা শিগগির উড়ে।
নেবুর পাতা করমচা
রকে বসে গরম চা!

তবু, পাহাড় সরে তো মেঘ সরে না। ব্যাঙের ভঙ্গিমায় নেমে আসে বাস্তব বৃষ্টি। মনে হয় না ঘনকৃষ্ণ কেশ আকুলিত করে কেউ কোনো নীপবনে ধারাস্নান করছে। বরং মনে হচ্ছে দেশের মাথায় উপর ঝরে পড়ছে দোদণ্ড অভিশাপ। আর যেমনি জল ঝরল অমনি মোহনবাগানের জৌলুস গেল ধুয়ে। আশ্চর্য, তখন তাতে না রইল আর বাগান, না বা রইল মোহ। তখন তার নাম গোয়াবাগান বা বাদুড়বাগান রাখলেও কোনো ক্ষতি নেই।

তবু, কালে-ভদ্রে এমন একেকটা রোমহর্ষক খেলা সে জিতে ফেলে যে তার উপর আবার মায়া পড়ে, মন বসে। বারে-বারে প্রতিজ্ঞা করে মাঠ থেকে বেরিয়েছি ও-হতচ্ছাড়ার খেলা আর দেখব না, আবার বারে-বারেই প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হয়েছে। তাই তেরোশো তিরিশের হারের পরও যে আবার মাঠে যাব—কল্লোলের দল নিয়ে—তা আর বিচিত্র কি। ওরা খেলে না জিতুক, আমরা অন্তত চেঁচিয়ে জিতব। জিত আমাদের হবেই, হয় খেলায় নয় এই একত্রমেলায়।

"কল্লোলের" লাগোয়া পুবের বাড়িতে থাকত আমাদের সুধীন—সুধীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের দলের সর্বকনিষ্ঠ তরুণ উৎসাহী। সুগৌর-সুন্দর চেহারা, সকলের স্নেহভাজন। দলপতি স্বয়ং দীনেশদা। যৌবনের সেই যৌবরাজ্যে বয়সের কোনো ব্যবধান ছিল না, আর মোহনবাগানের খেলা এমন এক ব্যাপার যেখানে ছেলে-বুড়ো শ্বশুর-জামাই সব একাকার, সকলের এক ক্ষুরে মাথা মোড়ানো। অতি উৎসাহে সামনে কারু পিঠে হয়তো চাপড় দিয়েছি, ভদ্রলোক ঘাড় ফেরাতেই চেয়ে দেখি পূজ্যপাদ প্রফেসর। উপায় নেই, সব এখন এক সানকির ইয়ার মশাই, এক গ্যালারির গায়েক-গায়েন। আরো একটু টানুন কথাটা, এক সুখদুঃখের সমাংশভাগী! তাই, ঐ দেখুন খেলা, বেশিক্ষণ ঘাড় ফিরিয়ে চোখ গোল করে পেছনে তাকিয়ে থাকবার কোনো মানে হয় না। বলা বাহুল্য, উত্তেজনার তরঙ্গে ঐ সব ছোটখাট রাগ-দুঃখের কথা ভুলে যেতে হয়, আর দর্শকদের বহু জন্মের সুকৃতির ফলে মোহনবাগান যদি একবার গোল দেয়, তখন সেই পূজ্যপাদ প্রফেসরও হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করেন আর ছাত্রের গলা ধরে আনন্দ-মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খান। সব আবার এক খেয়ার জল হয়ে যায়।

বস্তুত আট আনার লোহার চেয়ারে বসে কি করে যে ভদ্রলোক

গেজে ফুটবল খেলা দেখা চলে তা আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না। এ কি ক্রিকেট খেলা, যে পাঁচ ওভার ঠুকঠাক করবার পর খুঁচ করে একটা 'গ্লান্স' হবে, না, সাঁ করে একটা 'ড্রাইভ' হবে! এর প্রতিটি মুহূর্ত উদ্বেগে উত্তেজনায় ঠাসা, বল এখন বিপক্ষের গোলের কাছে, পলক না পড়তেই আবার নিজের-নিজের হৃৎপিণ্ডের দুয়ারে। সাধ্য কি তুমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকতে পার! এই, সেণ্টার কর্, ওকে পাশ দে, ঐখানে থ্রু মার্—এমনি বহু নির্দেশ-উপদেশ দিতে হবে তোমাকে। শুধু তাই? কখনো কখনো শাসন-তিরস্কারও করতে হবে বৈ কি। খেলতে পারিস না তো নেমেছিস কেন, ল্যাকপ্যাক করছিস যে মাল খেয়ে নেমেছিস নাকি, বুক দিয়ে পড় গোলের কাছে, পা দুখানা যায় তো সোনা দিয়ে মিউজিয়মে বাঁধিয়ে রাখব! তারপর কেউ যদি গোল 'মিস্' করে, তখন আবার উল্লম্ফন: বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা মাঠ থেকে, গিন্নির আঁচল ধরে থাক গে। আর যদি রেফারি একটা অমনোমত রায় দেয় অমনি আবার উচ্চঘোষ: মারো, মারো শালাকে, থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দাও। এ সব মহৎ উত্তেজনা গ্যালারি ছাড়া আর কোথায় হওয়া সম্ভব? উঠে দাঁড়াতে না পারলে উল্লাস-উল্লোল হওয়া যায় কি করে? তাই গ্যালারিতেই আমাদের কায়েমী আসন ছিল, মাঝ-মাঠে সেণ্টারের কাছাকাছি, পাঁচ কি ছয় ধাপ উপরে। প্রায়ই আমরা এক সঙ্গে যেতাম কল্লোল-আপিস থেকে—দীনেশদা, সোমনাথ, গোরা, নৃপেন, প্রেমেন, সুধীন আর আমি—কোনো কোনো দিন আশু ঘোষ সঙ্গে জুটত। আরো কিছু পরে প্রবোধ সান্যাল। অবিশ্যি যে সব দিন এগারোটা-বারোটায় এসে লাইন ধরতে হত সে সব দিন মাঠের বাইরে আগে থেকে সবাইর একত্র হওয়া যেত না, কিন্তু মাঠে একবার ঢুকতে পেরেছ কি নিশ্চিন্ত আছ তোমার নির্ধারিত জায়গা আছে। নজরুল আরো পরে ঢোকে খেলার মাঠে এবং তখনা

সে বেশ সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতিচিহ্নিত। তাই সে জনগণের গ্যালারিতে না এসে বসেছে গিয়ে আট আনার চেয়ারে, কিন্তু তার উল্লাস-উড্ডীন রঙিন উত্তরীয়টি ঠিক আছে। অবিশ্যি চাদর গায়ে দিয়ে খেলার মাঠে আসতে হলে অমনি উচ্চতর পদেই আসা উচিত। আমাদের তো জামা ফর্দা-ফাঁই আর জুতো চিচিং-ফাঁক। বৃষ্টি নেই এক বিন্দু, অথচ তিন ঘণ্টা ধস্তাধস্তি করে মাঠে ঢুকে দেখি এক হাঁটু কাদা। ব্যাপার কি? শুনলাম জনগণের মাথার ঘাম পায়ে পড়ে-পড়ে ভূমিতল কাদা হয়ে গেছে। সঙ্গে না আছে ছাতা না বা ওয়াটারপ্রুফ—শুধু এক চশমা সামলাতেই প্রাণান্ত। কনুয়ের ঠেলায় কত লোকের চশমা যে নাসিকাচ্যুত হয়েছে তার ইতি-অন্ত নেই। আর চক্ষুলজ্জাহীন চশমাই যদি চলে যায় তবে আর রইল কি? কখনো-কখনো ভূমিপৃষ্ঠ থেকে পাদস্পর্শ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, জলে ভাসা জানি, এ দেখছি স্থলে ভাসা। নগ্ন পদের খেলা দেখতে রিক্ত হাতে শূন্য মাথায় কখনো বা নগ্ন পদেই মাঠে ঢুকেছি।

শুধু গোকুলকেই দেখিনি মাঠে, তার কারণ "কল্লোলের" দ্বিতীয় বছরেই তার অসুখ করে আর সে-অসুখ আর তার সারে না। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে শৈলজা একদিন গিয়েছিল আর চুপি-চুপি জিগগেস করেছিল, 'গোষ্ঠ পাল কোন জন?' আরো পরে, বুদ্ধদেব বসুকে একদিন নিয়ে গিয়েছিলাম, সে বলেছিল, 'কর্নার আবার কাকে বলে?' শুনেছি ওরা আর দ্বিতীয়-দিন মাঠে যায়নি।

তবু তো এখন কিউ হয়েছে, আগে-আগে ঘোড়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে ঢুকতে হয়েছে, মাঝদিকে গুণ্ডার কাছ থেকে বেশি দরে টিকিট কিনে। আগে-আগে গ্যালারির বাইরে কাঁটা-তারের বন্ধন ছিল না, বাইরের কত লোককে যে কত জনে টেনে তুলেছে ভিতর থেকে তার লেখাজোখা নেই। যাকে টেনে তুলছে সে যে সব সময়ে পরিচিত বা আত্মীয়বন্ধু

তার কোনো মানে নেই, দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাও বলা যায় না, তবু নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করা—এই একটা নিষ্কাম আনন্দ ছিল। এখন কাঁটাতারের বড় কড়াক্কড়ি, এখন কিউর লাইন এসে দাঁড়ায় হল-য়্যাণ্ড-য়্যাণ্ডার্সনে পর্যন্ত, খেলা দেখায় আর সেই পৌরুষ কই!

নরক গুলজার করে খেলা দেখতাম সবাই। উল্লাসজ্ঞাপনের যত রকম রীতিপদ্ধতি আছে সব মেনে চলতাম। এমন কি পাশের লোকের হাত থেকে কেড়ে ছাতা ওড়ানো পর্যন্ত। বৃষ্টি যদি নামত তো চেঁচিয়ে উঠতাম সবার সঙ্গে: ছাতা বন্ধ, ছাতা বন্ধ। ঘাড় সোজা রেখে ভিজতাম। শেষকালে যখন চশমার কাঁচ মুছবার জন্যে আর শুকনো কাপড় থাকত না তখনই বাধ্য হয়ে কারু ছাতার আশ্রয়ে বসে পড়তে হত। খেলা যদি দেখতে চাও তো বসে থাকো ভিজে বেরাল হয়ে। মনে আছে এমনি এক বর্ষার মাঠে হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে এক ছাতার তলায় গুড়ি মেরে বসেছিলাম সারাক্ষণ। বৃষ্টির জলের চেয়ে পার্শ্ববর্তী ছাতার জলই যে বেশি বিরক্তিকর মর্মে-মর্মে বুঝেছিলাম সেদিন।

কিন্তু যদি আকাশভরা সোনার রোদ থাকে, মাঠ শুকনো খটখটে, তবে সব কষ্ট সহ্য করবার দায়ধারী আছি। আর সে গগনদাহন গ্রীষ্মের কষ্টই কি কম! তারপর যদি দুপুর থেকে বসে থেকে মাথার রোদ ক্রমে-ক্রমে মুখের উপর তুলে আনতে হয়! কিন্তু, খবরদার, ভুলেও জল চেও না, জল চাইতে না মেঘ এসে উদয় হয়! যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেন সংস্থিতা তার ধ্যান করো। বরফের টুকরো বা কাটা শশা বা বাতাবিনেবু না জোটে তো শুকনো চীনেবাদাম খাও। আর যদি ইচ্ছে করো আলগোছে কারো শূন্য পকেটে শুকনো খোসাগুলো চালান করে দিয়ে বকধার্মিক সাজো।

যেমনি দুই দিক থেকে দুই দল শূন্যে বল হাই কিক মেরে মাঠে নামল অমনি এক ইঙ্গিতে সবাই উঠে দাঁড়াল গ্যালারিতে। এই

গ্যালারিতে উঠে দাঁড়ানো নিয়ে বন্ধুবর শচীন করকে একবার কোন সাপ্তাহিকে আক্ষেপ করতে দেখেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে তাঁর বক্তব্য ছিল এই, যে, গ্যালারিতে যে যার জায়গাই বসেই তো দিব্যি খেলা দেখা যায়, তবে মিছিমিছি কেন উঠে দাঁড়ানো? শুধু যে যোগ্য উত্তেজনা দেখানোর তাগিদেই উঠে দাঁড়াতে হচ্ছে তা নয়, উঠে দাঁড়াতে হচ্ছে আট আনার চেয়ার ও চার আনার গ্যালারির মধ্যেকার জায়গায় লোক দাঁড়িয়েছে বলে। বাধ্য হয়েই তাই গ্যালারির প্রথম ধাপের লোককে দাঁড়াতে হচ্ছে এবং তার ফলে একে-একে অন্যান্য ধাপ। তাছাড়া বসে বসে বড় জোর হাততালি দেওয়ার মত খেলা তো এ নয়। উঠে দাঁড়াতেই হবে তোমাকে, অন্তত মোহনবাগান যখন গোল দিয়েছে। কখনো-কখনো সে চীৎকার নাকি বালি থেকে বালিগঞ্জ পর্যন্ত শোনা গেছে। সে চীৎকার কি বসে-বসে হয়?

তবু এত করেও কি প্রত্যেক খরার দিনেই জেতাতে পেরেছি মোহনবাগানকে? একেবারে ঠিক চূড়ান্ত মুহূর্তে অত্যন্ত অনাবশ্যক ভাবে হেরে গিয়েছে দুর্বলতর দলের কাছে। কুমোরটুলি এরিয়ান্স হাওড়া ইউনিয়নের কাছে। ঠিক পারের কাছে নিয়ে এসে বানচাল করে দিয়েছে নৌকো। সে সব দুর্দৈবের কথা ভাবতে আজো নিজের জন্যে দুঃখ হয়—সেই ঝোড়ো কাক হয়ে ম্লান মুখে বাড়ি ফিরে যাওয়া। চলায় শক্তি নেই, রেস্তরাঁয় ভক্তি নেই—এত সাধের চীনেবাদামে পর্যন্ত স্বাদ পাচ্ছি না—সে কি শোচনীয় অবস্থা! ওয়ালফোর্ডের ছাদ-খোলা দোতলা বাস-এ সান্ধ্যভ্রমণ তখন একটা বিলাসিতা, তাতে পর্যন্ত মন ওঠে না, ইচ্ছে করে ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশে উঠে মুখ লুকোই। কে একজন যে মোহনবাগানের হেরে যাওয়ায় আত্মহত্যা করেছিল তার মর্মবেদনাটা যেন কতক বুঝতে পারি। তখনই প্রতিজ্ঞা করি আর যাব না ঐ অভাগ্যের এলাকায়। কিন্তু হঠাৎ আবার কোন স্থদিনে

সমস্ত সংকল্প পিটটান দেয়। আবার একদিন পাঞ্জাবির, ঘড়ির পকেটে গুনে-গুনে পয়সা গুঁজি। বুঝতে পারি মোহনবাগান যত না টানে, টানে সেণ্টারের কাছাকাছি সেই কল্লোলের দল।

আচ্ছা, এরিয়ান্স হাওড়া ইউনিয়ন—এরাও তো দিশি টিম, তবে এরা জিতলে খুশি হই না কেন, কেন মনে-মনে আশা করি এরা মোহনবাগানকে ভালবেসে গোল ছেড়ে দেবে, আর গোল ছেড়ে না দিলে কেন চটে যাই? যখন এরা সাহেব টিমের সঙ্গে খেলছে তখন অবিশ্যি আছি আমরা এদের পিছনে, কিন্তু মোহনবাগানের সঙ্গে খেলতে এসেছ কি খবরদার, জিততে পাবে না, লক্ষ্মী ছেলের মত লাড্ডু খেয়ে বাড়ি ফিরে যাও। মোহনবাগানের ঐতিহ্যকে নষ্ট কোরো না যেন।

রোজ-রোজ খেলা দেখার ভিড় ঠেলার চেয়ে মোহনবাগানের মেম্বর হয়ে যাওয়া মন্দ কি। কিন্তু মেম্বর হয়েও যে কি দুর্ভোগ হতে পারে তারও দৃষ্টান্ত দেখলাম। একদিন কি একটা খবরের কাগজের স্তম্ভ-কাঁপানো বিখ্যাত খেলায় দেখতে পেলাম তিন-চারজন মেম্বর মাঠে না ঢুকে বাইরে বসে সিগারেট ফুঁকছে, তাদের ঘিরে ছোট্ট একটি ভিড়। বিশ্বাসাতীত ব্যাপার—ভিতরে ঐ চিত্ত-চমকানো খেলা, আকাশ-ঝলসানো চীৎকার—অথচ এ কয়জন জাঁদরেল মেম্বর বাইরে ঘাসের উপর বসে নির্লিপ্ত মুখে সিগারেট খাচ্ছে আর মন্দ-মন্দ পা দোলাচ্ছে। ভিড়ের থেকে একজন এগিয়ে গিয়ে বিস্মিত স্বরে জিগগেস করলে, 'এ কি, আপনারা মাঠে ঢোকেন নি যে?' ভদ্রলোকের মধ্যে একজন বললে: 'আমরা তো কেউ মাঠে ঢুকি না, বাইরেই বসে থাকি চিরদিন। আমরা non-seeing মেম্বর।' তার মানে? তার মানে, আমরা অপয়া, অনামুখো, অলক্ষুনে, আমরা মাঠে ঢুকলেই মোহনবাগান নির্ঘাৎ হেরে যায়, মেম্বর হয়েও আমরা তাই খেলা দেখি না, বাইরে বসে দাঁতে ঘাস কাটি আর চীৎকার শুনি।

এই অপূর্ব স্বার্থশূন্যতার কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। বাড়িতে বা অন্য কোথাও গেলে বা বসে থাকলে চলবে না, খেলার মাঠে আসতে হবে ঠিক, আর খেলার মাঠে অনায়াসে ঢোকবার হকদার হয়েও ঢুকবে না কিছুতেই, বাইরে বসে থাকবে এককোণে—এমন আত্মত্যাগের কথা এ যুগের ইতিহাসে বড় বেশি শোনা যায়নি। আরো একটা উদাহরণ দেখেছি স্বচক্ষে—একটি খঞ্জ ভদ্রলোকের মাধ্যমে। কি হল, পা গেল কি করে? গাড়ি-চাপা? ভদ্রলোক কঠিন মুখে করুণ ভাবে হাসলেন। বললেন, 'না। ফুটবল-চাপা।' সে কি কথা? আর কথা নয়, কাজ ঠিক আদায় করে নিয়েছেন ষোল আনা। শুধু আপনাকে বলছি না, দেশের লোককে বলছি। সবাই বলেছিলেন ফুটবল মাঠে পা-খানা রেখে আসতে, আপনাদের কথা শুনে তাই রেখে এসেছি। কই এখন সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখবেন না যাদুঘরে?

এগারো

ফুটবল খেলার মাঠে তুজন সাহিত্যিককে আমরা আবিষ্কার করি। শিবরাম চক্রবর্তী সেণ্টারের কাছে গ্যালারির প্রথম ধাপে দাঁড়াত—তাকে টেনে আনতে দেরি হত না আমাদের দশচক্রে। গোলগাল নধরকান্তি চেহারা, লম্বা চুল পিছনের দিকে ওলটানো। সমস্তটা উপস্থিতি রসে-হাস্যে সমুজ্জ্বল। তার মধ্যে শ্লেষ আছে কিন্তু দ্বেষ নেই—সে সরসতা সরলতারই অন্য নাম। "ভারতী"তে অদ্ভুত কতগুলো ছোট গল্প লিখে অস্বাভাবিক খ্যাতি অর্জন করেছে, আর তার কবিতাও স্পষ্টস্পর্শ প্রেমের কবিতা—আর সে-প্রেম একটু জরো হলেও জল-বার্লি-খাওয়া প্রেম নয়। শিবরামের সত্যিকারের আবির্ভাব হয় তার একাঙ্ক নাটিকায়—"যেদিন তারা কথা বলবে" আজকালকার গণসাহিত্যের নির্ভুল পূর্বগামী। সেই স্তব্ধতার দেশে বেশি দিন না থেকে শিবরাম চলে এল উজ্জ্বল-উচ্ছল মুখরতার দেশে। কলহাস্যের মুখরতা। শিবরাম হাসির গল্পে কায়েমী বাসা বাঁধলে। বাসা যেমন পাকা, স্বত্বও তেমনি উঁচুদরের।

হাসির প্রাণবন্ত প্রস্রবণ এই শিবরাম। সব চেয়ে সুন্দর, সবাইকে যখন সে হাসায় তখন সেই সঙ্গে-সঙ্গে নিজেও সে হাসে এবং সবাইর চেয়ে বেশি হাসে। আর, হাসলে তাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। গালে কমনীয় টোল পড়ে কিনা জানি না, কিন্তু তার মন যে কী অগাধ নির্মল, তার পরিচ্ছন্ন ছায়া তার মুখের উপর ভেসে ওঠে। পরকে নিয়ে হয়ত হাসছে তবু সর্বক্ষণ সেই পরের উপর তার পরম মমতা! শিবরামের কোনো দল নেই দ্বন্দ্বও নেই। তার হাসির হাওয়ার জন্যে প্রত্যেকের হৃদয়ে উন্মুক্ত নিমন্ত্রণ। শিবরামই বোধ হয় একমাত্র

লোক যে লেখক হয়েও অন্যের লেখার অবিমিশ্র প্রশংসা করতে পারে। আর সে-প্রশংসায় এতটুকু ফাঁক বা ফাঁকি রাখে না। আজকালকার দিনে লেখক, লেখক হিসেবে যত না হোক, সমালোচক হিসেবে বেশি বুদ্ধিমান। তাই অন্য লেখককে পরিপূর্ণ প্রশংসা করতে তার মন ছোট হয়ে আসে। হয়ত ভাবে, অন্যকে প্রশংসা করলে নিজেই ছোট হয়ে গেলাম। আর যদি বা প্রশংসা করতে হয় এমন কটা 'কিন্তু' আর 'যদি' এনে ঢোকাতে হবে যাতে বোঝা যাবে লেখক হিসাবে তুমি বড় হলেও বোদ্ধা হিসেবে আমি আরো বড়। মানে প্রশংসা করতে হলে শেষ পর্যন্ত আমিই যেন ভিতি, পাঠকেরা আমাকেই যেন প্রশংসা করে। বুদ্ধির সঙ্গে এমন সংকীর্ণ আপোষ নেই শিবরামের। যদি কোনো লেখা তার মনে ধরে সে মন মাতিয়ে প্রশংসা করবে। আর প্রশংসা করবে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, নিজের জন্যে এতটুকু সুখ-সুবিধে না রেখে। এই প্রশংসায় তার নিজের বাজার উঠে গেল কিনা তার দিকে না তাকিয়ে। যতদূর দেখেছি, শিবরামই তাদের মধ্যে এক নম্বর, যারা লেখক হয়েও অন্য লোকের লেখা পড়ে, ঠিকঠাক মনে রাখে ও গায়ে পড়ে ভালো লেখার সুখ্যাতি করে বেড়ায়।

কিন্তু এক বিষয়ে সে নিদারুণ গম্ভীর। অন্তত সে-সব দিনে থাকত। হাইকোর্টের আদিম বিভাগে কি এক মহাকায় মোকদ্দমা হচ্ছে তার ফলাফল নিয়ে। অবিশ্যি অফল নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই, কেননা অফলে যেমনটি আছে তেমনটিই থাকবে—মুক্তারামবাবুর স্ট্রিটে মেসে সেই 'তক্তারামে' শোওয়া আর 'শুক্তারাম' ভক্ষণ—এ তার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। কিন্তু ফল হলেই বিপদ। তখন নাকি অর্ধেক রাজ্য আর সেই সঙ্গে আস্ত একটি অর্ধাঙ্গিনী জুটে যাবার ভয়। মোকদ্দমায় যে ফল হয় নি তা শিবরামকে দেখলেই বোঝা যায়। কেননা এখনো সে ঐ একই আছে, দেড় হয়নি; আর মুক্তির আরামে

আছেও সেই মুক্তারামবাবুর মেসে। সারা জীবনে যে একবারও বাসা বদল করে না সে নিঃসন্দেহ খাঁটি লোক।

মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে, আর শিবরামের মুখে চলেছে শব্দের খেলা। কুমার হয়তো একটা ভুল পাশ দিলে, অমনি বলে উঠল: 'কু-মার'; কিংবা গোষ্ঠর সঙ্গে প্রবল ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ল বিপক্ষের খেলোয়াড়, অমনি বলে উঠল: 'এ বাবা, শুধু গোষ্ঠ নয়—গোস্ত।' মাঠের বাইরেও এমনি খেলা চালাত অবিরাম। জুৎসই একটা নাম পেলেই হল—শত্রু-মিত্র আসে যায় না কিছু। নিজের নামের মধ্যে কি মজার pun রয়েছে শুধু সেই সম্বন্ধেই উদাসীন।

আরেক আবিষ্কার আমাদের বিশুদা—বিশ্বপতি চৌধুরী। একখানা বই লিখে যে বাঙলা সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছে। 'ঘরের ডাক'-এর কথা বলছি—খেলার মাঠেও তার সেই ঘরের ডাক, হৃদয়ের ডাক। সহজেই আমাদের দলের মধ্যে এসে দাঁড়াত আর হাসাত অসম্ভব উচ্চ গ্রামে। হাসাত অথচ নিজে এতটুকু হাসত না—মুখ-চোখ নিদারুণ নির্লিপ্ত ও গম্ভীর করে রাখত। সমস্ত হাসির মধ্যে বিশুদার সেই গাম্ভীর্যটাই সব চেয়ে বেশি হাস্যোদ্দীপক। শিবরাম শুধু বক্তা, কিন্তু বিশুদা অভিনেতা। শিবরামের গল্প বাস্তব কিন্তু বিশুদার গল্প একদম বানানো। অথচ, এ যে বানানো তা তার চেহারা দেখে কারু সন্দেহ করার সাধ্য নেই। বরং মনে হবে, এ যেন সদ্য-সদ্য ঘটেছে আর বিশুদা স্বয়ং প্রত্যক্ষদর্শী। এমন নিষ্ঠুর ও নিখুঁত তার গাম্ভীর্য। উদ্দাম কল্পনার এমন মৌলিক গল্প রচনার মধ্যেও বাহাদুরি আছে। আর সব চেয়ে কেরামতি হচ্ছে, সে-গল্প বলতে গিয়ে নিজে এতটুকু না-হাসা। মনে হয়, এ যেন মোহনবাগান গোল দেবার পর 'গো—ল' না বলা। শুনলে হয়তো সবাই আশ্চর্য হবে, মোহনবাগান গোল দেয়ার পরেও বিশুদা গম্ভীর থেকেছে।

তার গাম্ভীর্যটাই কত বড় হাসির ব্যাপার, একদিনের একটা ঘটনা স্পষ্ট মনে আছে। খেলার শেষে মাঠ পেরিয়ে বাড়ি ফিরছি, সঙ্গে বিশুদা। সেদিন মোহনবাগান হেরে গেছে যেন কার সঙ্গে, সকলের মন-মেজাজ অত্যন্ত কুৎসিত। বিশুদা যেমন-কে-তেমন গম্ভীর। কতদূর এগোতেই সামনে দেখি কতকগুলো ছোকরা দুই দলে ভিন্ন হয়ে গিয়ে একে-অন্যকে নৃশংসভাবে গালাগাল করছে। আর এমন সে গালাগাল যে কালাকাল মানছে না। তার মানে, একাল নিয়ে তত নয়, যত পূর্বপুরুষদের কাল নিয়ে তাদের মতান্তর। প্রথম দলের দিকে এগিয়ে গেল বিশুদা। স্বাভাবিক শান্ত গলায় বললে, 'কি বাবা, গালাগাল দিচ্ছ কেন?' বলেই বলা-কওয়া-নেই কতকগুলি চোস্ত গালাগাল বিশুদা তাদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। তারা একদম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল—কে এই লোক! পরমুহূর্তেই অপর দলকে লক্ষ্য করে বিশুদা বললে, 'সব ভদ্রলোকের ছেলে তোমরা, গালাগাল করবে কেন?' বলেই ওদেরো দিকে কতকগুলো গালাগাল ঝাড়লে। প্রথম দল তেড়ে এল বিশুদার দিকে: 'আপনি কে মশাই আমাদের গালাগাল দেন?' দ্বিতীয় দলও মারমুখো। 'আপনি গালাগাল করবার কে? আপনাকে কি আমরা চিনি, না, দেখেছি?' দেখতে দেখতে দু' দল একত্র হয়ে বিশুদাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। বিশুদার গম্ভীর মুখে দুষ্টু একটু হাসি। করজোড় করে বললে, 'বাবারা, আর কেন? যে ভাবেই হোক, দু' দলকে মিলিয়ে দিয়েছি তো! যাও বাবারা, বাড়ি যাও। এমনি একত্র হয়ে থাক—মাঠের খেলায় দেশের খেলায় সব খেলায় জিততে পারবে। আমার শুধু মিলিয়ে-দেওয়া কথা। নইলে, আমি কেউ না।'

ছেলেরা দল শুদ্ধু হেসে উঠল। বিশুদার ধোপে কোথাও আর এতটুকু ঝগড়াঝাটি রইল না।

বিশ্বপতি আর শিবরাম "কল্লোলে" হয়তো কোনোদিন লেখেনি কিন্তু দু' জনেই "কল্লোলের" বন্ধু ছিল নিঃসংশয়। মনোভঙ্গির দিক থেকে শিবরাম তো বিশেষ সমগোত্র। কিন্তু এমন একজন লোক আছে যে আপাতদৃষ্টে "কল্লোলের" প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েও প্রকৃতপক্ষে "কল্লোলের" স্বজন-সুহৃদ। সে কাশীর সুরেশ চক্রবর্তী—"উত্তরা"র উত্তরসাধক।

আমরা তার নাম রেখেছিলাম 'চটপটি'। ছোটখাটো মানুষটি, মুখে অনর্গল কথা, যেন তপ্ত খোলায় চড়বড় করে খই ফুটছে—একদণ্ড এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে নারাজ, হাতে-পায়ে অসামান্য কাজকে সংক্ষিপ্ত করার অসম্ভব ক্ষিপ্রতা! এক কথায় অদম্য কর্মশক্তির অনম্য প্রতিমান। একদিন "কল্লোলের" কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের দোকানে এসে উপস্থিত—সেই সর্বত্রগামী পবিত্রর সঙ্গে। কি ব্যাপার? প্রবাসী বাঙালিদের তরফ থেকে দূর লক্ষ্ণৌ থেকে মাসিকপত্রিকা বের করা হয়েছে—চাই "কল্লোলের" সহযোগ। সম্পাদক কে? সম্পাদক লক্ষ্ণৌর সার্থকনামা ব্যারিস্টার—এ পি সেন—মানে, অতুলপ্রসাদ সেন আর প্রথিতযশা প্রফেসর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। তবে তো এ মশাই প্রৌঢ়পন্থী কাগজ, এর সঙ্গে আমাদের মিশ খাবে কি করে? আমরা যে আধুনিক, অমল হোমের প্রশস্তি-অনুসারে "অতি-আধুনিক"। আমরা যে উগ্রজ্বলন্ত নবীন।

কোনো দ্বিধা নেই। "উত্তরা" নিরুত্তর থাকবে না তোমাদের তারুণ্যের বাণীতে। যেমন আমি, সুরেশ চক্রবর্তী, ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের বন্ধুতার ডাকে নিমেষেই সাড়া দিয়ে উঠেছি। কে তোমাদের পথ আটকাবে, কে মুখ ফিরিয়ে নেবে অস্বীকারে? আর যা আন্দাজ করেছ তা নয়। অতুলপ্রসাদ অবিশ্যি ভালোমানুষ, বাংলা সাহিত্যের হালচাল সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল নন। মোটা আয়ের প্র্যাকটিস, তাই নিয়ে মেতে থাকেন। যখন এক-আধটু সময় পান, হালকা গান

বাঁধেন। (হালকা মানে গড়ন-পিটনটা হালকা, কিন্তু রস গভীরসঞ্চারী। সে-রস সোজা হৃদয়ের থেকে উঠেছে বলেই বোঝা যায় তাঁর হৃদয়ও কত গভীর আর কত গাঢ়।) তিনি শুধু নাম দিয়েই খালাস। প্রবাসী বাঙালির উন্নতি চান, আর তাঁর মতে উন্নতির প্রথম সোপানেই মাতৃভাষায় একখানি পত্রিকা দরকার। তাঁকে তোমরা বিশেষ ধোরো না। আর রাধাকমল? বয়সে তিনি প্রবীণ হলেও জেনে রাখো, তিনি সাহিত্য-প্রগতিতে বিশ্বাসী, নতুন লেখকদের সমর্থনে উদ্যতাস্ত্র। তাঁকে আপন লোক মনে কোরো। আর অত উচ্চদৃষ্টি কেন? সামনে এই বেঞ্চিতে যে সশরীরে বসে আছি আমি, তাকে দেখ। যে আসল কর্ণধার, যে মূলকারক।

সুরেশ চক্রবর্তী কি করে এল সাহিত্যে, কবে কখন কি লিখল, বা আদৌ কিছু লিখেছে কিনা, প্রশ্ন করার কথাই কারু মনে হল না। সাহিত্যে তার আবির্ভাবটা এত স্বভাবসিদ্ধ। সাহিত্য তার প্রাণ, আর সাহিত্যিকরা তার প্রাণের প্রাণ। সব সাহিত্য আর সাহিত্যিকের খবর-অখবর তার নখদর্পণে। সে যে বিশেষ করে অতি-আধুনিকদের নিমন্ত্রণ করেছে এতেই তো প্রমাণ হচ্ছে তার উদার ও অগ্রসর সাহিত্যবুদ্ধির। যদিও কাশীতে সে থাকে, আসল কাশীবাস তো সৎসঙ্গে। আমাদের যখন ডাকছে, বললাম সুরেশকে, তার কাশীবাস এতদিনে সফল হল।

'শেষকালে কাশীপ্রাপ্তি না ঘটে।' আমাদের মধ্যে থেকে কে টিপ্পনি কাটলে।

না, তেরোশ বত্রিশে যে "উত্তরা" বেরিয়েছিল তা এখনো টিকে আছে। "কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি" আর নেই, কিন্তু "উত্তরা" এখনো চলছে। এ শুধু একটা আশ্চর্য অনুষ্ঠান নয়, সুরেশ চক্রবর্তীই একটা আশ্চর্য প্রতিষ্ঠান। সাহিত্যের কত হাওয়া-বদল হল, কত উত্থান-পতন,

কিন্তু সুরেশের নড়চড় নেই, বিচ্ছেদ-বিরাম নেই। ঝড়ের রাতেও নির্ভীক দীপস্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে উপেক্ষিত নিঃসঙ্গতায়।

"উত্তরা"র দুজন নিজস্ব লেখক ছিল; যদিও তাঁরা মার্কা-মারা নন, মননে-চিন্তনে তাঁরা তর্কাতীত আধুনিক, আর আধুনিক মানেই প্রগতিপন্থী। প্রগতি মানে প্রচলিত মতানুগত না হওয়া। দুজনেই পণ্ডিত, শিক্ষাদাতা; কিন্তু শুনতে যেমন জবড়জং শোনাচ্ছে, তাঁদের মনে ও কলমে কিন্তু একটুকুও জং ধরেনি। রূপালি রোদে ঝিলিক-মারা ইস্পাতের মত তাতে যেমন বুদ্ধির ধার তেমনি ভাবের জেল্লা। এক হচ্ছেন লক্ষ্ণৌর ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আর হচ্ছেন কাশীর মহেন্দ্র রায়। একজন বাক্যকুশল, আরেকজন সুমিতাক্ষর। কিন্তু দুজনেই আসর-জমানো মজলিসী লোক—আধুনিকতার পৃষ্ঠপোষক। একে-একে সবাই তাই ভিড়ে গেলাম সে-আসরে। নজরুল, জগদীশ গুপ্ত, শৈলজা, প্রেমেন, প্রবোধ, বুদ্ধদেব, অজিত। ঝকঝকে কাগজে ঝরঝরে ছাপা—"উত্তরা" সাজসজ্জায়ও উত্তমা। সবাইরই মন টানল।

সব চেয়ে বড় ঘটনা, সাহিত্যের এই আধুনিকতা প্রথম প্রকাশ্য অভিনন্দন পায় এই প্রবাসী "উত্তরা"য়। সেই উদ্যোগ-উদ্ভবের গোড়াতেই। আর, স্বয়ং রাধাকমলের লেখনীতে। দুঃসাহসিক আন্তরিকতায় তাঁর সমস্ত প্রবন্ধটা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সত্য শোনাল। শুধু ভাবের নবীনতাই নয়, ভাষার সজীবতাকেও তিনি প্রশংসা করলেন। চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল। আমরা মেতে উঠলাম আর আমাদের বিরুদ্ধ দল তেতে উঠল। যার শক্তি আছে তার শত্রুও আছে। শত্রুতাটা হচ্ছে শক্তিপূজার নৈবেদ্য। আমাদের নিন্দা করার মানেই হচ্ছে আমাদের বন্দনা করা।

মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা মনে করতাম। এক কথায়, তিনিই ছিলেন আধুনিকোত্তম। মনে হয়, যজন-যাজনের

পাঠ আমরা তাঁর কাছে থেকেই প্রথম নিয়েছিলাম। আধুনিকতা যে অর্থে বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা বা সংস্কাররাহিত্য তা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর কবিতায়। তিনি জানতেন না আমরা তাঁর কবিতার কত বড় ভক্ত ছিলাম, তাঁর কত কবিতার লাইন আমাদের মুখস্ত ছিল :

"হে প্রাণ-সাগর! তোমাতে সকল প্রাণের নদী
পেয়েছে বিরাম, পথের প্লাবন-বিরোধ রোধি'!
হে মহামৌনি, গহন তোমার চেতনতলে
মহাবুভুক্ষাবারণ তৃপ্তি-মন্ত্র জ্বলে!
ধন্বন্তরি! মন্বন্তর-মন্থ-শেষ—
তব করে হেরি অমৃতভাণ্ড—অবিদ্বেষ!"

কিংবা

"পাপ কোথা নাই—গাহিয়াছে ঋষি, অমৃতের সন্তান—
গেয়েছিল আলো বায়ু নদীজল তরুলতা—মধুমান!
প্রেম দিয়ে হেথা শোধন-করা যে কামনার সোমরস,
সে রস বিরস হতে পারে কভু? হবে তার অপযশ?"

ফুটপাতের উপর গ্যাসপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে তিনি যখন আমাদেরকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কবিতা পড়িয়ে শোনাতেন তখন আবৃত্তির বিহ্বলতায় তাঁর দুই চোখ বুজে যেত। আমরা কে শুনছি বা না শুনছি, বুঝছি বা না বুঝছি, এটা রাস্তা না বাড়ি, সে-সব সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ছিল, তিনি যে তদ্গতচিত্তে আবৃত্তি করতে পারছেন সেইটেই তাঁর বড় কথা। কিন্তু যদি মুহূর্তমাত্র চোখ মেলে দেখতেন সামনে, দেখতে পেতেন আমাদের মুখে লেশমাত্র বিরক্তি নেই, বরং ভক্তির নম্রতায় সমস্ত মুখ-চোখ গদ্গদ হয়ে উঠেছে। স্থান ও সময়ের সীমাবোধ সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ উদাসীন হলেও তাঁর কবিতার চিত্তহারিতা সম্বন্ধে আমরা বিন্দুমাত্র সন্দিহান ছিলাম না।

তিনি নিজেও সেটা বুঝতেন নিশ্চয়। তাই একদিন পরম-প্রত্যাশিতের মত এলেন আমাদের আস্তানায়, শোপেনহাওয়ার-এর উদ্দেশে লেখা তাঁর বিখ্যাত কবিতা "পান্থ" সঙ্গে নিয়ে। সেই কবিতা "আধুনিকতায়" দেদীপ্যমান। "কল্লোলে" বেরিয়েছিল তেরোশ বত্রিশের ভাদ্র সংখ্যায়। আর এ কবিতা বের করতে পারে "কল্লোল" ছাড়া আর কোনো কাগজ তখন ছিল না বাংলাদেশে।

"সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি—মিথ্যা সনাতনী!
সত্যেরে চাহি না তবু, সুন্দরের করি আরাধনা—
কটাক্ষ-ঈক্ষণ তার—হৃদয়ের বিশল্যকরণী!
স্বপনের মণিহারে হেরি তার সীমন্ত-রচনা!
নিপুণা নটিনী নাচে, অঙ্গে-অঙ্গে অপূর্ব্ব লাবণি!
স্বর্ণপাত্রে সুধারস, না সে বিষ?—কে করে শোচনা!
পান করি সুনির্ভয়ে, মুচকিয়া হাসে যবে ললিত-লোচনা!

জানিতে চাহি না আমি কামনার শেষ কোথা আছে,
ব্যথায় বিবশ, তবু হোম করি জ্বালি কামানল!—
এ দেহ ইন্ধন তায়—সেই সুখ! নেত্রে মোর নাচে
উলঙ্গিনী ছিন্নমস্তা! পাত্রে ঢালি লোহিত গরল!
মৃত্যু ভৃত্যরূপে আসি ভয়ে-ভয়ে পরসাদ যাচে!
মুহূর্ত্তের মধু লুটি—ছিন্ন করি হৃদ্‌পদ্মদল!
যামিনীর ডাকিনীরা তাই হেরি একসাথে হাসে খল-খল!

চিনি বটে যৌবনের পুরোহিত প্রেম-দেবতারে,—
নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি';

অনন্তরহস্যময়ী স্বপ্নসখী চির-অচেনারে
মনে হয় চিনি যেন—এ বিশ্বের সেই ঠাকুরানী!
নেত্র তার মৃত্যু-নীল!—অধরের হাসির বিথারে
বিস্মরণী রশ্মিরাগ! কটিতলে জন্ম-রাজধানী।
উরসের অগ্নিগিরি সৃষ্টির উত্তাপ-উৎস!—জানি তাহা জানি।"

অবিস্মরণীয় কবিতা। বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব ঐশ্বর্য। তারপর তাঁর "প্রেতপুরী" বেরোয় অগ্রহায়ণের "কল্লোলে"।

"হেরি উরসের যুগ্ম যৌবনমঞ্জরী
যে-অনল সর্ব্ব-অঙ্গে শিরায় সঞ্চরি
মর্ম্মগ্রন্থি মোর
দাহ করি গড়ে পুনঃ সোহাগের স্নেহ-হেম ডোর—
সে-অনল পরশের আশে
মোর মত দেখি তারা ঘুরে ঘুরে আসে তব পাশে।

বিলোল কবরী আর নীবিবন্ধ মাঝে
পেলব বঙ্কিম ঠাঁই যেথা যত রাজে—
খুঁজিয়া লয়েছে তারা সর্ব্ব-অগ্রে ব্যগ্র জনে-জনে,
অতনুর তনু-তীর্থে—লাবণ্যের লীলা নিকেতনে।

যত কিছু আদর-সোহাগ—
শেষ করে গেছে তারা! মোর অনুরাগ,
চুম্বন আশ্লেষ—সে যে তাহাদেরি পুরাতন রীতি,
বহুকৃত প্রণয়ের হীন অনুকৃতি!...
আজি এ নিশায়—
মনে হয়, তারা সব রহিয়াছে ঘেরিয়া তোমায়!
তোমার প্রণয়ী, মোর সতীর্থ যে তারা!

যত কিছু পান করি রূপরসধারা—
তারা পান করিয়াছে আগে।
সর্ব্বশেষ ভাগে
তাদেরি প্রসাদ যেন ভুঞ্জিতেছি হায়!
নাহি হেন ফুল-ফল কামনার কল্প-লতিকায়,
যার 'পরে পড়ে নাই আর কারো দশনের দাগ,
—আর কেহ হরে নাই যাহার পরাগ।
ওগো কাম-বধূ!
বল, বল, অনুচ্ছিষ্ট আছে আর এতটুকু মধু?
রেখেছ কি আমার লাগিয়া সযতনে
মনোমঞ্জুষায় তব পীরিতির অরূপরতনে?

আমারো মিটেছে সাধ
চিত্তে মোর নামিয়াছে বহুজনতৃপ্তি-অবসাদ।
তাই যবে চাই তোমাপানে—
দেখি ওই অনাবৃত দেহের শ্মশানে
প্রতি ঠাঁই আছে কোনো কামনার সদ্য বলিদান!

চুম্বনের চিতাভস্ম, অনঙ্গের অঙ্গার-নিশান!
বাঁধিবারে যাই বাহুপাশে
অমনি নয়নে মোর কত মৌনী ছায়ামূর্ত্তি ভাসে।

দিকে দিকে প্রেতের প্রহরা!
ওগো নারী, অনিন্দিত কান্তি তব!—মরি মরি রূপের পসরা!
তবু মনে হয়
ও সুন্দর স্বর্গখানি প্রেতের আলয়!

কামনা-অঙ্কুশ-ঘাতে যেই পুনঃ হইনু বিকল
অমনি বাহুতে কারা পরায় শিকল !
তীব্র সুখ-শিহরণে ফুকারিয়া উঠি যবে মৃদু আর্ত্তনাদে—
নীরব নিশীথে কারা হাহাস্বরে উচ্চকণ্ঠে কাঁদে।"

মোহিতলালও এলেন "উত্তরা"য়—এলেন আমাদের পুরোবর্তী হয়ে। "কল্লোলের" সঙ্গে সঙ্গে "উত্তরা"ও সরগরম হয়ে উঠল। কিন্তু কত দিন যেতে-না-যেতে কেমন বেসুর ধরল বাজনায়। মতে বা মনে কোনো অমিল নেই, তবু কেন কে জানে, মোহিতলাল বেঁকে দাঁড়ালেন—কল্লোলের দল ছেড়ে চলে গেলেন শনিবারের দলে। শুনেছি, সুরেশকে লিখে পাঠালেন, কল্লোলের দলের যে সব লেখক তোমার কাগজে লেখে তাদের সংশ্রব যদি না ত্যাগ করো তবে আমি আর "উত্তরা"য় লিখব না ! সুরেশ মেনে নিতে চাইল না এ সর্ত। ফলে, মোহিতলাল বর্জন করলেন "উত্তরা"। সুরেশ আরো দুর্দম হয়ে উঠল। এত প্রাখর্য যেন সইল না অতুলপ্রসাদের। তিনি সরে দাঁড়ালেন। তবু সুরেশ অবিচ্যুত। রাধাকমল আছেন, যিনি "সাহিত্যে অশ্লীলতা" নামক প্রবন্ধে রায় দিয়েছেন আধুনিকতার স্বপক্ষে। কিন্তু অবশেষে রাধাকমলও বিযুক্ত হলেন। সুরেশ একা পড়ল। তবু সে দমল না, পিছু হটল না। প্রতিজ্ঞার পতাকা খাড়া করে রাখল।

তবু, কেন জানি না, "কল্লোলের" সঙ্গে শুধু "কালি কলমের" নামটাই লোকে জুড়ে দেয়—"উত্তরা"র কথা দিব্যি ভুলে থাকে। এ বোধ হয় শুধু অনুপ্রাসের খাতিরে। নইলে, একই লেখকদল এই তিন কাগজে সমানে লিখেছে—সমান স্বাধীনতায়। "কালি-কলমের" মত "উত্তরা"ও এই আধুনিক ভাবের তন্ত্রধারক ছিল। বরং "কালি-কলমের" আগে আবির্ভাব হয়েছিল "উত্তরা"র। "কালি-কলমের" জন্মের পিছনে হয়তো খানিকটা বিক্ষোভ ছিল, কিন্তু "উত্তরায়" শুধু সৃজন-সুখের মহোল্লাস। "কল্লোল"-

"কালি-কলমের" বহু অসম্পূর্ণ কাজ "উত্তরা" করে দিয়েছে।।' যেমন আরো বহু পরে করেছে "পূর্ব্বাশা"।

নিজে লেখেনি, অকণ্টক সুযোগ থাকলেও কোনোদিন প্রতিষ্ঠা করতে চায়নি নিজের সাহিত্যিক অহমিকা, অবিচল নিষ্ঠায় সাহিত্যের ব্রতোদ্‌যাপন করেছে, প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে শুধু সাহিত্যিকের সুকীর্তি। এ চিরসংগ্রাম-শীল দুর্জয় ব্যক্তিত্বকে কি বলে অভিহিত করব? সুরেশকে নিশ্চয় সাহিত্যিক বলব না, বলব সাহিত্যের শক্তিদীপ্ত ভাস্কর। রূপদক্ষ কারুকার।

মোহিতলালের মত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও আমাদের আরাধনীয় ছিলেন—ভাবের আধুনিকতার দিক থেকে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ বাংলাসাহিত্যে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। আমাদের তদানীন্তন মনো-ভাবের সঙ্গে চমৎকার মিলে গিয়েছিল। দুঃখের মধ্যে কাব্যের যে বিলাস আছে সেই বিলাসে আমরা মশগুল ছিলাম। তাই নৈরাশ্যের দিনে ক্ষণে-ক্ষণে আবৃত্তি করতাম 'মরীচিকা'। এমনি টুকরো-টুকরো লাইন :

"চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে?"

"তুমি শালগ্রাম শিলা
শোয়া-বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা!"

"মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি!"

"মিছে দিন যায় বয়ে
উপরে ও নীচে ঘুমের তুলসী—শুই শালগ্রাম হয়ে।"

"চারিদিক দেখে চারিদিক ঠেকে বুঝিয়াছি আমি ভাই,
নাকে শাঁক বেঁধে ঘুম দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই।
ঝিম ঝিম নিশ্চিন্ত—
নাকের ডগায় মশাটা মশাই আস্তে উড়িয়ে দিন ত।"

যতীন্দ্রনাথও নিমন্ত্রণ নিয়েছিলেন "কল্লোলের"। যতদূর মনে পড়ে তাঁর প্রথম কবিতা বেরোয় "কল্লোলের" দ্বিতীয় বছরে মাঘমাসে। কবিতার নাম 'অন্ধকার':

"নিদ্রিতা জননীবক্ষে সুপ্তোত্থিত শিশু
খেলা করে ল'য়ে কণ্ঠহার।
কোন মহাশিশু ক্রীড়াসুখে
তব বুকে
ঘুরাইছে জ্যোতির্ম্মালা বিশ্ব-শৃঙ্খলার?
অন্ধকার, মহা অন্ধকার!"

এর পরে আরো কয়েকটি কবিতা তিনি লিখেছিলেন—তার মধ্যে তাঁর 'রেল-ঘুম'টা উল্লেখযোগ্য। চলন্ত ট্রেনের অনুসরণ করে কবিতার ছন্দ বাঁধা হয়েছিল। সত্যেন দত্তের পালকি বা চরকার কবিতার মত। আমাদের কাছে কেমন কৃত্রিম মনে হয়েছিল, কেমন আন্তরিকতাবর্জিত। মনে আছে, প্রমথ চৌধুরীকে পড়িয়ে শোনানো হয়েছিল কবিতাটা। তিনি বলেছিলেন, 'মরীচিকা'র কবির কোনো কবিতাই অপাঙক্তেয় হতে পারে না! এর মোটে বছর খানেক আগে 'মরীচিকা' বেরিয়েছে। একখানা ছোট কবিতার বইয়ে এরি মধ্যে যতীন্দ্রনাথ বিদগ্ধজনমনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

যতীন্দ্রনাথের মিতা যতীন্দ্রমোহন বাগচিও কি তাই না এসে পারেন "কল্লোলে"? আর তিনি এলেন, ভাবতে অদ্ভুত লাগছে, একেবারে মদিরযৌবনের বেশে, কবিতার নামও "যৌবন-চাঞ্চল্য"।

"সহজ স্বচ্ছন্দ মনোরথ—
ছুটিয়া যুবতী চলে পথ।

টসটসে রস-ভরপুর

আপেলের মত মুখ
আপেলের মত বুক
পরিপূর্ণ প্রবল প্রচুর
যৌবনের রসে ভরপুর।
মেঘ ডাকে কড় কড়
বুঝিবা আসিবে ঝড়,
তিলেক নাহিক ডর তাতে।
উঘারি বুকের বাস
পূরায় মনের আশ
উরস পরশ করি হাতে,
অজানা ব্যথায় সুমধুর
সেথা বুঝি করে গুরগুর।
যুবতী একেলা পথ চলে
পাশের পলাশ বনে
কেন চায় ক্ষণে-ক্ষণে
আবেশে চরণ যেন টলে
পায়ে-পায়ে বাধিয়া উপলে।
আপনার মনে যায়
আপনার মনে গায়
তবু কেন আন-পানে টান!
করিতে রসের সৃষ্টি
চাই কি দশের দৃষ্টি?
স্বরূপ জানেন ভগবান!"

"কল্লোলের" যৌবন-চাঞ্চল্য তা হলে খালি "কল্লোলের"ই একচেটে নয়!

না, কি "কল্লোলের" সুর আরো উচ্চরোলে বাধা ? তার চাঞ্চল্য আরো বেগবান ? তার যাত্রা আরো দূরান্বেষী ?

"বৃন্তবন্ধহারা
যাব উদ্দামের পথে, যাব আনন্দিত সর্ব্বনাশে,
রিক্তবৃষ্টি মেঘসাথে, সৃষ্টিছাড়া ঝড়ের বাতাসে,
যাব, যেথা শঙ্করের টলমল চরণ-পাতনে
জাহ্নবী তরঙ্গমন্দ্রমুখরিত তাণ্ডব-মাতনে
গেছে উড়ে জটাভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নভিন্ন দল,
কক্ষচ্যুত ধূমকেতু লক্ষ্যহারা প্রলয়-উজ্জল
আত্মঘাতমদমত্ত আপনারে দীর্ণ কীর্ণ করে
নির্ম্মম উল্লাসবেগে, খণ্ড খণ্ড উল্কাপিণ্ড ঝরে,
কণ্টকিয়া তোলে ছায়াপথ—"

তাই কি চলেছি আমরা ?

বারো

রবীন্দ্রনাথকে প্রথম কবে দেখি?

প্রথম দেখি আঠারোই ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৩০ সাল। সেবার বি-এর বছর, ঢুকিনি তখনো "কল্লোলে"। রবীন্দ্রনাথ সেনেট হলে কমলা-লেকচার্স দিচ্ছেন। ভবানীপুরের ছেলে, কলকাতার কলেজে গতিবিধি নেই, কোণঠাসা হয়ে থাকবার কথা। কিন্তু গুরুবলে ভিড় ঠেলে একেবারে মঞ্চের উপর এসে বসেছি।

সেদিনকার সেই দৈবত আবির্ভাব যেন চোখের সামনে আজও স্পষ্ট ধরা আছে। সুষুপ্তিগত অন্ধকারে সহসোত্থিত দিবাকরের মত! ধ্যানে সে-মূর্তি ধারণ করলে দেহ-মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। 'বাঙ্মনশ্চক্ষুশ্রোত্র-ঘ্রাণপ্রাণ' নতুন করে প্রাণ পায়। সে কি রূপ, কি বিভা, কি ঐশ্বর্য! মানুষ এত সুন্দর হতে পারে, বিশেষত বাংলা দেশের মানুষ. কল্পনাও করতে পারতুম না। রূপকথার রাজপুত্রের চেয়েও সুন্দর। সুন্দর হয়ত দুর্লভদর্শন দেবতার চেয়েও।

বাংলা দেশে এক ধরনের কবিয়ানাকে 'রবিয়ানা' বলত। সে আখ্যাটা কাব্য ছেড়ে কাব্যকারের চেহারায়ও আরোপিত হত। যাদের লম্বা চুল, হিলহিলে চেহারা, উড়ু-উড়ু ভাব, তাদের সম্পর্কেই বলা হত এই কথাটা। রবীন্দ্রনাথকে দেখে মনে হল ওরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেনি কোনোদিন। রবীন্দ্রনাথের চেহারায় কোথাও এতটুকু দুর্বলতা বা রুগ্নতার ইঙ্গিত নেই। তাঁর চেহারায় লালিত্যের চেয়ে বলশালিতাই বেশি দীপ্যমান। হাতের কবজি কি চওড়া, কি সাহসবিস্তৃত বিশাল বক্ষপট! 'শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা আমি কভু সহিব না' এ শুধু রবীন্দ্রনাথের মুখেই ভালো মানায়। যিনি সাঁতরে নদী পার হয়েছেন, দিনের বেলায় ঘুমোননি কোনোদিন, ফ্যান চালাননি গ্রীষ্মকালের দুপুরে।

পরনে গরদের ধুতি, গায়ে গরদের পাঞ্জাবি, কাঁধে গরদের চাদর, শুভ্র কেশ আর শ্বেত শ্মশ্রু—ব্যক্তমূর্তি রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম। এত দিন তাঁর রচনায় তিনি অব্যক্তমূর্তিতে ব্যাপ্ত হয়ে ছিলেন, আজ চোখের সামনে তাঁর বাস্তবমূর্তি অভিদ্যোতিত হল। কথা আছে, যার লেখার তুমি ভক্ত কদাচ তাকে তুমি দেখতে চেও না। দেখেছ কি তোমার ভক্তি চটে গিয়েছে। দেখে যদি না চটো, চটবে কথা শুনে। নির্জন ঘরে নিঃশব্দ মূর্তিতে আছেন, তাই থাকুন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় উলটো। সংসারে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র ব্যতিক্রম, যাঁর বেলায় তোমার কল্পনাই পরাস্ত হবে, চূড়ান্ততম চূড়ায় উঠেও তাঁর নাগাল পাবে না। আর কথা—কণ্ঠস্বর? এমন কণ্ঠস্বর আর কোথায় শুনবে?

যত দূর মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ মুখে-মুখে বক্তৃতা দিয়েছিলেন—পর-পর তিন দিন ধরে। পরে সে বক্তৃতা লিপিবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ভাবছিলুম, যে ভালো লেখে সে ভালো বলতে পারে না—যেমন শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় কিছুই অনিয়ম নয়। অলোকসম্ভব তাঁর সাধনা, অপারমিতা তাঁর প্রতিভা। প্রথম দিন তিনি কি বলেছিলেন তা আবছা-আবছা এখনো মনে আছে। তিনি বলেছিলেন, মানুষের তিনটি স্পৃহা আছে—এক, টিকে থাকা, I exist; দুই, জানা, I know. তিন, প্রকাশ করা, I express। অদম্য এই আকাঙ্ক্ষা মানুষের। নিজের স্বার্থের জন্যে শুধু টিকে থেকেই তার শেষ নেই; তার মধ্যে আছে ভূমা, বহুলতা। যো বৈ ভূমা তদমৃতং, অথ যদল্পং তৎ মর্ত্যং। যেখানে অন্ত সেখানেই কৃপণতা, যেখানে ঐশ্বর্য সেখানেই সৃষ্টি। ভগবান তো শক্তিতে এই ধরিত্রীকে চালনা করছেন না, একে সৃষ্টি করেছেন আনন্দে। এই আনন্দ একটি অসীম আকুতি হয়ে আমাদের অন্তর স্পর্শ করছে। বলছে, আমাকে প্রকাশ করো, আমাকে রূপ দাও। আকাশ ও পৃথিবীর আরো এক নাম "রোদসী"। তারা কাঁদছে, প্রকাশের আকুলতায় কাঁদছে।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের বক্তৃতার সারাংশ আমার ডায়রিতে লেখা আছে এমনি: "বিধাতা দূত পাঠালেন প্রভাতের সূর্য্যালোকে। বললে দূত, নিমন্ত্রণ আছে। দ্বিপ্রহরে দূত এসে বললে রুদ্র তপস্বীর কণ্ঠে, নিমন্ত্রণ আছে। সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তচ্ছটায় গেরুয়াবাস উদাস দূত বললে, তোমার যে নিমন্ত্রণ আছে। তারপর দেখি নীরব নিশীথিনীতে তারায়-তারায় সেই লিপির অক্ষর ফুটে উঠেছে। চিঠি তো পেলাম, কিন্তু সে-চিঠির জবাব দিতে হবে না? কিন্তু কি দিয়ে দেব? রস দিয়ে বেদনা দিয়ে—যা সব মিলে হল সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত। বলব, তোমার নিমন্ত্রণ তো নিলাম, এবার আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করো।"

নিভৃত ঘরের জানলা থেকে দেখা অচেনা আকাশের নিঃসঙ্গ একটি তারার মতই দূর রবীন্দ্রনাথ। তখন ঐ মঞ্চের উপর বসে তাঁর বক্তৃতা শুনতে-শুনতে একবারও কি ঘূণাক্ষরে ভেবেছি, কোনোদিন ক্ষণকালের জন্যে হলেও তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার যোগ্যতা হবে? আর, কে না জানে, তাঁর সঙ্গে ক্ষণকালের পরিচয়ই একটা অনন্তকালের ঘটনা।

ভাবছিলুম, কত বিচিত্রগুণান্বিত রবীন্দ্রনাথ। যেখানে হাত রেখেছেন সেখানেই সোনা ফলিয়েছেন। সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিই, হেন দিক নেই যেদিকে তিনি যাননি আর স্থাপন করেননি তাঁর প্রভুত্ব। যে কোনো একটা বিভাগে তাঁর সাফল্য তাঁকে অমরত্ব এনে দিতে পারত। পৃথিবীতে এমন কেউ লেখক জন্মায়নি যার প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের মত সর্বদিঙ্মুখী। তা ছাড়া, যেখানে মেঘলেশ নেই সেখানে বৃষ্টি এনেছেন তিনি, যেখানে কুসুমলেশ নেই সেখানে পর্যাপ্তফল। "অপমেঘোদয়ং বর্ষং, অদৃষ্টকুসুমং ফলং।" অচ্ছিন্নপ্রবাহা গঙ্গার মত তাঁর কবিতা—তার কথা ছেড়ে দিই, কেননা কবি হিসেবেই তো তিনি সর্বাগ্রগণ্য। ধরুন, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন। ধরুন, প্রবন্ধ। কত বিচিত্র ও বিস্তীর্ণক্ষেত্রে তার প্রসার—ব্যাকরণ থেকে রাজনীতি। অনেকে তো

শুধু ভ্রমণকাহিনী লিখেই নাম করেন। রবীন্দ্রনাথ এ অঞ্চলেও একচ্ছত্র। তারপর, চিঠি। পত্রসাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ অপ্রতিরথ। কত শত বিষয়ে কত সহস্র চিঠি, কিন্তু প্রত্যেকটি সজ্ঞানস্বজন সাহিত্য। আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা বলতে চান ? তাতেও রবীন্দ্রনাথ পিছিয়ে নেই। তাঁর "জীবন স্মৃতি" আর "ছেলেবেলা" অতুলনীয় রচনা। কোথায় তিনি নেই ? যেখানেই স্পর্শ করেছেন, পুষ্পপূর্ণ করেছেন। আলটপকা অটোগ্রাফ লিখে দিয়েছেন ছুটকো-ছাটকা—তাই চিরকালের কবিতা হয়ে রয়েছে। তবু তো এখনো গানের কথা বলিনি। প্রায় তিন হাজার গান লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, আর প্রত্যেক গানে নিজস্ব সুরসংযোগ করেছেন। এটা যে কত বড় ব্যাপার, স্তব্ধ হয়ে উপলব্ধি করা যায় না। মানুষের সুখ-দুঃখের এমন কোনো অনুভূতি নেই যা এই গানে সুর-সুমধুর হয়নি। প্রকৃতির এমন কোনো হাবভাব নেই যা রাগরঞ্জিত হয়নি। শুধু তাই ? এই গানের মধ্য দিয়েই তিনি ধরতে চেয়েছেন সেই অতীন্দ্রিয়কে, যে শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, মনসো মনঃ, চক্ষুষশ্চ চক্ষুঃ। যে সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাস অথচ সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত। এই গানের মধ্য দিয়েই উদ্‌ঘাটিত করেছেন ভারতবর্ষের তপোমূর্তি। এই গানের মধ্য দিয়ে জাগাতে চেয়েছেন পরপদানত দেশকে।

ঢেউ গুনে-গুনে কি সমুদ্র পার হতে পারব ? তবু ঢেউ গোনা না হোক, সমুদ্রস্পর্শ তো হবে।

সাহিত্যে শিশুসাহিত্য বলে একটা শাখা আছে। সেখানেও রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়রহিত। তারপর, ভাবুন, বিদেশীর পক্ষে ইংরেজের ইংরিজি লেখা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অতিমর্ত্য। ইংরিজিতে তিনি শুধু তাঁর বাংলা রচনাই অনুবাদ করেন নি, মৌলিক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং দেশে-দেশে বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন বহুবার। সে ইংরিজি একটা প্রদীপ্ত বিস্ময়। তাঁর নিজের হাতে বাজানো বাজনার সুর।

যে লেখক, সে লেখার বাইরে শুধু বক্তৃতাই দিচ্ছে না, গান গাইছে। আর যার সাহিত্য হল, সঙ্গীত হল, তার চিত্র হবে না? রবীন্দ্রনাথ পট ও তুলি তুলে নিলেন। নতুন রূপে প্রকাশ করতে হবে সেই অব্যক্তরূপকে। সর্বাঙ্গসুন্দর রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখাটিও সুন্দর। কবিতা লিখতে কাটাকুটি করেছেন, তার মধ্য থেকে ব্যঞ্জনাপূর্ণ ছবি ফুটে উঠেছে—তাঁর কাটাকুটিও সুন্দর। আর এমন কণ্ঠের যিনি অধিকারী তিনি কি শুধু গানই করবেন, আবৃত্তি করবেন না, অভিনয় করবেন না? অভিনয়ে-আবৃত্তিতে রবীন্দ্রনাথ অসামান্য।

বক্তৃতা শুনতে শুনতে এই সব ভাবতুম বসে বসে। ভাবতুম, রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের শেষ, তাঁর পরে আর পথ নেই, সংকেত নেই। তিনিই সব-কিছুর চরম পরিপূর্ণতা। কিন্তু "কল্লোলে" এসে আস্তে আস্তে সে-ভাব কেটে যেতে লাগল। বিদ্রোহের বহ্নিতে সবাই দেখতে পেলুম যেন নতুন পথ, নতুন পৃথিবী। আরো মানুষ আছে, আরো ভাষা আছে, আছে আরো ইতিহাস। সৃষ্টিতে সমাপ্তির রেখা টানেননি রবীন্দ্রনাথ—তখনকার সাহিত্য শুধু তাঁরই বহুকৃত লেখনের হীন অনুকৃতি হলে চলবে না। পত্তন করতে হবে জীবনের আরেক পরিচ্ছেদ। সেদিনকার "কল্লোলের" সেই বিদ্রোহ-বাণী উদ্ধতকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলুম কবিতায়:

> এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহঙ্কার,
> যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী,
> কারেও ডরি না কভু; সুকঠোর হউক সংসার,
> বন্ধুর বিচ্ছেদ তুচ্ছ, তুচ্ছতর বন্ধুর সরণি।
> পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
> সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর,
> আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
> যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর!

গভীর আত্মোপলব্ধি—এ আমার দুর্দ্দান্ত সাহস,
উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতেছি নব-নর-জন্ম-সম্ভাবনা ;
অক্ষরতুলিকা মোর হস্তে যেন রহে অনলস,
ভবিষ্যৎ বৎসরের শঙ্খ আমি—নবীন প্রেরণা !
শক্তির বিলাস নহে, তপস্যায় শক্তি-আবিষ্কার,
শুনিয়াছি সীমাশূন্য মহা-কাল-সমুদ্রের ধ্বনি
আপন বক্ষের তলে ; আপনারে তাই নমস্কার !
চক্ষে থাক আয়ু-উর্মি, হস্তে থাক অক্ষয় লেখনী ॥

সেই কমলা-লেকচার্সের সভায় আরেকজন বাঙালি দেখেছিলাম। তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ; চলতি কথায়, বাংলার বাঘ, শূর-শার্দূল। ধী, ধৃতি আর দার্ঢ্যের প্রতিমূর্তি। রবীন্দ্রনাথ যদি সৌন্দর্য, আশুতোষ শক্তি। প্রতিভা আর প্রতিজ্ঞা। এই দুই প্রতিনিধি—অন্তত চেহারার দিক থেকে—আর পাওয়া যাবে না ভবিষ্যতে। কাব্য ও কর্মের প্রকাশাত্মা।

সাউথ সুবার্বন ইস্কুলে যখন পড়ি, তখন সরস্বতী পূজার চাঁদার খাতা নিয়ে কয়েকজন ছাত্র মিলে একদিন গিয়েছিলাম আশুতোষের বাড়ি। দোতলায় উঠে দেখি সামনের ঘরেই আশুতোষ জলচৌকির উপর বসে স্নানের আগে গায়ে তেল মাখাচ্ছেন। ভয়ে-ভয়ে গুটি-গুটি এগিয়ে এসে চাঁদার খাতা তাঁর সামনে বাড়িয়ে ধরলাম। আমাদের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়ে তিনি হুঙ্কার করে উঠলেন : 'পেন্নাম করলিনে ?' আমরা খাতা-টাতা ফেলে ঝুপ-ঝুপ করে প্রণাম করতে লাগলাম তাঁকে।

তেরোশ বত্রিশ সাল—"কল্লোলের" তৃতীয় বছর—বাংলা দেশ আর "কল্লোল" দুয়ের পক্ষেই দুর্বৎসর। দোসরা আষাঢ় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মারা যান দার্জিলিঙে। আর আটুই আশ্বিন মারা যায় আমাদের গোকুল,

সেই দার্জিলিঙেই। শুধু গোকুলই নয়, পর-পর মারা গেল বিজয় সেনগুপ্ত আর সুকুমার ভাদুড়ি।

মঙ্গলবার, বিকেল ছটার সময়, খবর আসে কলকতায়—চিত্তরঞ্জন নেই। আমরা তখন কল্লোল-আপিসে তুমুল আড্ডা দিচ্ছি, খবর শুনে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। দেখি সমস্ত কলকাতা যেন বেরিয়ে পড়েছে সর্বস্বহারার মত। কেউ কারু দিকে তাকাচ্ছে না, কারু মুখে কোনো কথা নেই, শুধু লক্ষ্যহীন বেদনায় এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরদিন শোনা গেল, বৃহস্পতিবার ভোরে স্পেশ্যাল ট্রেনে চিত্তরঞ্জনের মৃতদেহ নিয়ে আসা হবে কলকাতায়। অত ভোরে ভবানীপুর থেকে যাই কি করে ইষ্টিশানে? ট্র্যাম-বাস তো সব বন্ধ থাকবে। সমবায় ম্যানসনসের ইঞ্জিনিয়র সুকুমার চক্রবর্তীর ঘরে রাত কাটালাম। আমি, সুকুমারবাবু আর দীনেশদা। সুকুমারবাবু দীনেশদার বন্ধু, অতএব "কল্লোলের" বন্ধু, সেই সুবাদে আমাদের সকলের আত্মজন। দরদী আর পরোপকারী। জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত হচ্ছেন পদে-পদে, অথচ মুখের নির্মল হাসিটি অস্ত যেতে দিচ্ছেন না। বিদেশিনী মেয়ে ফ্রেডাকে বিয়ে করেন কিন্তু অকালেই সে-মিলনে ছেদ পড়ল। এসে পড়লেন একেবারে দৈন্য ও শূন্যতার মুখোমুখি। ক্ষমাহীন সংগ্রামের মাঝখানে। তাই তো বেনামী বন্দরে, ভাঙা জাহাজের ভিড়ে, "কল্লোলে" তিনি বাসা নিলেন। এমনি অনেকে সাহিত্যিক না হয়েও শুধু আদর্শবাদের খাতিরে এসেছে সেই যৌবনের মুক্তিতীর্থে। সেই বাসা ভেঙে গিয়েছে, আর তিনিও বিদায় নিয়েছেন এক ফাঁকে।

রাত থাকতেই উঠে পড়লাম তিন জনে। হাঁটা ধরলাম শেয়ালদার দিকে। সে কি বিশাল জনতা, কি বিরাট শোভাযাত্রা—তা বর্ণনা সুরু করলে শেষ করা যাবেনা। "কৃষানের বেশে কে ও কৃশতনু কৃশাণু পুণ্যছবি"—স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী একজন শববাহী। আট ঘণ্টার উপর

সে-শোভাযাত্রায় অনুগমন করেছিলাম আমরা—নৃপেন সহ আরো অনেক বন্ধু, নাম মনে পড়ছে না—দিনের ও শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। কলকাতা শহরে আরো অনেক শোভাযাত্রা হয়েছে—কিন্তু এমন আর একটাও নয়। অন্তত আর কোনো শোভাযাত্রায় এত জল আর পাখা বৃষ্টি হয়নি!

শ্রাবণ সংখ্যায় "কল্লোলে" চিত্তরঞ্জনের উপর অনেক লেখা বেরোয়, তার মধ্যে অতুল গুপ্তের "দেশবন্ধু" প্রবন্ধটা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি:

"জুলাই মাসের মডার্ন্ রিভিউতে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার মোটা কথা এই যে, চিত্তরঞ্জনের প্রভাবের কারণ তাঁর দেশবাসীরা হচ্ছে কর্তা-ভজার জাত। তাদের গুরু একজন চাইই যার হাতে নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা তুলে দিয়ে তারা নিশ্চিন্ত হতে পারে। অধ্যাপক মহাশয়ের মতে দেশের লোকের উপর চিত্তরঞ্জন দাসের প্রভাবের স্বরূপ আমাদের জাতীয় দুর্বলতার প্রমাণ। কারণ সে প্রভাবের একমাত্র কারণ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, ইউরোপের মত কাটা-ছাঁটা অপৌরুষেয় তত্ত্বপ্রচারের ফল নয়।...

লোকচিত্তের উপর চিত্তরঞ্জনের যে প্রভাব তা কোনও নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয় নয়। তা সূর্য্যের মত স্বপ্রকাশ। চোখ না বুজে থাকলেই দেখা যায়। পরাধীন ভারতবর্ষে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগছে। আমাদের এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা চিত্তরঞ্জনে মূর্ত্ত হয়ে প্রকাশ হয়েছিল। সেই মুক্তির জন্যে যে নির্ভীকতা, যে ত্যাগ, যে সর্ব্বস্বপণ আমরা অন্তরে-অন্তরে প্রয়োজন বলে জানছি, কিন্তু ভয়ে ও স্বার্থে জীবনে প্রকাশ করতে পারছি না, সেই নির্ভীকতা, সেই ত্যাগ ও সেই পণ সমস্ত বাধামুক্ত হয়ে চিত্তরঞ্জনে ফুটে উঠেছিল। চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ও জনসাধারণের উপর তাঁর প্রভাব দু-এরই এই মূল। আইন-সভায় যারা

চিত্তরঞ্জন উপস্থিত না থাকলে একরকম ভোট দিত, তাঁর উপস্থিতিতে অন্য রকম দিত, তারা দেশের মুক্তিকামী এই ত্যাগ ও নির্ভীকতার মূর্ত্তির কাছেই মাথা নোয়াত। চিত্তরঞ্জনের সম্মুখে দেড়শ বছরের ব্রিটিশ শাস্তির ফল প্রভু-ভয় ও স্বার্থভীতি ক্ষণেকের জন্য হলেও মাথা তুলতে পারত না। এই যদি কর্ত্তাভজা হয়, তবে ভগবান যেন এ দেশের সকলকেই কর্ত্তাভজা করেন, অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের অপৌরুষের তত্ত্বের ভাবুক না করেন।...

ডেমোক্রেটিক শাসন অর্থাৎ 'গুরু'দের শাসন। তার ফল ভাল হবে কি মন্দ হবে তা নির্ভর করে কোন 'ডেমস' কাকে গুরু মানে তার উপর। ভারতবর্ষের 'ডেমস' যে গুরুর খোঁজে শবরমতীর আশ্রমে কি দেশবন্ধুর বিশ্রাম-আবাসেই যায়, দৈনিক কাগজের সম্পাদকের অফিসে নয়, এটা আশার কথা, মোটেই ভয়ের কথা নয়। অধ্যাপক সরকার যাকে ডেমক্রেটিক বলে চালাতে চাচ্ছেন সে হচ্ছে সেই aristocratic শাসন, যা ইউরোপের শাসকসম্প্রদায় এতকাল ডেমক্রেটিক বলে চালিয়ে আসছে।

পণ্ডিতে না চিনুক দেশের জনসাধারণ চিত্তরঞ্জনকে যথার্থ চিনেছিল। তারা তাই তার নাম দিয়েছিল 'দেশবন্ধু'। ঐ নাম দিয়ে তারা জানিয়েছে তাদের মনের উপরে চিত্তরঞ্জনের প্রভাবের উৎস কোথায়। পণ্ডিতের চোখে এটা না পড়তে পারে, কারণ এক শ্রেণীর পাণ্ডিত্য পৃথিবীর কোনও যুগে কোনও দেশেই সমসাময়িক কোনও মহত্বকে চিনতে পারে নাই, কেন না তার কথা পুঁথিতে লেখা থাকেনা।"

তেরোশ একত্রিশ সালের শেষ দিকেই গোকুলের জর সুরু হয়। ছবি এঁকে আয়ের সুবিধে বিশেষ করতে পারেনি—অথচ আয় না করলেও নয়। প্রত্নতত্ত্বের রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে চাকরি নিয়ে একবার পুনাতে চলে যায়। বছর খানেক চাকরি করবার পর

বম্বেতে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে—দিন-রাত একটুও ঘুমুতে পারত না। বম্বের সলিসিটর শুকথঙ্কর ও তাঁর স্ত্রী গোকুলকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে এসে সেবা-যত্ন করে সুস্থ করে তোলেন, কিন্তু চাকরি করার মত সক্ষম আর হল না। কলকাতায় ফিরে আসে গোকুল। শুকথঙ্কর ও তাঁর স্ত্রী মালিনীর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার তার শেষ ছিল না। মালিনী গোকুলকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন ও গোকুলের জন্মদিনে বম্বে থেকে কোনো না-কোনো উপহার পাঠাতেন। তাঁরই দেওয়া কালো ডায়েলের ওমেগা রিস্টওয়াচ গোকুলের হাতে শেষ পর্যন্ত বাঁধা ছিল।

গোকুল তার মামার বাড়িতে ছিল, অনেক বিধি-বাধার মাঝখানে। শরীর-মন দুর্বল, তার উপরে অর্থাগম নেই। না এঁকে না লিখে কিছুতেই স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন হবার নয়। এমন অবস্থায় গোকুলের দিদিমণি (বড় বোন) বিধবা হয়ে চারটি ছোট-ছোট নাবালক ছেলে নিয়ে গোকুলের আশ্রয়ে এসে পড়েন। কালিদাস নাগ গোকুলের দাদা, তখন ইউরোপে। অনেক বাধা-বিপদ ঠেলে অনেক ঝড়-জল মাথায় করে বিদেশে গিয়েছেন উপযুক্ত হয়ে আসতে। কালিদাসবাবুর অনুপস্থিতিতে গোকুল বিষম বিব্রত হয়ে পড়ে, কিন্তু অভাবের বিরুদ্ধে লড়তে মোটেই তার অসম্মতি নেই। ভবানীপুরে কুণ্ডু রোডে ছোট একটি বাড়ি ভাড়া করে দিদি ও ভাগ্নেদের নিয়ে চলে আসে। এই ভাগ্নেদের মধ্যেই জগৎ মিত্র কথাশিল্পীর ছাড়পত্র নিয়ে পরে এসে ভিড়েছিল "কল্লোলে"। শিবপুরের একটা বাড়িতে দিদিমণির অংশ ছিল। দিদিমণির স্বামীর মৃত্যুর পর, যা সচরাচর হয়, দিদিমণির শরিকরা তা দখল করে বসে। অনেক ঝগড়া-বিবাদের পর শরিকদের কবল থেকে দিদিমণির সে-অংশ উদ্ধার করে গোকুল। সে-বাড়িতে দখল নিতে গোকুলকে কত ভাবে যে অপমানিত হতে হয়েছে তার আর সীমা সংখ্যা নেই। সেই অংশটা ভাড়া দিয়ে দিদিমণির কিছু আয়ের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু পুরোপুরি

সংসার চলে না। মামার বাড়িতে থাকতে পাবলিক স্টেজে থিয়েটার দেখার সাহস করতে পারত না গোকুল। সেই গোকুল ভয়ে-ভয়ে অহীন্দ্র চৌধুরীদের Photoplay Syndicateএ এসে যোগ দেয়। তখনকার দিনে ফিল্মে যোগ দেওয়া মানেই একেবারে বকে যাওয়া। কিন্তু একেবারে না খেতে পাওয়ার চেয়ে সেটা মন্দ কি? স্টুডিয়োতে আর্টিস্টের কাজ, মইয়ের উপরে উঠে সিন আঁকা, স্টেজ সাজানো—নানারকম শারীরিক ক্লেশের কাজ করতে হত তাকে। শরীর ভেঙে পড়ত, কিন্তু ঘুম হত রাত্রে। বলত, আর কিছু উপকার না হোক, ঘুমিয়ে বাঁচছি।

কালিদাসবাবু ডক্টরেট নিয়ে ফিরলেন বিদেশ থেকে। গোকুল যেন হাতে চাঁদ কপালে সূর্যি পেয়ে গেল। মা-বাপ হারা ভাইয়ে-ভাইয়ে জীবনের নানা সুখ-দুঃখ ও ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অপূর্ব বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। বিদেশে দাদার জন্যে তার উদ্বেগের অন্ত ছিল না। যেমন ভালবাসত দাদাকে তেমনি নীরবে পূজা করত। দাদা ফিরে এলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল! দাদাকে কুণ্ডু লেনের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সে দিদিমণি ও তাঁর ছেলেদের নিয়ে চলে এল তাঁদের শিবপুরের বাড়িতে। সেই শিবপুরের বাড়িতে এসেই সে অসুখে পড়ল।

জ্বরের সঙ্গে পিঠে প্রবল ব্যথা। সেই জ্বর ও ব্যথা নিয়েই সে 'পথিকের' কিস্তি লিখেছে, করেছে 'জাঁ ক্রিস্তফের' অনুবাদ। কদিন পরেই রক্তবমি করলে, ডাক্তার পরীক্ষা করে বলে দিলে, যক্ষ্মা।

শিবপুরের বাড়িতে আমরা, "কল্লোলের" বন্ধুরা, প্রায় রোজই যেতাম গোকুলকে দেখতে, তাকে সঙ্গ দিতে, সাধ্যমত পরিচর্যা করতে। অনেক শোকশীতল বিষণ্ণ সন্ধ্যা আমরা কলহাস্যমুখর করে দিয়ে এসেছি। গোকুলকে এক মুহূর্তের জন্যেও আমরা বুঝতে দিই নাই যে আমরা তাকে ছেড়ে দেব। কতদিন দিদিমণির হাতের ডাল-ভাত খেয়ে এসেছি তৃপ্তি করে। দিদিমণি বুঝতে পেরেছেন ঐ একজনই তাঁর ভাই নয়।

একদিন গোকুল আমাকে বললে, 'আর সব যাক, আর কিছু হোক না হোক, স্বাস্থ্যটাকে রেখো, স্বাস্থ্যটাকে ছেড়ে দিও না।'

তার স্নেহকরুণ মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'যার স্বাস্থ্য আছে তার আশা আছে।' নিশ্বাস ফেলল গোকুল: 'আর যার আশা আছে তার সব আছে।'

তেরো

ডাক্তারেরা পরামর্শ দিলে দার্জিলিঙে নিয়ে যেতে।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গোকুলকে বিদায় দেবার সেই ম্লানগম্ভীর সন্ধ্যাটি মনের মধ্যে এখনো লেগে আছে। তার পুনরাগমনের দিকে আমরা ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে থাকব এই প্রত্যাশাটি তাকে হাতে-হাতে পৌঁছে দেবার জন্যে অনেকেই সেদিন এসেছিলাম ইস্টিশানে। কাঞ্চনজঙ্ঘার থেকে সে কাঞ্চনকান্তি নিয়ে ফিরে আসবে। বিশ্বভুবনের যিনি তমোহর তিনিই তার রোগহরণ করবেন।

সঙ্গে গেলেন দাদা কালিদাস নাগ। কিন্তু তিনি তো বেশি দিন থাকতে পারবেন না একটানা। তবে কে গোকুলকে পরিচর্যা করবে? কে থাকবে তার রোগশয্যায় পার্শ্বচর হয়ে? কে এমন আছে আমাদের মধ্যে?

আর কে! আছে সে ঐ একজন, অশরণের বন্ধু, অগতির গতি—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

যখন ভাবি, তখন পবিত্রর প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে। শিবপুরে থাকতে রোজ সে রুগীর কাছে ঠিক সময়ে হাজিরা দিত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত তার পাশটিতে, তাকে শান্ত রাখত, প্রফুল্ল রাখত, নৈরাশ্যের বিরুদ্ধে মনের দরজায় বসে কড়া পাহারা দিত একমনে। কলকাতা থেকে হাওড়ার পোল পেরিয়ে রোজ শিবপুরে আসা, আর দিনের পর দিন এই আত্মহীন কঠিন শুশ্রূষা—এর তুলনা কোথায়! তারপর এ নিঃসহায় রুগীকে নিয়ে দার্জিলিঙে যাওয়া—অন্তত তিন মাসের কড়ারে—নিজের বাড়ি ঘর কাজকর্মের দিকে না তাকিয়ে, সুখসুবিধের কথা না ভেবে—ভাবতে বিস্ময় লাগে! একটা প্রতিজ্ঞা যেন পেয়ে বসেছিল পবিত্রকে। অক্লান্ত সেবা দিয়ে গোকুলকে বাঁচিয়ে তোলবার প্রতিজ্ঞা।

যে স্যানিটোরিয়ামে গোকুল ছিল তার টি-বি ওয়ার্ড প্রায় পাতাল-প্রদেশে—নেমে চলেছে তো চলেইছে। নির্জন জঙ্গলে ঘেরা। চারদিকে ভয়গহন পরিবেশ। সব চেয়ে দুঃসহ, ওয়ার্ডে আর দ্বিতীয় রুগী নেই। সামান্য আলাপ করবার জন্যে সঙ্গী নেই ত্রিসীমায়। এক ঘরে রুগী আরেক ঘরে পবিত্র। রুগীরও কথা কওয়া বারণ, অতএব পবিত্ররও সে কি শব্দ-শ্রুতিহীন কঠিন সহিষ্ণুতা। এক ঘরে আশা, অন্য ঘরে চেষ্টা—দুজন দুজনকে বাঁচিয়ে রাখছে। উৎসাহ জোগাচ্ছে। আশা তবু কাঁপে, কিন্তু চেষ্টা টলে না।

এক-এক দিন বিকেলে গোকুল আর তাগিদ না দিয়ে পারত না: 'কি আশ্চর্য, চব্বিশ ঘণ্টা রুগীর কাছে বসে থেকে তুইও শেষ পর্যন্ত রুগী ব'নে যাবি নাকি? যা না, ঘণ্টা দুই বেড়িয়ে আয়।'

পবিত্র হাসত। হয়তো বা খইনি টিপত। কিন্তু বাইরে বেরুতে চাইত না।

'দার্জিলিঙে এসে কেউ কি ঘরের মধ্যে বসে থাকে কখনো?'

'একজন থাকে। একজনের জন্যে একজন থাকে।' আবার হাসত পবিত্র: 'সেই দুই একজন যখন দুইজন হবে তখন বেরুব একসঙ্গে।'

গোকুল যেখানে ছিল, শুনেছি, সেখানে নাকি সুস্থ মানুষেরই দেহ রাখতে দেরি হয় না! সেইখানেও পবিত্রর আপ্রাণ যোগসাধন!

'না, তুই যা। তুই ঘুরে এলে আমি ভাবব কিছুটা মুক্ত হাওয়া আর মুক্ত মানুষের সঙ্গস্পর্শ নিয়ে এলি।'

পবিত্র তাই একটু বেরুত বিকেলের দিকে, শুধু গোকুলকে শান্তি দেবার জন্যে। কিন্তু নিজের মনে শান্তি নেই।

গোকুলের চিঠি। তিরিশে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২ সালে লেখা। দার্জিলিঙের স্যানিটোরিয়াম থেকে:

অচিন্ত্য, তোমার চিঠি (নন্দনকানন থেকে লেখা !) আমি পেয়েছি। উত্তর দিতে পারিনি, তার কারণ নন্দনকাননের শোভায় তোমার কবিমন এমন মশগুল হয়ে ছিল যে ঠিকানা দিয়েছিলে কলকাতার। কিন্তু কলকাতায় যে কবে আসবে তা তোমার জানা ছিল না। যাই হোক, তুমি ফিরেছ জেনে সুখী হলাম।

পৃথিবীতে অমন শত-সহস্র নন্দন-অমরাবতী-অলকা আছে, কিন্তু সেটা তোমার-আমার জন্যে নয়—এ কথা কি তোমার আগে মনে হয়নি ? তোমার কাজ আলাদা : তুমি কবি, তুমি শিল্পী। ঐ অমরাবতী অলকার স্নিগ্ধমায়া তোমার প্রাণে দুর্জ্জয় কামনার আগুন জেলে দেবে। কিন্তু তুমি দস্যু নও, লুট করে তা ভোগের পেয়ালায় ঢালবে না। কবি ভিখারী, কবি বিবাগী, কবি বাউল—চোখের জলে বুকের রক্ত দিয়ে ঐ নন্দন-অলকার গান গাইবে, ছবি আঁকবে। অলকার সৃষ্টি দেবতা যেদিন করেন সেদিন ঐ কবি-বিবাগীকেও তাঁর মনে পড়েছিল। ঐ অলকার মতই কবি বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তার তৃপ্তি কিছুতে নাই, তাই সে ছন্নছাড়া বিবাগী পথিক, তাই সে বাউল।

এ যদি না হত, অলকা-অমরাবতীকে মানুষ জানত না, বিধাতার অভিপ্রায় বৃথা হত। তিনি স্বর্গের সৌন্দর্য সুখশান্তি দিয়ে পূর্ণ করে কবির হাতে ছেড়ে দিলেন। কবি সেখানে দুঃখের বীজ বুনল, বিরহের বেদনা দিল উজার করে ঢেলে—

মাটির মানুষ ভুখা। তৃষ্ণায় তার বুক শুকিয়ে উঠেছে, ব্যথা-বেদনা সে আর বুঝতে পারে না, চোখে তার জল আসে না, জ্বালা করে। কাঁদবার শক্তি তার নেই, তাই সে মাঝে-মাঝে কবির সৃষ্টি ঐ নন্দন-অলকা-অমরাবতীর দিকে তাকিয়ে বুক হালকা করে নেয়। বিধাতা বিপুল আনন্দে বিভোর হয়ে কবিকে আশীর্ব্বাদ করেন—হে কবি, তোমার শূন্যতা তোমার ক্ষুধা মরুভূমির চেয়ে নিদারুণ হোক।

যাক, অনেক বাজে বকা গেল। তোমার শরীর আছে কেমন? পড়াশোনা ভালই চলছে আশা করি। নতুন আর কি লিখলে? ভালই আছি। আজ আসি।

কদিন পরেই চৌঠা আষাঢ় আবার সে আমাকে একটা চিঠি লেখে। এ চিঠিতে আমার একটা কবিতা সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ আছে, সেটা দ্রষ্টব্য নয়। দ্রষ্টব্য হচ্ছে তার নিজের কবিত্ব। তার রসবোধের প্রসন্নতা।

অচিন্ত্য, এ ভারি চমৎকার হল। সেদিন তোমাকে আমি যে চিঠি লিখেছি তার উত্তর পেলাম তোমার 'বিরহ' কবিতায়। অপূর্ব্ব! বিস্ময়, কামনা, বুভুক্ষা, অতৃপ্তি, প্রেম আর শ্রদ্ধা যেন ফুলের মত ফুটে উঠেছে।

বিস্ময় বলছে:

মরি মরি
অপরূপ আকাশেরে কি বিস্ময়ে রাখিয়াছ ধরি
নয়নের অন্তরমণিতে! নীলের নিতল পারাবার!
বাঁধিয়াছ কি অপূর্ব্ব লীলাছন্দ জ্যোতি-মূর্চ্ছনার
সুকোমল স্নেহে!

কামনা বলছে:

যৌবনের প্রচণ্ড শিখায়
দেহের প্রদীপখানি আনন্দেতে প্রজ্বালিয়া
সৌরভে সৌরভে,
এলে প্রিয়া
লীলামত্ত নির্ঝরের ভঙ্গিমাগৌরবে—

বুভুক্ষা বলেছে:

আজ যদি প্রচণ্ড উৎসুকে
সৃষ্টির উন্মত্ত সুখে

তোমার ঐ বক্ষখানি দ্রাক্ষাসম নিপেষিয়া লই মম বুকে
কানে-কানে মিলনের কথা কই—

অতৃপ্তি বলছে :

এই মোর জীবনের সর্ব্বোত্তম সর্ব্বনাশী ক্ষুধা
মিটাইতে পারে হেন নাহি কোনো সুধা
দেহে প্রাণে ওষ্ঠে প্রিয়া তব—

প্রেম বলছে :

জ্যোৎস্নার চন্দনে স্নিগ্ধ যে আঁকিল টিকা
আকাশের ভালে।
ফাল্গুনের স্পর্শ-লাগা মুঞ্জরিত নব ডালে-ডালে
সদ্যফুল্ল কিশলয় হয়ে
যে হাসে শিশুর হাসি....
যে তটিনী কলকণ্ঠে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
বক্ষে নিয়া দুরন্ত-পিপাসা
সে আজি বেঁধেছে বাসা
হে প্রিয়া তোমার মাঝে !...
মরি মরি
তোমারে হয় না পাওয়া তাই শেষ করি ;
চেয়ে দেখি অনিমিখ
তুমি মোর অসীমের সসীম প্রতীক।

শ্রদ্ধা বলছে :

হে প্রিয়া তোমারে তাই
বারে বারে চাই
খুঁজিতে সে ভগবানে,
তাই প্রাণে-প্রাণে

বিরহের দগ্ধ কান্না ফুকারিয়া ওঠে অবিরাম
তাই মোর সব প্রেম হইল প্রণাম।

তোমার কথা তোমায় শোনালাম। এ সমালোচনা নয়। আমি দু-একজনের কবিতা ছাড়া বাংলার প্রায় সব কবির লেখাই বুঝতে পারি না। যাদের লেখা আমি বুঝতে পারি, পড়ে মনে আনন্দ পাই, তৃপ্তি পাই, উপভোগ করি, তোমাকে আজ তাদের পাশে এনে বসালাম। আমার মনে যাদের আসন পাতা হয়েছে তারা কেউ আমায় নিরাশ করেনি। তোমাকে এই কঠিন জায়গায় এনে ভয় আর আনন্দ সমান ভাবে আমায় উতলা করে তুলছে। কিন্তু খুব আশা হচ্ছে কবিতা লেখা তোমার সার্থক হবে। তোমার আগেকার লেখার ভিতর এমন সহজ ভাবে প্রকাশ করবার ক্ষমতাকে দেখতে পাই নি। 'সূর্য্য' কবিতায় কতকটা সফল হয়েছিলে কিন্তু 'বিরহে' তুমি পূর্ণতা লাভ করেছ।

গতবারের চিঠিতে যে আশীর্ব্বাদ পাঠিয়েছিলাম সেটাই আবার তোমায় বলছি। তোমার শূন্যতা তোমার অন্তরের ক্ষুধা মরুভূমির চেয়ে নিদারুণ হোক। শরীরের-যত্ন নিও। কাজটা খুব শক্ত নয়। ইতি—

আমাকে লেখা গোকুলের শেষ চিঠি। এগারোই আষাঢ়, ১৩৩২ সাল।

অচিন্ত্য, তোমার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু আমার দুটো চিঠির উত্তর একটাতে সারলে ফল বিশেষ ভাল হবে না। আর একটা বিষয়ে একটু তোমাদের সাবধান করে দিই—আমাকে magnifying glass চোখে দিয়ে দেখো না কোন দিন। এটা আমার ভাল লাগে না। আমি কোন বিষয়েই তোমাদের বড় নই। আমি তোমাদের বন্ধুভাবে নিয়েছি বলে তোমরা সকলে 'হাতে চাঁদ আর কপালে সূয্যি' পেয়েছ এ কথা কেন মনে আসে? এতে তোমরা নিজের শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলবে। আমাকে ভালবাস শ্রদ্ধা কর সে আলাদা কথা, কিন্তু একটা 'হবু-গবু' কিছু প্রমাণ কোরো না।

আমি আজও পথিকের চেহারা দেখতে পেলাম না। জন্মদাতার chance কি সবার শেষে? মনটা একটু অস্থির আছে। আসি।

গোকুলের 'পথিক' ছাপা হচ্ছিল কাশীতে, ইণ্ডিয়ান প্রেসে। তাকে প্রুফ আসত, আর সে-প্রুফ আগাগোড়া দেখে দিত পবিত্র। পড়ে যেত গোকুলের সামনে, আর অদল-বদল যদি দরকার হত, গোকুল বলে দিত মুখে-মুখে। গোকুলের ইচ্ছে ছিল 'পথিকের' মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'পথিক' কথিকাটি কবির হাতের লেখায় ব্লক করে ছাপবে, কিন্তু তার সে ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি।

তেরোশ বত্রিশের বৈশাখে "কল্লোলে" রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তি' কবিতাটি ছাপা হয়। "কল্লোলের" সামান্য পুঁজি থেকে তার জন্যে দক্ষিণা দেওয়া হয় বিশ্বভারতীকে।

"যেদিন বিশ্বের তৃণ মোর অঙ্গে হবে রোমাঞ্চিত
আমার পরান হবে কিংশুকের রক্তিমা-লাঞ্ছিত
সেদিন আমার মুক্তি, যেই দিন হে চির-বাঞ্ছিত
তোমার লীলায় মোর লীলা
যেদিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে তালে-তালে মিলা।"

দার্জিলিং থেকে দুজন নতুন বন্ধুসংগ্রহ হল "কল্লোলের"—এক অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়, আর সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এক কথায় আমাদের দা-গোঁসাই। প্রথমোক্তর সম্পর্কটা কিছুটা ভাসা-ভাসা ছিল, কিন্তু দা-গোঁসাই "কল্লোলের" একটা কায়েমী ও দৃঢ়কায় খুঁটি হয়ে দাঁড়াল। পলিমাটির পাশে সে যেন পাথুরে মাটি। সেই শক্তি আর দৃঢ়তা শুধু তার ব্যায়ামবলিষ্ঠ শরীরে নয়, তার কলমে, মোহলেশহীন নির্মম কলমে উপচে পড়ত। বত্রিশের শ্রাবণে 'দা-গোঁসাই' নামে সে একটা আশ্চর্যরকম ভাল গল্প লেখে, আর সেই থেকে তারও নাম হয়ে যায়

দা-গোঁসাই। গল্পটার সব চেয়ে বড় বিশেষত্ব ছিল যে সেটা প্রেম নিয়ে লেখা নয়, আর লেখার মধ্যে কোথাও এতটুকু সজলকোমল মেঘোদয় নেই, সর্বত্রই একটা খটখটে রোদ্দুরের কঠিন পরিচ্ছন্নতা। অথচ যে অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গটুকুর জন্যে সমস্ত সৃষ্টি অর্থান্বিত, সেই মধুর ব্যঙ্গটুকু অপরিহার্যরূপে উপস্থিত। লোকটিও তেমনি। একেবারে সাদাসিধা, কাঠখোট্টা, স্পষ্টবক্তা। কথাবার্তাও কাট-কাট, হাড়-কাঁপানো। ঠাট্টাগুলোও গাট্টা-মারা। ভিজে হাওয়ার দেশে এক ঝাপটা তপ্ত লু। তপ্ত, কিন্তু চারদিকে স্বাস্থ্য আর শক্তির আবেগ নিয়ে আসত। ঢাকের যেমন কাঠি, তেমনি তার সঙ্গে সাইকেল। পোঁ ছাড়া যেমন সানাই নেই, তেমনি সাইকেল ছাড়া দা-গোঁসাই নেই। এই দোচাকা চড়ে সে অষ্ট দিক (উর্ধ্ব-অধঃ ছাড়া) প্রদক্ষিণ করছে অষ্টপ্রহর। সন্দেহ হয়েছে সে সাইকেলেই বোধ হয় ঘুমোয়, সাইকেলেই খায়-দায়। বেসাইকেল মধুসূদন দেখেছি কিন্তু বেসাইকেল সুরেশ মুখুজ্জে দেখেছি বলে মনে পড়েনা।

পবিত্রর চেষ্টা ফলবতী না হলেও ফুল ধরল। গোকুল উঠে বসল বিছানায়। একটু একটু করে ছাড়া পেল ঘরের মধ্যে। ক্রমশ ঘর থেকে বাইরের বারান্দায়। আর এই বারান্দায় এসে একদিন সে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখলে। মুখে-চোখে আনন্দ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, দেহ-মন থেকে সরে গেল রোগচ্ছায়া। পবিত্রকে বললে, 'জানিস, কারুর মরতে চাওয়া উচিত নয় পৃথিবীতে, তবু আজ যদি আমি মরি আমার কোনো ক্ষোভ থাকবে না।'

সংসারের আনন্দ সব ক্ষীণশ্বাস, অল্পজীবী। কিন্তু এমন কতগুলি হয়তো আনন্দ আছে যা পরিণতি খুঁজতে চায় মৃত্যুতে, যাতে করে সেই আনন্দকে নিরবচ্ছিন্ন করে রাখা হবে, নিয়ে যাওয়া হবে কালাতীত নিত্যতায়। কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপারে গোকুল দেখতে পেল ধ্রুব আর দৃঢ়

স্থির আর স্থায়ী কোন এক আনন্দতীর্থের মুক্তদ্বার। পথিকের মন উন্মুখ হয়ে উঠল।

ভাদ্রের শেষের দিকে ডাক্তার কালিদাসবাবুকে লিখলেন, গোকুলের অসুখ বেড়েছে। চিঠি পেয়েই দীনেশদা দার্জিলিঙে ছুটলেন। তখন ঘোর দুরন্ত বর্ষা, রেল-পথ বন্ধ, পাহাড় ভেঙে পথ ধ্বসে পড়েছে। কার্শিয়াং পর্যন্ত এসে বসে থাকতে হল দুদিন। কদিনে রাস্তা খোলে তার ঠিক কি, অথচ যার ডাকে এল তার কাছে যাবার উপায় নেই। সে প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে অথচ দীনেশদা গতিশূন্য। এই বাধা কে আনে, কেন আনে, কিসের পরীক্ষায়? দীনেশদা কোমর বাঁধলেন। ঠিক করলেন পায়ে হেঁটেই চলে যাবেন দার্জিলিং! সেই ঝড়-জলের মধ্যে গহন-দুর্গম পথে রওনা হলেন দীনেশদা। সেটাই "কল্লোলের" পথ, সেটাই "কল্লোলের" ডাক। বারো ঘণ্টা একটানা পায়ে হেঁটে দীনেশদা দার্জিলিং পৌছুলেন—জলকাদারক্ত-মাখা সে এক দুর্দম যোদ্ধার মূর্তিতে। চলতে-চলতে পড়ে গিয়েছেন কোথাও, তারই ক্ষতচিহ্ন সর্বদেহে ধারণ করে চলেছেন। আঘাতকে অস্বীকার করতে হবে, লঙ্ঘন করতে হবে বিপত্তি-বিপর্যয়।

গোকুলের সঙ্গে দেখা হল। দেখা হতেই দীনেশদার হাত ধরল গোকুল। বললে, 'জীবনের এক দুর্দিনে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ভাবছিলাম, আজ আবার এই দুর্দিনে যদি তোমার সঙ্গে দেখা না হয়।'

বন্ধুকে পেয়ে কথায় পেয়ে বসল গোকুলকে। দীনেশদা বাধা দিতে চেষ্টা করেন কিন্তু গোকুল শোনে না। বলে, 'বলতে দাও, আর যদি বলতে না পারি।'

কথা শেষ করে দীনেশদার হাত তার কপালের উপর এনে রাখল; বললে. 'Peace, Peace! আমার এখন খুব শান্তি। বড্ড চাইছিলাম

তুমি আস, বেশি করে লিখতে পারিনি, কিন্তু বড় ইচ্ছে করছিল তুমি আস।' সব বন্ধু-বান্ধবের কথা খুঁটিনাটি করে জেনে নিলে। বললে, 'আমাকে রাখতে পারবে না, কিন্তু কল্লোলকে রেখো।'

সে রাত্রে খুব ভালো ঘুমোল গোকুল। সকালে ঘুম ভাঙলে বললে, 'বড় তৃপ্তি হল ঘুমিয়ে।'

কিন্তু দুপুর থেকেই ছটফট করতে শুরু করলে। 'দাদা এখনো এলেন না?'

'আজ সন্ধেবেলা পৌঁছুবেন।'

গভীর সমর্পণে চোখ বুজল গোকুল।

সন্ধেবেলা কালিদাসবাবু পৌঁছুলেন। দুই ভাইয়ে, সুখ-দুঃখের দুই সঙ্গীতে, শেষ দৃষ্টিবিনিময় হল। আবেগরুদ্ধকণ্ঠে গোকুল একবার ডাকলে, দাদা!

সব শেষ হয়ে গেল আস্তে আস্তে। কিন্তু কিছুরই কি শেষ আছে?

গোকুলের তিরোধানে নজরুলের কবিতা "গোকুল নাগ" প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণের "কল্লোলে", সেই বছরেই। এই কটা লাইনে "কল্লোল" সম্বন্ধে তার ইঙ্গিত উজ্জ্বল-স্পষ্ট হয়ে আছে:

সেই পথ, সেই পথ-চলা গাঢ় স্মৃতি,
সব আছে—নাই শুধু নিতি-নিতি
নব নব ভালোবাসা প্রতি দরশনে
আদি নাই অন্ত নাই ক্লান্তি তৃপ্তি নাই—
যত পাই তত চাই—আরো আরো চাই,—
সেই নেশা সেই মধু নাড়ী-ছেঁড়া টান
সেই কল্পলোকে নব-নব অভিযান—
সব নিয়ে গেছ বন্ধু! সে কল-কল্লোল
সে হাসি-হিল্লোল নাই চিত উতরোল!

* আজ সেই প্রাণ-ঠাসা একমুঠো ঘরে
* শূন্যের শূন্যতা রাজে, বুক নাহি ভরে।....
সুন্দরের তপস্যায় ধ্যানে আত্মহারা
দারিদ্র্যের দর্পতেজ নিয়ে এল যারা,
যারা চির-সর্ব্বহারা করি আত্মদান
যাহারা সৃজন করে করে না নির্ম্মাণ,
সেই বাণীপুত্রদের আড়ম্বরহীন
এ সহজ আয়োজন এ স্মরণ দিন
স্বীকার করিও কবি, যেমন স্বীকার
করেছিলে তাহাদেরে জীবনে তোমার।
নহে এরা অভিনেতা দেশনেতা নহে
এদের সৃজনকুঞ্জ অভাবে বিরহে,
ইহাদের বিত্ত নাই, পুঁজি চিত্তদল,
নাই বড় আয়োজন নাই কোলাহল ;
আছে অশ্রু আছে প্রীতি, আছে বক্ষক্ষত,
তাই নিয়ে সুখী হও, বন্ধু স্বর্গগত !
গড়ে যারা, যারা করে প্রাসাদনির্ম্মাণ
শিরোপা তাদের তরে তাদের সম্মান।
দুদিনে ওদের গড়া পড়ে ভেঙে যায়,
কিন্তু স্রষ্টাসম যারা গোপনে কোথায়
সৃজন করিছে জাতি সৃজিছে মানুষ
রহিল অচেনা তারা।

অপ্রত্যাশিতভাবে আরেক জায়গা থেকে তপ্ত অভিনন্দন এল। অভিনন্দন পাঠালেন ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, বাগবাজার বিশ্বকোষ লেন থেকে।

* এ দুটো লাইন নজরুলের কাব্যগ্রন্থে নেই।

"...গোকুলের পথিক পড়া শেষ করেছি। বইখানিতে সব চাইতে আমার দৃষ্টি পড়েছে একটা কথার উপর। লেখক বাঙ্গালার ভাবী সমাজটার যে পরিকল্পনা করেছেন তা দেখে বুড়োদের চোখের তারা হয়ত কপালে উঠতে পারে, হয়ত অনেকে সামাজিক শুভচিন্তাটাকে বড় করে দেখে মনে করতে পারেন, এরূপ লেখায় প্রাচীন সমাজের ভিত ধ্বসে পড়বে। আট বছরের গৌরীর দল এ সকল পুস্তক না পড়ে তজ্জন্য অভিভাবকেরা হয়ত খাড়া পাহারার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আমার মনে হয় আমরা যে দরজা শাশি ও জানালা একেবারে বন্ধ করে রেখেছি এ ত আর বেশী দিন পারব না—এতে করে যে কতকগুলি রোগা ছেলে নিয়ে আমরা শুধু প্রাচীন শ্লোক আওড়ে তাদের আধমরা করে রেখে দিয়েছি। বাঙালী জাতি একেবারে জগৎ থেকে চলে যাওয়া বরং ভাল কিন্তু সংস্কারের যাঁতায় ফেলে তাদের অসার করে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন কি?

"এবার সব দিককার দরজা-জানালা খুলে দিতে হবে, আলো ও হাওয়া আসুক। হয়ত চিরনিরুদ্ধ গৃহে বাস করায় অভ্যস্ত দুই একটা রোগা ছেলে এই আলো ও হাওয়া বরদাস্ত করতে পারবে না। কিন্তু স্বভাবটাকে গলা টিপে মারবার চেষ্টায় নিজেরা যে মরে যাব। না হয় মড়ার মতন হয়ে কয়েকটা দিন বেঁচে থাকব। এরূপ বাঁচার চেয়ে মরা ভাল।

"যে সকল বীর আমাদের ঘর-দোর জোর করে খুলে দেওয়ার জন্যে লেখনী নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, তন্মধ্যে "কল্লোলের" লেখকেরা সর্ব্বাপেক্ষা তরুণ ও শক্তিশালী। প্রাচীন সমাজের সহিত একটা সন্ধি স্থাপন করবার দৈন্য ইহাদের নাই। নিজেদের প্রগাঢ় অনুভূতি সত্যের প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি গুণে একান্ত নির্ভীক, ইহারা মামুলী পথটাকে একেবারে পথ বলে স্বীকার করেন না, ইহারা যাহা সুন্দর যাহা স্বাভাবিক, যেখানে

প্রকৃত মনুষ্যত্ব, তাহা প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই আত্মার স্বপ্রকাশিত সত্যটাকে ইহারা বেদ কোরাণের চাইতে বড় মনে করেছেন। এই সকল বলদর্পিত মর্ম্মবান লেখকদের পদভরে প্রাচীন জরাজীর্ণ সমাজের অস্থিপঞ্জর কেঁপে উঠবে। কিন্তু আমি এঁদের লেখা পড়ে যে কত সুখী হয়েছি তা বলতে পারি না। আমাদের মনে হয় ডোবা ছেড়ে পদ্মার স্রোতে এসে পড়েছি—যেন কাগজ ও সোলার ফুল-লতার কৃত্রিম বাগান ছেড়ে নন্দনকাননে এসেছি।...”

গোকুল সম্বন্ধে আরো একটি কবিতা আসে: নাম, ‘যৌবন-পথিক’:

তুমি নব বসন্তের সুরভিত দক্ষিণ বাতাস
ক্ষণতরে বিকম্পিত করি গেলে বাণীর কানন—

লেখাটি এল মফঃস্বল থেকে, ঢাকা থেকে। লেখক অপরিচিত, কে-এক শ্রীবুদ্ধদেব বসু। তখন কে জানত এই লেখকই একদিন “কল্লোলে”—তথা বাংলা সাহিত্যে গৌরবময় নতুন অধ্যায় যোজনা করবে!

চৌদ্দ

ভবানীপুর মোহিনী মুখুজ্জে রোডে কে-একটি যুবক গল্প বলছে।

পৌষের সন্ধ্যা। কথককে ঘিরে শ্রোতা-শ্রোত্রীর ভিড়। শীতের সঙ্গে-সঙ্গে গল্পও জমে উঠেছে নিটোল হয়ে।

তীক্ষ্ণ একটি মুহূর্তের চূড়ায় গল্প কখন উঠে এসেছে অজ্ঞাতে। দোদুল্যমান মুহূর্ত। ঘরের বাতাস স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ বন্ধ হল গল্প-বলা।

'তারপর? তারপর কি হল?' অস্থির আগ্রহে সবাই ছেঁকে ধরল কথককে।

'তারপর?' একটু হাসল নাকি যুবক? বললে, 'বাকিটা কাল শুনতে পাবে। সময় নেই, লাস্ট ট্র্যাম চলে গেল বোধ হয়।'

পরদিন গল্পের বাকিটা আমরাও শুনতে পেলাম। ইডেন হিন্দু হসটেলের বাথরুমে দরজা বন্ধ করে কার্বলিক এসিড খেয়ে কথক বিজয় সেনগুপ্ত আত্মহত্যা করেছে।

দেখতে গিয়েছিলাম তাকে। দীর্ঘ দেহ সংকুচিত করে মেঝের উপর শুয়ে আছে বিজয়। ঠোঁট দুটি নীল।

চারদিকে গুঞ্জন উঠল যুবসমাজে, সাহিত্যিক সমাজে। কেউ সহানুভূতি দেখাল, কেউ করলে তিরস্কার। কেউ বললে, এম-এর পড়া-খরচ চলছিল না; কেউ টিপ্পনি কেটে বললে, এম-এর নয় হে, প্রেমের। কেউ বললে, বিকৃতমস্তিষ্ক; কেউ বললে, কাপুরুষ।

যে যাই বলুক, তার মৃত সুন্দর মুখে শুধু একটি গল্প-শেষ-করার শান্তি। আবার কোথায় আরেকটি গল্প আরম্ভ করার আয়োজন।

তারপর? এই মহাজিজ্ঞাসার কে উত্তর দেবে? শুধু প্রাণ থেকে

প্রাণে অধ্যায় থেকে অধ্যায়ে, এই তারপরের ইসারা। শুধু একটি ক্রমায়ত উপন্যাস।

বিজয়ের বেলায় অনেকেই তো অনেক মন্তব্য করেছিলে, কিন্তু সুকুমারের বেলায় কি বললে? তাকে কে হত্যা করল? কে তাকে অকালে তাড়িয়ে দিলে সংসার থেকে?

এম-এস-সি আর ল পড়ত সুকুমার। খরচের দায়ে এম-এস-সি চালাতে পারল না—শুধু আইন নিয়ে থাকল। কিন্তু শুধু নিজের পড়া-খরচ চালালেই তো চলবে না—সংসার চালাতে হবে। দেশের বাড়িতে বিধবা মা আর দুটি বোন তার মুখের দিকে চেয়ে। বড় বোনটিকে পাত্রস্থ করা দরকার। কিন্তু ঘুরে ঘুরে সে হা-ক্লান্ত, বিনাপণে বর নেই বাংলা দেশে।

একমাত্র রোজগার ছাত্র-পড়ানো—আর কালে-ভদ্রে পূজার কাগজে গল্প লিখে দু'পাঁচ টাকা দর্শনী। আর সে দু-পাঁচ টাকা আদায় করতে আড়াই মাস ধন্না দেওয়া। সকালে যাও, শুনবে কৈলাসবাবু তো তিনটের সময় আসেন; আর যদি তিনটের সময় যাও, শুনবে, কৈলাস-বাবু তো ঘুরে গিয়েছেন সকালবেলা। সুতরাং যদি লিখে রোজগার করতে চাও তো সাহিত্যে নয়, মুহুরি হয়ে কোর্টের বারান্দায় বসে দরখাস্তের মুসাবিদা করো।

তাই একমাত্র উপায় টিউশানি। সকালে সন্ধ্যায় অলিতে গলিতে শুধু ছাত্রের অন্নছত্র। পাঁচ থেকে পনেরো—যেখানে যা পাওয়া যায়। তুচ্ছ উঞ্ছবৃত্তি। সে ক্লেশ কহতব্য নয়, মুদ্রার মানদণ্ডে মান নেই, শুধু দণ্ডটাই অখণ্ড। স্বাস্থ্য পড়ল ভেঙে, দিব্যবর্ণ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। সুকুমার অসুখে পড়ল।

শেষ দিকে প্রমথ চৌধুরীর বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাজ করত। নামে চাকরি, থাকত একেবারে ঘরের ছেলের মত। •কিন্তু শুধু নিজে

আরামে থেকে তার সুখ কই? স্নেহ-সেবার বিছানায় পড়ে থাকলে তার চলবে কেন? তার মা-বোনেরা কি ভাববে?

টাকার ধান্দায় ঘোরে সামর্থ্য কই শরীরে? ডাক্তার যা বললেন, রোগও রাজকীয়—সাধ্য হলে চেঞ্জে যাওয়া দরকার এখুনি। কিন্তু সুকুমারের মত ছেলের পক্ষে দেশের বাড়িতে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর চেঞ্জ কোথায়? সেখানে মায়ের বুক ভরবে সত্যি, কিন্তু পেট ভরবে কি দিয়ে?

মাসখানেক কোনো খবর নেই। বোধ হয় মঙ্গলময়ী মায়ের স্পর্শে নিরাময় হয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন চিঠি এল কল্লোল-আপিসে, সে ডুমকায় যাচ্ছে তার এক কাকার ওখানে। দেশের মাটিতে তার অসুখের কোনো সুরাহা হয়নি।

দুখানা কাঠির ওপর নড়বড়ে একটি মাথা আর তার গভীর দুই কোটরে জ্বলন্ত দুটো চক্ষু। এই তখন সুকুমার। কষিতকাঞ্চন দেহ তন্তুসার হয়ে গেছে। কাঁপছে হাওয়া-লাগা প্রদীপের শিখের মত। আড়াল করে না দাঁড়ালে এখুনি হয়ত নিবে যাবে।

কিন্তু এই শরীরে ডুমকায় যাবে কি করে? হ্যাঁ, যাব, মা-বোনের চোখের সামনে নিষ্ক্রিয়ের মত তিল-তিল করে ক্ষয় হয়ে যেতে পারব না। তাঁদের চোখের আড়ালে যেতে পারলে তাঁরা ভাবতে পারবেন দিনে-দিনে আমি ভালো হয়ে উঠছি। আর ভালো হয়ে উঠেই আবার লেগেছি জীবিকার্জনের সংগ্রামে।

এ রুগীর পক্ষে ডুমকার পথ তো সাধ্যাতীত। কারুর নিশ্চয় যেতে হয় সঙ্গে, অন্তত পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়। কিন্তু যাবে কে?

গোকুলের বেলায় পবিত্র, সুকুমারের বেলায় নৃপেন। আরেকজন আদর্শ-প্রেরিত বন্ধু। ওটা তখনো সেই যুগ যে-যুগে প্রায় প্রেমেরই সমান-সমান বন্ধুতার দাম ছিল—সেই একই বিরহোৎকণ্ঠ বন্ধুতা। যে একক্রিয় সে তো শুধু মিত্র, যে সমপ্রাণ সে সখা, যে সদৈবানুমত

সে সুহৃৎ—কিন্তু যে অত্যাগসহন, অর্থাৎ দুইজনের মধ্যে অন্যের ত্যাগ যার অসহনীয়, সেই বন্ধু। ছিল সেই অধীর অকপট আসক্তি। এমন টান যার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দেওয়া যায়।

আর এ তো শুধু বন্ধু নয়, মরণের পথে একলা এক পর্যটক।

দেওঘর পর্যন্ত কোনো রকমে আসা গেল। সুকুমারের প্রাণটুকু গলার কাছে ধুকধুক করছে—সাধ্য নেই দুমকার বাস নেয়। নৃপেন বললে, 'ভয় নেই, আমি তোকে কোলে করে নিয়ে যাব।'

কিন্তু বাস-এ তো উঠতে হবে। এত প্রচণ্ড ভিড়, পিন ফোটাবার জায়গা নেই। আর এমন অবস্থাও নেই যে ফাঁকা বাস-এর জন্যে বসে থাকা চলে। প্রায় জোরজার করেই উঠে পড়ল নৃপেন। বসবেন কোথায় মশাই? জায়গা কই? মাঝখানে মেঝের উপর একটা বস্তা ছিল। নৃপেন বললে, কেন, এই বস্তার উপর বসব। আপনারা তো দুজন দেখছি, উনি তবে বসবেন কোথায়? ভয় নেই, বেশি জায়গা নেব না, উনি আমার কোলের উপর বসবেন।

অনেক হালকা আর ছোট হয়ে গিয়েছিল সুকুমার। আর নৃপেন তাকে সত্যি-সত্যি কোলে নিয়ে বসল, বুকের উপর মাথাটা শুইয়ে দিলে। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে সারা গা। দুই বোজা চোখে কোন হারানো পথের স্বপ্ন। আর মন? মন চলেছে নিজ নিকেতনে।

দুমকায় এসে ঢালা বিছানা নিলে সুকুমার। সেই তার শেষশয্যা।

একদিন নৃপেনকে বললে, 'সত্যি করে বল তো, কোনো দিন কাউকে ভালোবেসেছিস?'

নৃপেন কথাটার পাশ কাটিয়ে গেল: 'কে জানে।'

'কে জানে নয়! সত্যি করে বল, কোনোদিন কাউকে অন্তরের সঙ্গে একান্ত করে ভালোবেসেছিস পাগলের মত? স্ত্রীর কথা ভাবিসনে! কোনো মেয়ের কথা বলছি না।'

তবে কি সেই অব্যক্তমূর্তির কথা? নৃপেন স্তব্ধ হয়ে রইল।

'আচ্ছা, বল, অন্নজলের জন্যে যে প্রেম, তার চেয়ে বেশি প্রবল বেশি বিশুদ্ধ প্রেম কি কিছু আছে আর পৃথিবীতে? সেই অন্নজলের প্রেমে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিস কখনো? শরীরে ক্ষুধা-তৃষ্ণা স্বাস্থ্য-আয়ু সব বিলিয়ে দিয়েছিস তার জন্যে?'

নৃপেনের মুখে কথা নেই। সুকুমারের ইসারায় মুখের কাছে বাটি এনে ধরল। রক্তে ভরে গেল বাটিটা।

ক্লান্তির ভাব কাটিয়ে উঠে সুকুমার বললে, 'জানালার পর্দাটা সরিয়ে দে। এখনো অন্ধকার হয়নি। আকাশটা একটু দেখি।'

নৃপেনের মুখের ম্লানভাব বুঝি চোখে পড়ল সুকুমারের। যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে এমনি সুরে বললে, 'কোনো দুঃখ করিস না। অন্ধকার কেটে যাবে। আলোয় ঝলমল করে উঠবে আকাশ। আবার আলো-ঝলমল নীল আকাশের তলে আমি বেড়াব তোর সঙ্গে। তুই এখানে—আর আমি কোথায়! তবু আমরা এক আকাশের নিচে। এই আকাশের শেষ কই—'

সবই কি শূন্য? কোথাও কি কিছু ধরবার নেই, দাঁড়াবার নেই? আকাশের অভিমুখে উত্থিত হল সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা।

কিম আকাশং অনাকাশং ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব কিং। এমন কি কিছুই নেই যা আকাশ হয়েও আকাশ নয়, যা কিছু না হয়েও কিছু?

সুকুমারের মৃত্যুতে প্রমথ চৌধুরী একটা চিঠি লিখেছিলেন দীনেশদাকে। সেটা এখানে তুলে দিচ্ছি:

কল্যাণীয়েষু

আজ ঘুম থেকে উঠে তোমার পোষ্টকার্ডে সুকুমারের অকালমৃত্যুর খবর পেয়ে মন বড় খারাপ হয়ে গেল। কিছুদিন থেকে তার শরীরের

অবস্থা যে রকম দেখছিলুম তাতেই তার জীবনের বিষয়ে হতাশ হয়েছিলুম।

আমার সাধ্যমত তার রোগের প্রতিকার করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার ফল কিছু হল না। নৃপেন যে তার সঙ্গে ডুমকা গিয়েছিল তাতে সে প্রকৃত বন্ধুর মতই কাজ করেছে। নৃপেনের এই ব্যবহারে আমি তার উপরে যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়েছি।

এই সংবাদ পেয়ে একটি কথা আমার ভিতর বড় বেশি করে জাগছে। সুকুমারের এ বয়সে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হল শুধু তার অবস্থার দোষে। এ দেশে কত ভদ্রসন্তান যে এরকম অবস্থায় কায়ঃক্লেশে বেঁচে আছে মনে করলে ভয় হয়।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

একজন যায়, আরেকজন আসে। যে যায় সেও নিশ্চয় কোথাও গিয়ে উপস্থিত হয়। আর যে আসে, সেও হয়তো কত অজানিত দেশ ঘুরে কত অপরিচয়ের আকাশ অতিক্রম করে একেবারে হৃদয়ের কাছটিতে এসে দাঁড়ায়ঃ

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন—"

হঠাৎ "কল্লোলে" একটা কবিতা এসে পড়ল—'নীলিমা'। ঠিক এক টুকরো নীল আকাশের সারল্যের মত। মন অপরিমিত খুশি হয়ে উঠল। লেখক অচেনা, কিন্তু ঠিকানাটা কাছেই, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট। বলা-কওয়া নেই, সটান একদিন গিয়ে দরজায় হানা দিলাম।

এই শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত!

শুধু মনে মনে সম্ভাষণ করে তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। একেবারে সশরীরে এসে আবির্ভূত হলাম। আপনার নিবিড়-গভীর কবি মন প্রসন্ন নীলিমার মত প্রসারিত করে দিয়েছেন। ভাবলাম আপনার হৃদয়ের সেই প্রসন্নতার স্বাদ নিই।

ভীরু হাসি হেসে জীবনানন্দ আমার হাত ধরল। টেনে নিয়ে গেল তার ঘরের মধ্যে। একেবারে তার হৃদয়ের মাঝখানে।

লোকটি যতই গুপ্ত হোক পদবীর গুপ্ত তখনো বর্জন করেনি। আর যতই সে জীবনানন্দ হোক তার কবিতায় আসলে একটি জীবনাধিক বেদনার প্রহেলিকা।

বরিশাল, সর্বানন্দ ভবন থেকে আমাকে-লেখা তার একটা চিঠি এখানে তুলে দিচ্ছি :

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠিখানা পেয়ে খুব খুশী হলাম। আষাঢ় এসে ফিরে যাচ্ছে, কিন্তু বর্ষণের কোনো লক্ষণই দেখছিনে। মাঝে মাঝে নিতান্ত "নীলোৎপলপত্রকান্তিভিঃ ক্বচিৎ প্রভিন্নাঞ্জনরাশিসন্নিভৈঃ" মেঘমালা দূর দিগন্ত ভরে ফেলে চোখের চাতককে দুদণ্ডের তৃপ্তি দিয়ে যাচ্ছে। তারপরেই আবার আকাশের cerulean vacancy, ডাক-পাখীর চীৎকার, গাঙ-চিল-শালিখের পাখার ঝটপট, মৌমাছির গুঞ্জরণ—উদাস অলস নিরালা দুপুরটাকে আরো নিবিড়ভাবে জমিয়ে তুলচে।

চারদিকে সবুজ বনশ্রী, মাথার উপর শফেদা মেঘের সারি, বাজ-পাখীর চক্কর আর কান্না। মনে হচ্ছে যেন মরুভূমির সবজিবাগের ভেতর বসে আছি, দূরে-দূরে তাতার দস্যুর হুল্লোড়। আমার তুরানী প্রিয়াকে কখন যে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি!…হঠাৎ কোত্থেকে কত কি তাগিদ এসে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় একেবারে বেসামাল বিশমাল্লার ভিড়ে! সারাটা দিন—অনেকখানি রাত—জোয়ারভাটায় হাবুডুবু!

গেল ফাল্গুনমাসে সেই যে আপনার ছোট্ট চিঠিখানা পেয়েছিলুম সেকথা প্রায়ই আমার মনে পড়ে। তখন থেকেই বুঝেছি বিধাতার কৃপা আমার ওপর আছে। আমি সারাটা জীবন এমনতর জিনিসই চেয়েছিলুম। চট করে যে মিলে যাবে সে রকম ভরসা বড় একটা ছিল না। কিন্তু সুরুতেই পেয়ে গেলুম। ছাড়চিনে; এ জিনিসটাকে স্মৃতির মণিমঞ্জুষার ভেতরেই আটকে রাখবার মত উদাসী আমি নই। বেদান্তের দেশে জন্মেও কায়াকে ছায়া বলা তো দূরের কথা, ছায়ার ভেতরই আমি কায়াকে ফুটিয়ে তুলতে চাই।

স্পষ্ট হদিস পাচ্ছি আমার এই টিমটিমে কবি-জীবনটি দপ করেই নিভে যাবে; যাক গে—আফশোষ কিসের? আপনাদের নব-নব-সৃষ্টির রোশনায়ের ভেতর আলো খুঁজে পাব তো—আপনাদের সঙ্গে-সঙ্গে চলবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হব না তো। সেই তো সমস্ত। আমার হাতে যে বাঁশী ভেঙে যাচ্চে,—গেছে, বন্ধুর মুখে তা অনাহত বেজে চলেচে,—আমার মেহেরাবে বাতি নিবে গেল, বন্ধুর অনির্ব্বাণ প্রদীপে পথ দেখে চল্লুম,—এর চেয়ে তৃপ্তির জিনিস আর কি থাকতে পারে।

চার দিকেই বে-দরদীর ভিড়। আমরা যে কটি সমানধর্ম্মা আছি, একটা নিরেট অচ্ছেদ্য মিলন-সূত্র দিয়ে আমাদের গ্রথিত করে রাখতে চাই। আমাদের তেমন পয়সাকড়ি নেই বলে জীবনের 'creature comforts' জিনিসটি হয়তো চিরদিনই আমাদের এড়িয়ে যাবে; কিন্তু একসঙ্গে চলার আনন্দ থেকে আমরা যেন বঞ্চিত না হই—সে পথ যতই পর্ণমলিন, আতপক্লিষ্ট, বাত্যাহত হোক না কেন।

আরো নানারকম আলাপ কলকাতায় গিয়ে হবে। কেমন পড়ছেন? First Class নেওয়া চাই। কলকাতায় গিয়ে নতুন ঠিকানা আপনাকে সময়মত জানাব। আমার প্রীতিসম্ভাষণ গ্রহণ করুন। ইতি

আপনার শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত

বরিশাল থেকে ফিরে এসে জীবনানন্দ ডেরা নিলে প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে, হ্যারিসন রোডে, "কল্লোলের" নাগালের মধ্যে। একা-এক ঘর, প্রায়ই যেতাম তার কাছে। কোনো-কোনো দিন মনে এমন একটা সুর আসে যখন হৈ-হল্লা, জনতা-জটলা ভালো লাগে না। সে সব দিন পটুয়াটোলা লেনে না ঢুকে পাশ কাটিয়ে রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট দিয়ে জীবনানন্দের মেসে এসে হাজির হতাম। পেতাম একটি অস্পর্শশীতল সান্নিধ্য, সমস্ত কথার মধ্যে একটি অন্তরতম নীরবতা। তুচ্ছ চপলতার ঊর্ধ্বে বা একটি গভীর ধ্যানসংযোগ। সে যেন এই সংগ্রামসংকুল সংসারের জন্যে নয়, সে সংসারপলাতক। জোর করে তাকে দু-একদিন কল্লোল-আপিসে টেনে নিয়ে গেছি, কিন্তু একটুও আরাম পায়নি, সুর মেলাতে পারেনি সেই সপ্তস্বরে। যেখানে অনাহত ধ্বনি ও অলিখিত রং, জীবনানন্দের আড্ডা সেইখানে।

তীব্র আলো, স্পষ্ট বাক্য বা প্রখর রাগরঞ্জন—এ সবের মধ্যে সে নেই। সে ধূসরতার কবি, চিরপ্রদোষদেশের সে বাসিন্দা। সেই যে আমাকে সে লিখেছিল, আমি ছায়ার মধ্যে কায়া খুঁজে বেড়াই, সেই হয়তো তার কাব্যলোকের আসল চাবিকাঠি। যা সত্তা তাই তার কাছে অবস্তু, আর যা অবস্তু তাই তার অনুভূতিতে আশ্চর্য অস্তিত্বময়। যা অনুক্ত তাই অনির্বচনীয় আর যা শব্দস্পর্শস্পন্দ তাই নীরবনির্জন, নির্বাণনিশ্চল। বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ নতুন স্বাদ নিয়ে এসেছে, নতুন দ্যোতনা। নতুন মনন, নতুন চৈতন্য। ধোয়াটের জলে ভেসে-আসা ভরাটের মাটি নয়, সে একটি নতুন নিঃসঙ্গ নদী।

সিটি কলেজে লেকচারারের কাজ করত জীবনানন্দ। কবিতায় শস্তুশীর্ষে স্তনশ্যামমুখ কল্পনা করেছিল বলে শুনেছি সে কর্তৃপক্ষের কোপে পড়ে। অশ্লীলতার অপবাদে তার চাকরিটি কেড়ে নেয়। যতদূর দেখতে পাই অশ্লীলতার হাড়িকাঠে জীবনানন্দই প্রথম বলি।

নখাগ্র পর্যন্ত যে কবি, সাংসারিক অর্থে সে হয়তো কৃতকাম নয়। এবং তারই জন্যে আশা, সর্বকল্যাণকারিণী কবিতা তাকে বঞ্চনা করবে না।

ইডেন গার্ডেনে একজিবিশনের তাঁবু ছেড়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ি এই সময় মনোমোহনে "সীতা" অভিনয় করছেন, আর সমস্ত কলকাতা বসন্ত-প্রলাপে অশোক-পলাশের মত আনন্দ-উত্তাল হয়ে উঠেছে। কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে বাণবিদ্ধ করার দরুন বাল্মীকির কণ্ঠে যে বেদনা উৎসারিত হয়েছিল, শিশিরকুমার তাকে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে বাণীময় করে তুললেন। সমস্ত কলকাতা-শহর ভেঙে পড়ল মনোমোহনে। শুধু অভিনয় দেখে লোকের তৃপ্তি নেই। রাম নয়, তারা শিশিরকুমারকে দেখবে, নরবেশে কে সে দেবতার দেহধারী, তার জয়ধ্বনি করবে, পারে তো পা স্পর্শ করে প্রণাম করবে তাঁকে।

সে সব দিনের "সীতা" জাতীয় মহাঘটনা। দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা"য় হস্তক্ষেপ করল প্রতিপক্ষ, কুছ পরোয়া নেই, যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হল নতুন বই। রচনা তো গৌণ, আসল হচ্ছে অভিনয়, দেবতার দুঃখকে মানুষের আয়তনে নিয়ে আসা, কিংবা মানুষের দুঃখকে দেবত্বমণ্ডিত করা। শিশিরকুমারের সে কি ললিতগম্ভীর রূপ, কণ্ঠস্বরে সে কি সুধাতরঙ্গ! কতবার যে "সীতা" দেখেছি তার লেখাজোখা নেই। দেখেছি অথচ মনে হয়নি দেখা হয়েছে। মনে ভাবছি, জন কিটসের মত অতৃপ্ত চোখে তাকিয়ে আছি সেই গ্রীসিয়ান আর্নের দিকে আর বলছি: A thing of Beauty is a joy for ever.

কিন্তু কেবলই কি দু-তিন টাকার ভাঙা সিটে বসে হাততালি দেব, একটিবারও কি যেতে পারব না তাঁর সাজঘরে, তাঁর অন্তরঙ্গতার রংমহলে? যাবে যে, অধিকার কি তোমার? তাঁর অগণন ভক্তের মধ্যে তুমি তো

নগণ্যতম। নিজেকে শিল্পী, স্মৃষ্টিকর্তা বলতে চাও? বলতে চাও, সেই অধিকার? তোমার শিল্পবিদ্যা কি আছে তা তো জানি, কিন্তু দেখছি বটে তোমার আস্পর্ধাটাকে। তোমাকে কে গ্রাহ্য করে? কে তোমায় তত্ত্ব নেয়?

সব মানি, কিন্তু এত বড় শিল্পাদিত্যের আশীর্বাদ পাব না এটাই বা কেমনতর?

তেরোশ বত্রিশ সালের ফাল্গুনে "বিজলী" দীনেশরঞ্জনের হাতে আসে। তার আগে সাবিত্রীপ্রসন্নের আমলেই নৃপেন "বিজলী"তে নাট্যসমালোচনা লিখত। সে সব সমালোচনা মামুলি হিজিবিজি নয়, নয় সেটা ব্যবসাদারি চোখের কটাক্ষপাত। সেটা একটা আলাদা কারুকর্ম। নৃপেন তার আবেগ-গম্ভীর ভাষায় "সীতার" প্রশস্তিরচনা করলে—সমালোচনাকে নিয়ে গেল কবিতার পর্যায়ে।

সে সব আলোচনা বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত। বলা বাহুল্য, শিশিরকুমারেরও চোখ পড়ল, কিন্তু তাঁর চোখ পড়ল লেখার উপর তত নয়, যত লেখকের উপর। নৃপেনকে তিনি বুকে করে ধরে নিয়ে এলেন।

কিন্তু শুধু শুদ্ধাভক্তির কবিতাকে কি তিনি মূল্য দেবেন? চালু কাগজের প্রশংসাপ্রচারে কিছু না-হয় টিকিট-বিক্রির সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কবিতা? কেই বা পড়ে, কেই বা অর্থ-অনর্থ নিয়ে মাথা ঘামায়? পত্রিকার পৃষ্ঠায় ফাঁক বোজাবার জন্যেই তো কবিতার সৃষ্টি। অর্থাৎ পদের দিকে থাকে বলেই তার আরেক নাম পদ্য।

জানি সবই, তবু সেদিন শিশিরকুমার তাঁর অভিনয়ে যে লোককালাতীত বেদনার ব্যঞ্জনা আনলেন তাকেই বা প্রকাশ না করে থাকতে পারি কই? সোজাসুজি শিশিরকুমারের উপর এক কবিতা

লিখে বসলাম। আর একটু সাফ-সুতরো জায়গা করে ছাপালাম "বিজলী"তে।

দীর্ঘ দুই বাহু মেলি আর্তকণ্ঠে ডাক দিলে: সীতা, সীতা, সীতা—
পলাতকা গোধূলি প্রিয়ারে,
বিরহের অস্তাচলে তীর্থযাত্রী চলে গেল ধরিত্রী-দুহিতা
অন্তহীন মৌন অন্ধকারে।
যে কান্না কেঁদেছে যক্ষ কলকণ্ঠা শিপ্রা-রেবা-বেত্রবতী-তীরে
তারে তুমি দিয়াছ যে ভাষা;
নিখিলের সঙ্গীহীন যত দুঃখী খুঁজে ফেরে বৃথা প্রেয়সীরে
তব কণ্ঠে তাদের পিপাসা।
এ বিশ্বের মর্ম্মব্যথা উচ্ছ্বসিছে ওই তব উদার ক্রন্দনে,
ঘুচে গেছে কালের বন্ধন;
তারে ডাকো—ডাকো তারে—যে প্রেয়সী যুগে-যুগে চঞ্চল চরণে
ফেলে যায় ব্যগ্র আলিঙ্গন।
বেদনার বেদমন্ত্রে বিরহের স্বর্গলোক করিলে সৃজন
আদি নাই, নাহি তার সীমা;
তুমি শুধু নট নহ, তুমি কবি, চক্ষে তব প্রত্যুষ স্বপন
চিত্তে তব ধ্যানীর মহিমা॥

শিশিরকুমারের সানন্দ ডাক এসে পৌঁছুল—সস্নেহ সম্ভাষণ। ভাগ্যের দক্ষিণমুখ দেখতে পেলাম মনে হল। দীনেশরঞ্জনের সঙ্গে সটান চলে গেলাম তাঁর সাজঘরে। প্রণাম করলাম।

নিজেই আবৃত্তি করলেন কবিতাটা। যে অর্থ হয়তো নিজের মনেও অলক্ষিত ছিল তাই যেন আরোপিত হল সেই অপূর্ব কণ্ঠস্বরের ঔদার্যে। বললেন, 'আমাকে ওটা একটু লিখে-টিখে দাও, আমি বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখে দিই এখানে।'

দীনেশরঞ্জন তাঁর চিত্রীর তুলি দিয়ে কবিতাটা লিখে দিলেন, ধারে-ধারে কিছু ছবিরও আভাস দিয়ে দিলেন হয়তো। সোনার জলে কাজ-করা ফ্রেমে বাঁধিয়ে উপহার দিলাম শিশিরকুমারকে। তিনি তাঁর ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলেন।

একটি স্বজনবৎসল উদার শিল্পমনের পরিচয় পেয়ে মন যেন প্রসার লাভ করল।

পনেরো

তারপর থেকে কখনো-সখনো গিয়েছি শিশিরকুমারের কাছে। অভিনয়ের কথা কি বলব, সহজ আলাপে বা সাধারণ বিষয়েও এমন বাচন আর কোথাও শুনিনি। যত বড় তিনি অভিনয়ে তত বড় তিনি বলনে-কথনে। তা খৃস্টধর্মের ইতিহাসই হোক বা শেকসপিয়রের নাটকই হোক বা রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যই হোক। কিংবা হোক তা কোন অন্তরঙ্গ বিষয়, প্রথমা স্ত্রীর ভালবাসা। তাঁর সেই সব কথা মনে হত যেন বিকিরিত বহ্নিকণা, কখনো বা মৃগমদবিন্দু। অভিনয় দেখে হয়তো ক্লান্তি আসে, কিন্তু মনে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাত জেগে কাটিয়ে দিতে পারি তাঁর কথা শুনে। তাতে কি শুধু পাণ্ডিত্যের দীপ্তি? তা হলে তো ঘুম পেত, যেমন উকিলের অতিক্লান্ত বক্তৃতা শুনে হাকিমের ঘুম আসে। না, তা নয়। তাতে অনুভবের গভীরতা, কবিমানসের মাধুর্য আর সেই সঙ্গে বাচনকলার সুষমা। তা ছাড়া কি মেধা, কি দীপ্তি, কি দূরবিস্তৃত স্মরণশক্তি! মুহূর্তেই বোঝা যায় বিরাট এক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছি—বৃহৎ এক বনস্পতির প্রচ্ছায়ে।

শিশিরকুমার যে কত বড় অভিনেতা, কত বড় অসাধ্যসাধক, আমার জানা-মত ছোটখাট একটি দৃষ্টান্ত আছে। সেটা আরো অনেক পরের কথা, যে বছর শিশিরবাবু তাঁর দলবল নিয়ে আমেরিকা যাচ্ছেন। আমেরিকা থেকে একটি বিদুষী মহিলা এসেছেন ভারতবর্ষে, দৈবক্রমে তাঁর সৌহার্দ লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তাঁর খুব ইচ্ছা, বাংলাদেশ থেকে যে অভিনেতা আমেরিকা যাবার সাহস করেছেন তাঁর সঙ্গে তিনি আলাপ করবেন। শিশিরকুমার তখন নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিটে

তেতলার ফ্ল্যাটে থাকেন। তাঁর কাছে গিয়ে প্রস্তাব পেশ করলাম। তিনি আনন্দিত মনে নিমন্ত্রণ করলেন সেই বিদেশিনীকে। দিন-ক্ষণ ঠিক করে দিলেন।

নির্ধারিত দিনে বিদেশিনী মহিলাকে সঙ্গে করে উঠে গেলাম তেতলায়। সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলাম না, তাই তাঁকে বললাম, 'তুমি এই বারান্দায় একটু দাঁড়াও, আমি ভিতরে খোঁজ নিই।'

ভিতরের খোঁজ নিতে গিয়ে হকচকিয়ে গেলাম। দেখি ঘরের মেঝের উপর ফরাস পাতা—আর তার উপরে এমন সব লোকজন জমায়েত হয়েছেন যাঁদের অন্তত দিনে-দুপুরে দেখা যাবে বলে আশা করা যায় না। হার্মোনিয়ম, ঘুঙুর, আরো এটা-ওটা জিনিস এখানে-ওখানে পড়ে আছে। বোধ হয় কোনো নাটকের কোনো জরুরী দৃশ্যের মহড়া চলছিল। কিন্তু তাতে আমার মাথাব্যথা কি? শিশিরবাবু কোথায়? এই কোথা নিয়ে এসেছি বিদেশিনীকে? আবার আরেকজন মিস মেয়ো না হয়!

জিগগেস করলাম, 'শিশিরবাবু কোথায়?'

খবর যা পেলাম তা মোটেই আশাবর্ধক নয়। শিশিরবাবু অসুস্থ, পাশের ঘরে নিদ্রাগত।

কঙ্কাবতী ছিলেন সেখানে। তাঁকে বললাম আমার বিপদের কথা। তিনি বললেন, বসুন, আমি দেখছি। তুলে দিচ্ছি তাঁকে।

সমস্ত ফরাসটাই তুলে দিলেন একটানে। ঘুঙুর, হার্মোনিয়ম, এটা-সেটা, সাঙ্গ আর উপাঙ্গের দল সব পিটটান দিলে। কোন জাদুকরের হাত পড়ল—চকিতে শ্রীমন্ত হয়ে উঠল ঘর-দোর। কোত্থেকে খানকয়েক চেয়ারও এসে হাজির হল। বিদেশিনীকে এনে বসালাম।

তবু ভয়, আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ যে অভিনেতা তাঁর স্পর্শ পেতে না তার ভুল হয়।

গায়ে একটা ড্রেসিং-গাউন চাপিয়ে প্রবেশ করলেন শিশিরকুমার। প্রতিভাদীপ্ত সৌম্য মুখে অনিদ্রার ক্লেশক্লান্তিও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। স্নিগ্ধ সৌজন্যে অভিবাদন করলেন সেই বিদেশিনীকে।

তারপর সুরু করলেন কথা। যেমন তার জ্যোতি তেমনি তার অজস্রতা। আমেরিকার সাহিত্যের খুঁটিনাটি—তার জীবন ও জীবনাদর্শ। আর থেকে-থেকে ভাব-সহায়ক কবিতার আবৃত্তি। সর্বোপরি এক সৃজনপিপাসু শিল্পীমনের দুর্বারতা। বিদেশিনী মহিলা অভিভূত হয়ে রইলেন।

চলে আসবার পর জিগগেস করলাম মহিলাকে: 'কেমন দেখলে?'

'চমৎকার। মহৎ প্রতিভাবান—নিঃসন্দেহ।'

ভাবি, এত মহৎ যাঁর প্রতিভা তিনি সাহিত্যের জন্যে কি করলেন? অনেক অভিনেতা তৈরি করেছেন বটে, কিন্তু একজন নাট্যকার তৈরি করতে পারলেন না কেন?

শিশিরকুমারের সান্নিধ্যে আবার একবার আসি ঢাকার দল এসে "কল্লোলে" মিশলে পরে। আগে এখন ঢাকার দল তো আসুক।

তার আগে দুজন আসে ফরিদপুর থেকে। এক জসীম উদ্দীন, আর হুমায়ুন কবির।

একেবারে সাদামাটা আত্মভোলা ছেলে এই জসীম উদ্দীন। চুলে চিরুনি নেই, জামায় বোতাম নেই, বেশবাসে বিন্যাস নেই। হয়তো বা অভাবের চেয়েও ঔদাসীন্যই বেশি। সরলশ্যামলের প্রতিমূর্তি যে গ্রাম তারই পরিবেশ তার ব্যক্তিত্বে, তার উপস্থিতিতে। কবিতায় জসীমউদ্দীনই প্রথম গ্রামের দিকে সঙ্কেত, তার চাষাভুষো, তার খেত-খামার, তার নদী-নালার দিকে। তার অসাধারণ সাধারণতার দিকে। যে দুঃখ সর্বহারার হয়েও সর্বময়। যে দৃশ্য অপজাত হয়েও উঁচু জাতের। কোনো কারুকলার কৃত্রিমতা নেই, নেই কোনো প্রসাধনের পারিপাট্য।

একেবারে সোজাসুজি মর্মস্পর্শ করবার আকুলতা। কোনো 'ইজমে'র ছাঁচে ঢালাই করা নয় বলে তার কবিতা হয়তো জনতোষিণী নয়, কিন্তু মনোতোষিণী।

এমনি একটি কবিতা গেঁয়ো মাঠের সজল-শীতল বাতাসে উড়ে আসে "কল্লোলে"।

"তোমার বাপের লাঙল-জোয়াল দু'হাতে জড়ায়ে ধরি
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিত সারা দিনমান ভরি ;
গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝরে
ফাল্গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শুনো মাঠখানি ভরে।
পথ দিয়া যেতে গেঁয়ো পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠপানে চাহি।
হাম্বারবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি।
গলাটি তাঁদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা
চোখের জলের গোরস্থানেতে ব্যথিয়ে সকল গাঁ—"

কবিতাটির নাম 'কবর'। বাংলা কবিতার নতুন দিগদর্শন। "কল্লোলের" পৃষ্ঠা থেকে সেই কবিতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষার বাংলা পাঠ-সংগ্রহে উদ্ধৃত হল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে অনভিজাত "কল্লোলের" নামটা বেমালুম চেপে গেলেন।

হুমায়ুন কবির কখনো-সখনো আসত "কল্লোলে", কিন্তু কায়েমী হয়ে পাকাতে পারেনি। নম্র, মুখচোরা—কিন্তু সমস্ত মুখ নিয়ত-হাসিতে সমুজ্জ্বল। তমোঘ্ন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় দুই চক্ষু দূরান্বেষী। কথার অন্তে তত হাসে না যত তার আদিতে হাসে ; তার মানে, তার প্রথম সংস্পর্শটুকু প্রতি মুহূর্তেই আনন্দময়। কবিরের তখন নবীন নীরদের বর্ষা,

কবিতায় প্রেমের বিচিত্রবর্ণ কলাপ বিস্তার করছে। কিন্তু মাধ্যন্দিন গাম্ভীর্যে সেই নবানুরাগের মাধুর্য কই? বয়সের ক্ষেত্রে প্রাবীণ্য আসুক, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে যেন পরিপূর্ণতা না আসে।

"কল্লোলে" এই দুইটি বিচ্ছিন্ন ধারা ছিল। এক দিকে রুক্ষ-শুষ্ক শহুরে কৃত্রিমতা, অন্যদিকে অনাঢ্য গ্রাম্য জীবনের সারল্য। বস্তি বা ধাওড়া, কুঁড়েঘর বা কারখানা, ধানখেত বা ড্রয়িংরুম। সমস্ত দিক থেকে একটা নাড়া দেওয়ার উদ্যোগ। যতটা শক্তি-সাধ্য, শুধু ভবিষ্যতের ফটকের দিকে ঠেলে এগিয়ে দেওয়া। আর তা শুধু সাহিত্যে নয়, ছবিতে। তাই একদিন যামিনী রায়ের ডাক পড়ল "কল্লোলে"। তেরোশ বত্রিশের আশ্বিনে তাঁর এক ছবি ছাপা হল—এক গ্রাম্য মা তার অনাবৃত বুকের কাছে তার শিশুসন্তানকে দুই নিবিড় হাতে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে

অপূর্ব সেই দাঁড়াবার ভঙ্গিটি। বহির্দৃষ্টিতে মার মুখটি শ্রীহীন কিন্তু একটি স্থিরলক্ষ্য স্নেহের চারুতায় অনির্বচনীয়। গ্রীবা, পিঠ ও স্তনাংশরেখার বঙ্কিমায় সেই স্নেহ দ্রবীভূত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দীন, হয়তো অশোভন, কিন্তু দুইটি কর্মকঠিন করতলের পর্যাপ্তিতে প্রকাণ্ড একটা প্রাপ্তি, আশ্চর্য একটা ঐশ্বর্য যেন সংক্ষিপ্ত হয়ে আছে। সেই তো তার শক্তি, সেই তো তার সৌন্দর্য—নিজের মাঝে এই অভাবনীয়ের আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের বিষয় তার শিশু, তার বুকের অনাবরণ। যে শিশুর এক হাত তার আনন্দিত মুখের দিকে উৎক্ষিপ্ত—তার জন্মের আলোকিত আকাশপটের দিকে।

যামিনী রায় বন্ধু ছিলেন "কল্লোলের"। পরবর্তী যুগে তিনি যে লোকলক্ষ্মীর রূপ দিয়েছেন তারই অঙ্কুরাভাস যেন ছিল এই আশ্বিনের ছবিতে।

সে-সব দিনে যেতাম আমরা যামিনী রায়ের বাড়িতে, বাগবাজারে।

অজ্ঞাত গলিতে অখ্যাত চিত্রকর—আমাদেরও তখন তাই অবাধ নিমন্ত্রণ। আত্মায় আত্মায় যোগ ছিল "কল্লোলের" সঙ্গে। শুধু অকিঞ্চনতার দিক থেকে নয়, বিদ্রোহিতার দিক থেকে। ভাঁড়ের মধ্যে রং আর বাঁশের চোঙার মধ্যে তুলি আর পোড়ো বাড়িতে স্টুডিয়ো—যামিনী রায়কে মনে হতো রূপকথার সেই নায়ক যে অসম্ভবকে সত্যভূত করতে পারে। হাজার বছরের অন্ধকার ঘর আলো করে দিতে পারে এক মুহূর্তে।

সোনা গালাবার সময় বুঝি খুব উঠে-পড়ে লাগতে হয়। এক হাতে হাপর, এক হাতে পাখা—মুখে চোঙ—যতক্ষণ না সোনা গলে। গলার পর যেই গড়ানে ঢালা, অমনি নিশ্চিন্ত। অমনি স্বর্ণস্বপ্নময়।

পূর্বতনদের মধ্যে থেকে হঠাৎ সুরেন গাঙ্গুলি মশাই এসে "কল্লোলে" জুটলেন। চিরকাল প্রবাসে থাকেন, তাই শিল্পমানসে মেকি-মিশাল ছিল না। যেখানে প্রাণ দেখেছেন, সৃষ্টির উন্মাদনা দেখেছেন, চলে এসেছেন। অগ্রবর্তীদের মধ্যে থেকে আরো কেউ-কেউ এসেছিলেন "কল্লোলে" কিন্তু ততটা যেন মিশ খাওয়াতে পারেননি। সুরেনবাবু এগিয়ে থেকেও পিছিয়ে ছিলেন না, সমভাবে অনুপ্রেরিত হলেন। "কল্লোলের" জন্যে উপন্যাস তো লিখলেনই, লিখলেন শরৎচন্দ্রের ধারাবাহিক জীবনী। সুরেনবাবু শরৎচন্দ্রের শুধু আত্মীয় নন, আবাল্য সঙ্গী-সাথী—প্রায় ইয়ারবক্সি বলা যেতে পারে। খুব একটা অন্তরঙ্গ ঘরোয়া কাহিনী, কিন্তু সাহিত্যরসে বিভাসিত।

শরৎচন্দ্রের জীবনী ছাপা হবে, কিন্তু তাঁর হালের ফটো কই? কি করে জোগাড় করা যায়? না, কি চেয়ে-চিন্তে কোথা থেকে একটা পুরোনো বয়সের ছবি এনেই চালিয়ে দেওয়া হবে? চেহারাটা যদি তরুণ-তরুণ দেখায়, বলা যাবে পাঠককে, কি করব মশাই, লেখকেরই বয়স বাড়ে, ছবি অপরিবর্তনীয়!

গম্ভীর মুখে ভূপতি বললে, 'ভাবনা নেই, আমি আছি।'

ভূপতি চৌধুরী "কল্লোলের" আদিভূত সভ্য, এবং অন্তকালীন। একাধারে গল্পলেখক, ইঞ্জিনিয়র, আবার আমাদের সকলকার ফোটোগ্রাফার। প্রফুল্ল মনের সদালাপী বন্ধু। শত উল্লাস-উত্তালতার মধ্যেও ভদ্র মার্জিত রুচির অন্তঃশীল মাধুর্যটি যে আহত হতে দেয় না। সমস্ত বিষয়ের উপরেই দৃষ্টিভঙ্গি তার বৈজ্ঞানিক, তাই তার লেখায় ও ব্যবহারে সমান পরিচ্ছন্নতা। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক ভঙ্গির অন্তরালে একটি চিরজাগ্রত কবি ভাবাকুল হয়ে রয়েছে। কঠোরের গভীরে স্বাদু সৌন্দর্যের অবতারণা।

তেরোশ একত্রিশ সালের সেই নবীনব্রতী যুবকের চিঠির কটি টুকরো এখানে তুলে দিচ্ছি :

"মানব সভ্যতাযন্ত্রের ধ্বকধ্বক ধ্বনির পীড়নে কান বধির হবার উপক্রম হয়েছে। ফানেসের লালচক্ষু, পিস্টনের প্রলয়দোলা, গভর্নরের ঘূর্নি, ফ্লাই-হুইলের টলে-পড়া, স্যাফটের আকুলিবিকুলি—প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। খুব সকালে বাড়ি থেকে উঠে সোজা সাইক্লে করে কলেজে গিয়ে কলেজ-প্রাইম-মুভার্স ল্যাবোরেটরিতে ওয়্যারলেস রেডিও সেট তৈরি করাচ্ছি—আবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসছি।

সত্যি বলছি ভাই, যখন শান্তভাবে চুপ করে শুয়ে থাকি, হয়ত আকাশের ঘন নীলিমার দিকে নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চেয়ে কত কি ভেবে যাই, একটা শান্তি আর তৃপ্তি আর পূর্ণতা প্রাণের মধ্যে অনুভব করি—মানুষের কর্ম্মজীবনের কোলাহল তখন ভাবতেও ভাল লাগে না। কিন্তু সেই কোলাহলের মাঝে মানুষ যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সে তার কাজের আনন্দে কি মত্তই না হয়ে ওঠে। এ মত্ততার ক্ষিপ্রতা আর ক্ষিপ্ততার মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বেগ আছে, সে-বেগে মেঘে-মেঘে সংঘর্ষ হয়, বিদ্যুৎ ফেটে পড়ে। তারপর আবার অন্ধকারের করালী লীলা প্রকট

হয়ে ওঠে। বুঝতে পারি না কি ভালো লাগে—এই উন্মত্ত দুর্দ্দাম বেগ না শান্ত-স্থির আত্মসমাধি? কলের বাঁশির তীব্র দৃঢ় আহ্বান, না, মনোবাঁশরীর রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বেজে-ওঠা ব্যাকুল ক্রন্দন? লোকারণ্য, না নির্জ্জনতা? বিদ্রোহ না স্বীকৃতি?

সব দেখি আর কি মনে হয় জান? বণিক সভ্যতার বাহ্য আড়ম্বর আর সমারোহের ট্রাজেডি যতই চোখের সামনে প্রকট হয়ে উঠুক না, মাটির ভাঁড়ে ওষ্ঠপরশ দিয়ে মাতাল হবার প্রবৃত্তি হয় না। সোনার পেয়ালা চাই। সোনার রঙেই মানুষ পাগল হয়ে ওঠে, মদের নেশায় নয়। মদ খেয়ে মানুষ কতটুকু মাতাল হতে পারে? তাকে মাতাল করতে হলে ঐ মদকে সোনার পেয়ালায় ঢেলে রূপার স্বপনের ছোঁয়াচ দিতে হবে।...

তোমার চিঠির প্রত্যেকটা অক্ষর, তার এক-একটি টান আমার মনকে টেনে রেখেছে। আকাশ ভরে মেঘ করেছে আজ। কী কালো জমাট আঁধার—যেন ভীষণতা শত্রুর প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল হয়ে। এরই মধ্যে তোমার একটা কথার উত্তর খুঁজে পেয়েছি। কবিত্ব সে খালি ফুলের অম্লান হাসিটুকু দেখে, চাঁদের অফুরন্ত সুধাস্রোতে ভেসে বা নদীর চিরন্তনী কলধ্বনি শুনেই উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেনা। রণক্ষেত্রের রক্তস্রোতের ধারায় মৃতদেহের স্তূপীকৃত পাহাড়ের মাঝে প্রেতভৈরবের অট্টহাসির ভীমরোলে, ভল্লখড়্গশল্যশূলের উদ্যত অগ্রে, অমানিশার গাঢ় অন্ধকারেও সে বিকশিত হয়। যিনি অন্নপূর্ণা তিনিই আবার ভীমা ভীমরোলা নৃমুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা।...

অচিন, খুব একটা পুরানো কথা আমার মনে পড়ছে। সাথী হচ্ছে মানুষেরই মুকুরের মত। তাদেরই মধ্যে নিজের খানিকটা দেখা যায়। তাই যখন তোমাকে প্রেমেনকে শৈলজাকে গোকুলবাবু D. R. নৃপেন পবিত্রকে দেখি তখনই মনে খানিকটা হর্ষ জেগে ওঠে। নিজেকে খানিকটা-

খানিকটা দেখার আনন্দ তখন অসীম হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, সবায়ের খবর দেব। D. R. পাবলিশিং নিয়ে খুব উঠে-পড়ে লেগেছেন। G. C. আসেন, সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে চলে যান। শৈলজা মাঝে-মাঝে আসেন, বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে একটা সেই বাঁকা চোখের চাউনি ছুঁড়ে চলে যান, কথা বড় কন না। পবিত্র ঠিক তেমনি ভাবে আসে যায় হাসে বকে, আপনার খেয়ালে চলে। ওকে দেখলে মনে হয় যেন স্বতস্ফূর্ত্ত প্রাণধারা। আর নৃপেন? ঠিক আগেরই মতো ধূমকেতুর আসা-যাওয়ার ছন্দে চলে...

পুরুলিয়ায় ক্যাম্প করতে এসেছি কলেজ থেকে। তোমার লেখার তালিকা দেখে আমার হিংসে হচ্ছে। আমি তো লেখা ছেড়ে দিয়েছি বল্লেই হয়—তবে আজকাল আর একটা জিনিস ধরেছি সেটা হচ্ছে বিশ্রাম করা। চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকি। দূরে অনেকখানি নীচুতে ধানের ক্ষেতের সবুজ শীষের দোলায়মান বর্ণবিভ্রাট ভারি চমৎকার লাগে কখনও। অনেক দূরে ঠিক স্বপ্নের ছায়ার মতো একটা পাহাড়ের সারির নীল রেখা সারা দিনরাত জেগে আছে চোখের উপর।

এখানে একটি মেয়ের ছবি তুললাম সেদিন। ভারি সুন্দর মেয়েটি, কিন্তু তার সেই চপল ভঙ্গিটিকে ধরতে পারিনি। সেটুকু কোথায় পালিয়ে গেছে। যন্ত্র তার ক্ষমতায় সব আয়ত্ত করেছে বটে, কিন্তু সে প্রাণের ছায়া ধরতে পারে না—"

এক রোদে-পোড়া দুপুরে বাজে-শিবপুর যাওয়া হল শরৎচন্দ্রের ছবি তুলতে। ক্যামেরাধারী ভূপতি। মারুন-ধরুন তাড়ান-খেদান, ছবি একটা তাঁর তুলে আনতে হবেই। কিন্তু যদি গা-ঢাকা দিয়ে একেবারে লুকিয়ে থাকেন চুপচাপ? যদি বলেন, বাড়িতে নেই!

খুব হৈ-হল্লা করলে শেষ পর্যন্ত কি না বেরিয়ে পারবেন?

অন্তত বকা-ঝকা করতে তো বেরুবেন একবার! অতএব খুব কড়া করে কড়া নাড়ো। কড়া যখন রয়েছে নাড়বার জন্যেই রয়েছে, যতক্ষণ না হাতে কড়া পড়ে। 'ভেলি'র চীৎকারে বিহ্বল হলে চলবে না।

দরজা খুলে দেখা দিলেন শরৎচন্দ্র। দুপুরের রোদের মত ঝাঁজালো নয়, শরচ্চন্দ্রের মতই স্নেহশীল। শুভ্রোজ্জ্বল সৌজন্যে আহ্বান করলেন সবাইকে। কিন্তু প্রাথমিক আলাপের পর আসল উদ্দেশ্য কি টের পেয়ে পিছিয়ে গেলেন। বললেন, 'খোলটার ছবি তুলে কি হবে?'

কিছুই যে হবে না শুধু একটা ছবি হবে এই তাঁকে বহু যুক্তি-তর্ক প্রয়োগ করে বোঝানো হল। তিনি রাজি হলেন। আর রাজিই যদি হলেন তবে তাঁর একটা লিখনরত ভঙ্গি চাই। তবে নিয়ে এস নিচু লেখবার টেবিল, গড়গড়া, মোটা ফাউন্টেন-পেন আর ডাব-মার্কা লেখবার প্যাড। পাশে বইয়ের সারি, পিছনে পৃথিবীর মানচিত্র। যা তাঁর সাধারণ পরিমণ্ডল। ডান হাতে কলম ও বাঁ হাতে সটকা নিয়ে শরৎচন্দ্র নত চোখে লেখবার ভঙ্গি করলেন। ভূপতির হাতে ক্যামেরা ক্লিক করে উঠল।

আজ সেই ছবিটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি। শরৎচন্দ্রের খুব বেশি ছবি আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু "কল্লোলের" পৃষ্ঠায় এটি যা আছে, তার তুলনা নেই। পরবর্তী যুগের ক'জন প্রতিষ্ঠাপ্রতিপত্তিহীন নতুন লেখকের সঙ্গে তিনি যে তাঁর আত্মার নিবিড়নৈকট্য অনুভব করেছিলেন তারই স্বীকৃতি এ ছবিতে সুস্পষ্ট হয়ে আছে। কমনীয় মুখে কি স্নেহ কি করুণা! এ একজন দেশদিকপতির ছবি নয়, এ একজন ঘরোয়া আত্মীয়-অন্তরঙ্গের ছবি! নিজের হাতে ছবিতে দস্তখৎ করে সজ্ঞানে যোগস্থাপন করে দিলেন। বললেন, 'কিন্তু জেনো, সবাই আমরা সেই রবীন্দ্রনাথের। গঙ্গারই ঢেউ হয়, ঢেউয়ের কখনো গঙ্গা হয় না।'

এমনি ধরনের কথা তিনি আরো বলেছেন। তারই একটা বিবরণ তেরোশ তেত্রিশের জ্যৈষ্ঠের "কল্লোলে" ছাপা আছে :

'হাওড়া কি অন্য কোথায় ঠিক মনে নেই, একটা ছোট-মতন সাহিত্য সম্মিলনে আমাকে একজন বললেন, আপনি যা লেখেন তা বুঝতে আমাদের কোনো কষ্ট হয় না, আর বেশ ভালোও লাগে। কিন্তু রবিবাবুর লেখা মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না—কি যে তিনি লেখেন তা তিনিই জানেন। ভদ্রলোকটি ভেবেছিলেন তাঁর এই কথা শুনে নিজেকে অহংকৃত মনে করে আমি খুব খুশি হব। আমি উত্তর দিলুম, রবিবাবুর লেখা তোমাদের তো বোঝবার কথা নয়। তিনি তো তোমাদের জন্যে লেখেন না। আমার মত যারা গ্রন্থকার তাদের জন্যে রবিবাবু লেখেন, তোমাদের মত যারা পাঠক তাদের জন্যে আমি লিখি।'

এ বিবরণটি সংগ্রহ করে আনেন সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু। সংগ্রহ করে আনেন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ থেকে। কানপুরে প্রবাসী বাঙালিদের সাহিত্য-সম্মিলনে তাঁকে সভাপতি করে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে গিয়েছিল সত্যেন। শরৎচন্দ্র তখন আর শিবপুরে নন, চলে গেছেন রূপনারানের ধারে, কিন্তু তা হলেও অপরিচিত অভ্যাগতকে সংবর্ধনা করতে এতটুকু তাঁর অন্যথা নেই।

কিন্তু সত্যেনের কথাটাই বলি। এতবড় মহার্ঘ প্রাণ আর কটা দেখেছি আশে-পাশে? সত্যেন সাহিত্যিক নয়, জার্নালিস্ট, কিন্তু সাহিত্যরসবুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ-তৎপর। প্রত্যহের জীবনের সঙ্গে শুধু খবরের কাগজের সম্বন্ধ—তেমন জীবনে সে বিশ্বাসী নয়। মানুষের সম্বন্ধে সমস্ত খবর শেষ হয়ে যাবার পরেও যে একটা অলিখিত খবর থাকে তারই সে জিজ্ঞাসু। যতই কেননা খবর শুনুক, আসল সংবাদটি জানবার জন্যে সে অলক্ষিতে একেবারে অন্তরের মধ্যে এসে বাসা নেয়। আর অন্তরে প্রবেশ

করবার পক্ষে কোন মুহূর্তটি নিভৃত-প্রশস্ত তা খুঁজে নিতে তার দেরি হয় না।

প্রেমরসোচ্ছলিত প্রতপ্ত প্রাণ। সুগঠিত স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ চেহারা—সুচারুদর্শন প্রাণখোলা প্রবল হাসিতে নিজেকে প্রসারিত করে দিত চারপাশে। "কল্লোলের" দল যখন হোলির হল্লায় রাস্তায় বেরুত তখন সত্যেনকে না হলে যেন ভরা-ভরতি হত না। "কল্লোলের" প্রতি এই তার অনুরাগের রং সে তার চারপাশের কাগজেও বিকীর্ণ করেছে। বালিতে-চিনিতে মিশেল সব লেখা। খরদূষণ সমালোচকের দল বালি বেছেছে, আর সত্যেনের মত যারা সত্যসন্ধ সমালোচক—তারা রচনা কবেছে চিনির নৈবেদ্য। সে সব দিনে কল্লোলদলের পক্ষে প্রচারণের কোনো পত্রিকা-পুস্তিকা ছিলনা, তদবির করে সভায় সভাপতিত্ব নিয়ে নিজের পেটোয়াদের বা নিজের পাবলিশিং হাউসের বিজ্ঞাপন দেবার দুর্নীতি তখনো আসেনি বাংলা-সাহিত্যে। সম্বল শুধু আত্মবল আর সত্যেনের সুভাষিতাবলী। কলকাতার সমস্ত দৈনিক-সাপ্তাহিক তার আয়ত্তের মধ্যে, দিকে-দিকে সে লিখে পাঠাল আধুনিকতার মঙ্গলাচরণ। দেখা গেল দায়িত্ববোধযুক্ত এমন সব পত্র-পত্রিকাও আছে যারা কল্লোলের দলকে অনুমোদন করে, অভিনন্দন জানায়! সেই বালির বাঁধ কবে নস্যাৎ হয়ে গেল, কিন্তু চিনির স্বাদটুকু আজও গেল না।

চক্ষের পলকে চলে গেল সত্যেন। বিখ্যাত সংবাদপরিবেশক প্রতিষ্ঠানে উঠে এসেছিল উচ্চ পদে। কিন্তু সমস্ত উচ্চের চেয়েও যে উচ্চ, একদা তারই ডাক এসে পৌছুল। আপিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে এসে স্ত্রীকে বললে, 'খেতে দাও, খিদে পেয়েছে।'

বলে পোশাক ছাড়তে গেল সে শোবার ঘরে। স্ত্রী ত্বরিত হাতে খাবার তৈরি করতে লাগল। খাবার তৈরি করে স্ত্রী দ্রুত পায়ে চলে এল রান্নাঘর থেকে। শোবার ঘরে ঢুকে দেখে সত্যেন পুরোপুরি

পোশাক তখনো ছাড়েনি। গায়ের কোটটা শুধু খুলেছে, আর গলার টাইটা আধ-খোলা। এত শ্রান্ত হয়েছে যে আধ-শোয়া ভঙ্গিতে শরীর এলিয়ে দিয়েছে বিছানায়।

'ও কি, শুয়ে পড়লে কেন? তোমার খাবার তৈরি। ওঠো।'

কে কাকে ডাকে! বেশত্যাগ করবার আগেই বাসত্যাগ করেছে সত্যেন।

আবার নতুন করে আঘাত বাজে যখন ভাবি সেই সৌম্যাং সৌম্য হাস্যদীপ্ত মুখ আর দেখব না। কিন্তু কাকেই বা বলে দেখা কাকেই বা বলে দেখতে-না পাওয়া! মাটি থেকে পুতুল তৈরি হয় আবার তা ভাঙলে মাটি হয়ে যায়। তেমনি যেখান থেকে সব আসছে আবার সেখানেই সব লীন হচ্ছে। লীন হচ্ছে সব দেখা আর না-দেখা, পাওয়া আর না-পাওয়া।

সত্যেনের মতই আরেকটি প্রিয়দর্শন ছেলে—বয়সে অবিশ্যি কম ও কায়ায়ও কিঞ্চিৎ কৃশতর—একদিন চলে এল "কল্লোলের" কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিটের দোকানে। তার আগে তার একটি কবিতা বেরিয়েছিল হয়তো "কল্লোলে"—"নিকষ কালো আকাশ তলে," হয়তো বা সেই পরিচয়ে। এল বটে কিন্তু কেমন যেন একা-একা বোধ করতে লাগল। তার সঙ্গী তার বন্ধুকে যেন কোথায় সে ছেড়ে এসেছে, তাই স্বস্থ-সুস্থ হতে পারছে না। চোখে ভয় বটে, কিন্তু তারো চেয়ে বেশি, সে-ভয়ে বিস্ময় মেশানো। আর যেটি বিস্ময় সেটি সর্বকালের কবিতার বিস্ময়। যেটি বা রহস্য সেটি সর্বকালের রুচির-রম্যতার রহস্য।

সত্যেনের সঙ্গে অজিতকুমার দত্তের নাম করছি, তারা একসময় একই বাসার বাসিন্দে ছিল। আর অজিতের নাম করতে গিয়ে বুদ্ধদেবের নাম আনছি এই কারণে তারা একে-অন্যের পরিপূরক ছিল,

আর তাদের লেখা একই সঙ্গে একই সংখ্যায় বেরিয়েছিল "কল্লোলে"।

বুদ্ধদেবকে দেখি প্রথম কল্লোল-আপিসে। ছোটখাট মানুষটি, খুব সিগারেট খায় আর মুক্ত মনে হাসে। হাসে সংসারের বাইরে দাঁড়িয়ে, কোনো ছলাকলা কোনো বিধি-বাধা নেই। তাই এক নিশ্বাসেই মিশে যেতে পারল "কল্লোলের" সঙ্গে—এক কালস্রোতে। চোখে মুখে তার যে একটি সলজ্জতার ভাব সেটি তার অন্তরের পবিত্রতার ছায়া, অকপট স্ফটিকস্বচ্ছতা। বড় ভাল লাগল বুদ্ধদেবকে। তার অনতিবর্ধ শরীরে কোথায় যেন একটা বজ্রকঠোর দার্ঢ্য লেখা রয়েছে, অনমনীয় প্রতিজ্ঞা, অপ্রমেয় অধ্যবসায়। যখন শুনলাম ভবানীপুরেই উঠেছে, একসঙ্গে এক বাসএ ফিরব, তখনই মনে-মনে অন্তরঙ্গ হয়ে গেলাম।

বললাম, 'গল্প লেখা আছে আপনার কাছে?'

এর আগে বত্রিশের ফাল্গুনের "কল্লোলে" সুকুমার রায়ের উপরে সে একটা প্রবন্ধ লিখেছে। বাংলাদেশে সেটাই হয়তো প্রথম প্রবন্ধ যেটাতে সুকুমার রায়কে সত্যিকার মূল্য দেবার সৎচেষ্টা হয়েছে। 'আবোলতাবোলের' মধ্যে শ্লেষ যে কতটা গভীর ও দূরগত তারই মৌলিক বিশ্লেষণে সমস্তটা প্রবন্ধ উজ্জ্বল। প্রবন্ধের গদ্য যার এত সাবলীল তার গল্পও নিশ্চয়ই বিস্ময়কর।

'আছে।' একটু যেন কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বর।

'দিন না কল্লোলে।'

তবুও যেন প্রথমটা বিস্ফারিত হল না বুদ্ধদেব। বাংলাসাহিত্যে তখন একটা কথা নতুন চালু হতে সুরু করেছে। সেই কথাটারই সে উল্লেখ করলে: 'গল্পটা হয়তো মর্বিড।'

'হোক গে মর্বিড। কোনটা রুগ্ন কোনটা স্বাস্থ্যসূচক কোন বিশারদ তা নির্ণয় করবে। আপনি দিন। নীতিধ্বজদের কথা ভাববেন না।'

উৎসাহের আভা এল বুদ্ধদেবের মুখে।

বললাম, 'নাম কি গল্পের?'

'নামটি সুন্দর।'

'কি?'

'রজনী হল উতলা।'

ষোলো

"মনে হ'ল প্রকৃতি চলতে-চলতে যেন হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে গেছে—যেন উৎসুক আগ্রহে কার প্রতীক্ষা করছে। নাটকের প্রথম-অঙ্কের যবনিকা উঠবার আগ-মুহূর্ত্তে দর্শকরা কেমন হঠাৎ স্থির, নিঃশব্দ হয়ে যায়, সমস্ত প্রকৃতিও যেন এক নিমেষে সেইরূপ নিঃসাড় হয়ে গেছে। তারাগুলো আর ঝিকিমিকি খেলছে না, গাছের পাতা আর কাঁপচে না, রাতে যে সমস্ত অদ্ভুত, অকারণ শব্দ চারদিক থেকে আসতে থাকে, তা যেন কার ইঙ্গিতে মৌন হয়ে গেছে, নীল আকাশের বুকে জ্যোছনা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে—এমন কি বাতাসও যেন আর চলতে না পেরে ক্লান্ত পশুর মত নিস্পন্দ হয়ে গেছে—অমন সুন্দর, অমন মধুর, অমন ভীষণ নীরবতা, অমন উৎকট শান্তি আর আমি দেখিনি। আমি নিজের অজানতে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলুম—কেউ আসবে বুঝি?

অমনি আমার ঘরের পর্দ্দা সরে গেল। আমার শিয়রের উপর যে একটু চাঁদের আলো পড়েছিল তা যেন একটু নড়ে-চড়ে সহসা নিবে গেল—আমি যেন কিছু দেখছি না, শুনছি না, ভাবছি না—এক তীব্র মাদকতার ঢেউ এসে আমাকে ঝড়ের বেগে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তারপর...

তারপর হঠাৎ আমার মুখের উপর কি কতগুলো খসখসে জিনিস এসে পড়ল—তার গন্ধে আমার সর্ব্বাঙ্গ রিমঝিম করে উঠল। প্রজাপতির ডানার মত কোমল দুটি গাল, গোলাপের পাপড়ির মত দুটি ঠোঁট, চিবুকটি কি কমনীয় হয়ে নেমে এসেছে, চারুকণ্ঠটি কি মনোরম,

অশোকগুচ্ছের মত নমনীয়, স্নিগ্ধ শীতল দুটি বক্ষ—কি সে উত্তেজনা, কি সর্ব্বনাশা সেই সুখ—তা তুমি বুঝবে না, নীলিমা!

তারপর ধীরে ধীরে দুখানি বাহু লতার মত আমাকে বেষ্টন করে ধরে যেন নিজেকে পিষে চূর্ণ করে ফেলতে লাগল—আমার সারা দেহ থেকে-থেকে কেঁপে উঠতে লাগল—মনে হল আমার দেহের প্রতি শিরা বিদীর্ণ করে রক্তের স্রোত বুঝি এখুনি ছুটতে থাকবে!

আমার মনের মধ্যে তখনো কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল—এ কে? কোনটি? এ, ও, না, সে? তখন সব নামগুলো জপমালার মত মনে-মনে আউড়ে গেছলুম, কিন্তু আজ একটিও নাম মনে নেই। সুইচ টিপবার জন্যে হাত বাড়াতেই আরেকটি হাতের নিষেধ তার উপর এসে পড়ল।

তোমার মুখ কি দেখাবে না?

চাপা গলায় উত্তর এল—তার দরকার নেই।

কিন্তু ইচ্ছে করছে যে!

তোমার ইচ্ছা মেটাবার জন্যেই তো আমার সৃষ্টি! কিন্তু ঐটি বাদে।

কেন? লজ্জা?

লজ্জা কিসের? আমি তো তোমার কাছে আমার সমস্ত লজ্জা খুইয়ে দিয়েছি।

পরিচয় দিতে চাও না?

না। পরিচয়ের আড়ালে এ রহস্যটুকু ঘন হয়ে উঠুক।

আমার বিছানায় তো চাঁদের আলো এসে পড়েছিল—

আমি জানালা বন্ধ করে দিয়েছি।

ও! কিন্তু আবার তা খুলে দেওয়া যায়!

তার আগে আমি ছুটে পালাব।

যদি ধরে রাখি?

পারবে না।

জোর?

জোর খাটবে না।

একটু হাসির আওয়াজ এল। শীর্ণ নদীর জল যেন একটুখানি কূলের মাটি ছুঁয়ে গেল।

তুমি যেটুকু পেয়েছ, তা নিয়ে কি তুমি তৃপ্ত নও?

যা চেয়ে নিইনি, অর্জন করিনি, দৈবাৎ আশাতীতরূপে পেয়ে গেছি, তা নিয়ে তো তৃপ্তি-অতৃপ্তির কথা ওঠে না।

তবু?

তোমার মুখ দেখতে পাওয়ার আশা কি একেবারেই বৃথা?

নারীর মুখ কি শুধু দেখবার জন্যেই?

না, তা হবে কেন? তা যে অফুরন্ত সুধার আধার।

তবে?

আমি হার মানলুম।...

নীলিমা বললে, এইখানেই কি তোমার গল্প শেষ হল?

মাস্টারের কাছে ছাত্রের পড়া-বলার মত করে জবাব দিলুম—না, এইখানে সবে সুরু হল! কিন্তু এর শেষেও কিছু নেই—এই শেষ ধরতে পারো।...

পরের দিন সকালে আমার কি লাঞ্ছনাটাই না হল! রোজকার মত ওরা সব চারদিক থেকে আমায় ঘিরে বসল—রোজকার মত ওদের কথার স্রোত বইতে লাগল জলতরঙ্গের মত মিষ্টি সুরে, ওদের হাসির রোল ঘরের শান্ত হাওয়াকে আকুল করে ছুটতে লাগল, হাত নাড়বার সময় ওদের বালা-চুড়ির মিঠে আওয়াজ রোজকার মতই বেজে উঠল—সবাকার মুখই ফুলের মত রূপময়, মধুর মত লোভনীয়! কিন্তু আমার কণ্ঠ মৌন, হাসির উৎস অবরুদ্ধ। গত রাত্রির চিহ্ন আমার মুখে

আমার চোখের কোণে লেগে রয়েছে মনে করে আমি চোখ তুলে কারো পানে তাকাতে পারছিলুম না। তবু লুকিয়ে-লুকিয়ে প্রত্যেকের মুখ পরীক্ষা করে দেখতে লাগলুম—যদি বা ধরা যায়! যখন যাকে দেখি, তখনই মনে হয় এই বুঝি সেই! যখনি যার গলার স্বর শুনি, তখনই মনে হয়, কাল রাত্রিতে এই কণ্ঠই না ফিসফিস করে আমায় কত কি বলছিল! অথচ কারো মধ্যেই এমন বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখলুম না, যা দেখে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায়! সবাই হাসচে, গল্প করচে। কে? কে তা হলে?…

ভেবেছিলুম সমস্ত রাত জেগে থাকতে হবে। মনের সে অবস্থায় সচরাচর ঘুম আসে না। কিন্তু অত্যন্ত উত্তেজনার ফলেই হোক বা পায়ে হেঁটে সারাদিন ঘুরে বেড়ানোর দরুন শারীরিক ক্লান্তিবশতই হোক, সন্ধ্যার একটু পরেই ঘুমে আমার সারা দেহ ভেঙে গেল—একেবারে নবজাত শিশুর মতই ঘুমিয়ে পড়লুম। তারপর আবার আস্তে-আস্তে ঘুম ভেঙে গেল—আবার প্রকৃতির সেই স্থির, প্রতীক্ষমান, নিষ্কম্প অবস্থা দেখতে পেলুম—আবার আমার ঘরের পর্দ্দা সরে গেল—বাতাস সৌরভে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল—জ্যোছনা নিবে গেল—আবার দেহের অণুতে-অণুতে সেই স্পর্শসুখের উন্মাদনা—সেই মধুময় আবেশ—সেই ঠোঁটের উপর ঠোঁট ক্ষইয়ে ফেলা—সেই বুকের উপর বুক ভেঙে দেওয়া—তারপর সেই স্নিগ্ধ অবসাদ—সেই গোপন প্রেমগুঞ্জন—তারপর ভোরবেলায় শূন্য বিছানায় জেগে উঠে প্রভাতের আলোর সাথে দৃষ্টিবিনিময়—"

এই 'রজনী-হল-উতলা'! হালের মাপকাঠিতে হয়তো ফিকে, পানসে। কিন্তু এরই জন্যে সেদিন চারদিকে তুমুল হাহাকার পড়ে গেল—গেল, গেল, সব গেল—সমাজ গেল, সাহিত্য গেল, ধর্ম গেল, সুনীতি গেল! অনৈকা সম্ভ্রান্ত মহিলা পত্রিকায় প্রতিবাদ ছাপলেন—

শ্লীলতার সীমা মানলেন না, দাওয়াই বাতলালেন লেখককে। লেখক যদি বিয়ে না করে থাকে তবে যেন অবিলম্বে বিয়ে করে, আর বউ যদি সম্প্রতি বাপের বাড়িতে থাকে তবে যেন আনিয়ে নেয় চটপট। তৃতীয় বিকল্পটা কিন্তু ভাবলেন না। অর্থাৎ লেখক যদি বিবাহিত হয় আর স্ত্রী যদি সন্নিহিতা হয়েও বিমুখা থাকে তা হলে কর্তব্য কি? সেই কর্তব্য নির্দেশ করলেন আরেকজন সম্ভ্রান্ত মহিলা—প্রায় সম্রাজ্ঞী-শ্রেণীর। তিনি বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন, আঁতুড়ঘরেই এ সব লেখকদের নুন খাইয়ে মেরে ফেলা উচিত ছিল। নির্মলীকরণ নয়, এ একেবারে নির্মূলীকরণ।

আগুনে ইন্ধন জোগাল আমার একটা কবিতা—'গাব আজ আনন্দের গান', 'রজনী-হল-উতলা'র পরের মাসেই ছাপা হল "কল্লোলে":

মৃন্ময় দেহের পাত্রে পান করি তপ্ত তিক্ত প্রাণ
গাব আজ আনন্দের গান।
বিশ্বের অমৃতরস যে আনন্দে করিয়া মন্থন
গড়িয়াছে নারী তার স্পর্শোদ্বেল তপ্ত পূর্ণ স্তন;
লাবণ্যললিততনু যৌবনপুষ্পিত পূত অঙ্গের মন্দিরে
রচিয়াছে যে আনন্দ কামনার সমুদ্রের তীরে
সংসার-শিয়রে—
যে আনন্দ আন্দোলিত সুগন্ধনন্দিত স্নিগ্ধ চুম্বনতৃষ্ণায়
বঙ্কিম গ্রীবার ভঙ্গে, অপাঙ্গে, জঙ্ঘায়,
লীলায়িত কটিতটে, ললাটে ও কটু ভ্রূকুটিতে
চম্পা-অঙ্গুলিতে—
পুরুষপীড়নতলে যে আনন্দে কম্প্র মুহ্যমান
গাব সেই আনন্দের গান।

যে আনন্দে বক্ষে বাজে নব নব দেবতার পদনৃত্যধ্বনি
যে আনন্দে হয় সে জননী ॥

যে আনন্দে সতেজ প্রফুল্ল নর দম্ভদৃপ্ত নির্ভীক বর্বর
ব্যাকুল বাহুর বন্ধে কুন্দকান্তি সুন্দরীরে করিছে জর্জর,
শক্তির উৎসব নিত্য যে আনন্দে স্নায়ুতে শিরায়
যে আনন্দ সম্ভোগস্পৃহায়—
যে আনন্দে বিন্দু বিন্দু রক্তপাতে গড়িছে সন্তান
গাব সেই আনন্দের গান ॥

পরের মাসে বেরোল যুবনাশ্বর 'পটলডাঙার পাঁচালি', যার কুশীলব হচ্ছে কুঠে বুড়ি, নফর, ফকরে, সদি, গুবরে, মুলো আর থেঁদি পিসি; স্থান পটলডাঙার ভিখিরি পাড়া, প্যাচপেচে পাঁকের মধ্যে হোগলার কুঁড়ে ঘর। আর কথাবার্তা, যেমনটি হতে হয়, একান্ত অশাস্ত্রীয়। তারপরে, তত দিনে, তেরোশ তেত্রিশ সালের বৈশাখে, "কালি-কলম" বেরিয়ে গেছে—তাতে 'মাধবী প্রলাপ' লিখেছে নজরুল:

আজ লালসা-আলস-মদে বিবশা রতি
শুয়ে অপরাজিতায় ধনী স্মরিছে পতি।
তার নিধুবন—উন্মন
ঠোঁটে কাঁপে চুম্বন
বুকে পীন যৌবন
উঠিছে ফুঁড়ি,
মুখে কাম কণ্টক ব্রণ মহুয়া-কুঁড়ি।

করে বসন্ত বনভূমি সুরত কেলি
পাশে কাম-যাতনায় কাঁপে মালতী বেলি।

ঝুরে আলু-থালু কামিনী
জেগে সারা যামিনী,
মল্লিকা ভামিনী
অভিমানে ভার,
কলি না-ছুঁতেই ফেটে পড়ে কাঁঠালি চাঁপার।

আসে ঋতুরাজ, ওড়ে পাতা জয়ধ্বজা
হ'ল অশোক শিমুলে বন পুষ্পরজা।
তার পাংশু চীনাংশুক
হল রাঙা কিংশুক
উৎসুক উন্মুখ
যৌবন তার
যাচে লুণ্ঠন-নির্মম দস্যু তাতার।

দূরে শাদা মেঘ ভেসে যায়—শ্বেত সারসী
ওকি পরীদের তরী, অপ্সরী-আরশী ?
ওকি পাইয়া পীড়ন-জ্বালা
তপ্ত উরসে বালা
শ্বেতচন্দন লালা
করিছে লেপন ?
ওকি পবন খসায় কার নীবিবন্ধন ?"

এততেও ক্ষান্তি নেই। কয়েক মাস যেতে না যেতেই "কালি-কলমে" নজরুল আরেকটা কবিতা লিখলে—'অনামিকা'। নামের সীমানায় নেই অথচ কামের মহিমায় বিরাজ করছে যে বিশ্বরমা তারই স্তবগান।

"যা কিছু সুন্দর হেরি করেছি চুম্বন
যা কিছু চুম্বন দিয়া করেছি সুন্দর—

সে সবার মাঝে যেন তব হরষণ
অনুভব করিয়াছি। ছুঁয়েছি অধর
তিলোত্তমা, তিলে-তিলে! তোমারে যে করেছি চুম্বন
প্রতি তরুণীর ঠোঁটে। প্রকাশ-গোপন।....
তরু, লতা, পশু-পাখী, সকলের কামনার সাথে
আমার কামনা জাগে, আমি রমি বিশ্বকামনাতে!
বঞ্চিত যাহারা প্রেমে, ভুঞ্জে যারা রতি,
সকলের মাঝে আমি—সকলের প্রেমে মোর গতি!
যেদিন স্রষ্টার বুকে জেগেছিল আদি সৃষ্টি-কাম,
সেই দিন স্রষ্টা সাথে তুমি এলে, আমি আসিলাম।
আমি কাম তুমি হলে রতি
তরুণ-তরুণী বুকে নিত্য তাই আমাদের অপরূপ গতি!....
বারে-বারে পাইলাম—বারে-বারে মন যেন কহে—
নহে এ সে নহে!
কুহেলিকা! কোথা তুমি? দেখা পাব কবে?
জন্মেছিলে, জন্মিয়াছ, কিম্বা জন্ম লবে?"

চূড়া স্পর্শ করল বুদ্ধদেবের কবিতা, 'বন্দীর বন্দনা'—ফাল্গুনের "কল্লোলে" প্রকাশিত :

"বাসনার বক্ষমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন
দুর্দ্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষ বর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গারের হিয়া
রমণী-রমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি।
তাদের মিটাতে হয় আত্মবঞ্চনার নিত্য ক্ষোভ।
আছে ক্রূর স্বার্থদৃষ্টি, আছে মূঢ় স্বার্থপর লোভ,
হিরণ্ময় প্রেমপাত্রে হীন হিংসাসর্প গুপ্ত আছে;

আনন্দ-নন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন
জিঘাংসার কুটিল কুঞ্চিতা।…
জ্যোতির্ময়, আজি মম জ্যোতিহীন বন্দীশালা হতে
বন্দনা-সঙ্গীত গাহি তব।
স্বর্গলোভ নাহি মোর, নাহি মোর পুণ্যের সঞ্চয়
লাঞ্ছিত বাসনা দিয়া অর্ঘ্য তব রচি আমি আজি
শাশ্বত সংগ্রামে মোর বিক্ষত বক্ষের যত রক্তাক্ত ক্ষতের বীভৎসতা
হে চিরসুন্দর, মোর নমস্কার সহ লহ আজি।

বিধাতা, জানোনা তুমি কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।
না হয় ডুবিয়া আছি ক্লমি-ঘন পঙ্কের সাগরে
গোপন অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষ্ণায়
শুষ্ক হয়ে আছে তবু।
না হয় রেখেছ বেঁধে; তবু, জেনো, শৃঙ্খলিত ক্ষুদ্র হস্ত মোর
উধাও আগ্রহভরে ঊর্দ্ধ নভে উঠিবারে চায়
অসীমের নীলিমারে জড়াইতে ব্যগ্র আলিঙ্গনে।…
তুমি মোরে দিয়েছ কামনা, অন্ধকার অমা-রাত্রি সম
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্নসুধা মম।…
তুমি যারে সৃজিয়াছ, ওগো শিল্পী, সে তো নহি আমি
সে তোমার দুঃস্বপ্ন দারুণ,
বিশ্বের মাধুর্য-রস তিলে-তিলে করিয়া চয়ন
আমারে রচেছি আমি; তুমি কোথা ছিলে অচেতন
সে মহা-সৃজনকালে—তুমি শুধু জান সেই কথা।

এত সব ভীষণ দুষ্কাণ্ড, এর প্রতিকার কি? সাহিত্য কি ছারেখারে

যাবে, সমাজ কি যাবে রসাতলে? দেশের ক্ষাত্রশক্তি কি তিতিক্ষার ব্রত নিয়েছে? কখনো না। সুপ্ত দেশকে জাগাতে হবে, ডাকতে হবে প্রতিঘাতের নিমন্ত্রণে। সরাসরি মার দেওয়ার প্রথা তখনো প্রচলিত হয়নি—আর, দেখতেই পাচ্ছ, কলম এদের এত নির্বীর্য নয় যে মারের ভয়ে নির্বাক হয়ে যাবে। তবে উপায়? গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগাই এস। সে-পথ তো অনাদি কাল থেকেই প্রশস্ত, তার জন্যে ব্যস্ত কি। একটু কূটনীতি অবলম্বন করা যাক। কি বলো? মুখে মোটা করে মুখোস টানা যাক—পুলিশ-কনস্টেবলের মুখোস। ভাবখানা এমন করা যাক যেন সমাজস্বাস্থ্যরক্ষার ভার নিয়েছি। এমনিতে ঘেউ-ঘেউ করলে লোকে বিরক্ত হবে, কিন্তু যদি বলা যায়, পাহারা দিচ্ছি, চোর তাড়াচ্ছি, তা হলেই মাথায় করবে দেখো। ধর্মধ্বজের ভান করতে পারলেই কর্ম ফতে। কর্মটা কী জানতে চাও? নিশ্চয়ই এই আত্ম-আরোপিত দায়বহন নয়। কর্মটা হচ্ছে, যে করেই হোক, পাদপ্রদীপের সামনে আসা। আর এই পাদপ্রদীপ থেকেই শিরঃসূর্যের দিকে অভিযান।

আসলে, আমিও একজন অতি-আধুনিক, শৃঙ্খলমুক্ত নবযৌবনের পূজারী। আমার হচ্ছে কংসরূপে কৃষ্ণপূজা, রাবণ হয়ে রামারাধনা। নিন্দিত করে বন্দিত করছি ওদের। ওরা সৃষ্টিযোগে, আমি রিষ্টিযোগে। ওদের মন্ত্র, আমার তন্ত্র। আমাদের পথ আলাদা কিন্তু গন্তব্যস্থল এক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, মন্ত্র ঢোকে সদর দরজা দিয়ে আর তন্ত্র ঢোকে পায়খানার ভেতর দিয়ে। আমার পৌঁছুনো নিয়ে কথা, পথ নিয়ে নয়।

সুতরাং গুরুবন্দনা করে সুরু করা যাক। গুরু যদি কোল দেন তো ভালো, নইলে তাঁকেও ঘোল খাইয়ে ছাড়ব। ঘোল খাইয়ে কোল আদায় করে নেব ঠিক।

তেরোশ তেত্রিশ সালের ফাল্গুনে "শনিবারের চিঠি"র সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের কাছে আর্জি পেশ করলেন। যেন তিনি কত

বড় অধিকারী, সমাজের পক্ষ থেকে কত বড় ভার দেওয়া হয়েছে তাঁকে—এই মামলায় এইটুকুই আসল রসিকতা।

"শ্রীচরণকমলেষু

প্রণামনিবেদনমিদং

সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাঙলাদেশে এক ধরণের লেখা চলছে, আপনি লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। প্রধানত 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' নামক দু'টি কাগজেই এগুলি স্থান পায়। অন্যান্য পত্রিকাতেও এ ধরণের লেখা ক্রমশঃ সংক্রামিত হচ্ছে। এই লেখা দুই আকারে প্রকাশ পায়—কবিতা ও গল্প। কবিতা ও গল্পের যে প্রচলিত রীতি আমরা এতাবৎকাল দেখে আসছিলাম লেখাগুলি সেই রীতি অনুসরণ করে চলে না। কবিতা stanza, অক্ষর, মাত্রা অথবা মিলের কোনো বাঁধন মানেনা। গল্পের form সম্পূর্ণ আধুনিক। লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাধা-বাঁধনহারা ভেতরের ভাবও তেমনি উচ্ছৃঙ্খল। যৌনতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব অথবা এই ধরণের কিছু নিয়েই এগুলি লিখিত হচ্ছে। যাঁরা লেখেন তাঁরা Continental Literature-এর দোহাই পাড়েন। যাঁরা এগুলি পড়ে বাহবা দেন তাঁরা সাধারণ প্রচলিত সাহিত্যকে রুচিবাগীশ-দের সাহিত্য ব'লে দূরে সরিয়ে রাখেন। পৃথিবীতে আমরা স্ত্রী-পুরুষের যে সকল পারিবারিক সম্পর্ককে সম্মান ক'রে থাকি এই সব লেখাতে সেই সব সম্পর্কবিরুদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে আমাদের ধারণাকে কুসংস্কার-শ্রেণীভুক্ত ব'লে প্রচার করবার একটা চেষ্টা দেখি। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই শ্রেণীর লেখকদের অগ্রণী। Realistic নাম দিয়ে এগুলিকে সাহিত্যের একটা বিশেষ অঙ্গ ব'লে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নরেশবাবুর কয়েকখানি বই, 'কল্লোলে' প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হ'ল উতলা' নামক একটি গল্প, 'যুবনাশ্ব' লিখিত কয়েকটি গল্প, এই মাসের (ফাল্গুন) "কল্লোলে" প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটি

(অর্থাৎ 'বন্দীর বন্দনা'), 'কালি-কলমে' নজরুল ইসলামের 'মাধবী প্রলাপ' ও 'অনামিকা' নামক দুটি কবিতা ও অন্যান্য কয়েকটি লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে। আপনি এ সব লেখার দু-একটা পড়ে থাকবেন। আমরা কতকগুলি বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও নাটকের সাহায্যে 'শনিবারের চিঠি'তে এর বিরুদ্ধে লিখেছিলাম। শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়ও এর বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু এই প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ এত ক্ষীণ যে, কোনো প্রবল পক্ষের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ বের হওয়ার একান্ত প্রয়োজন আছে। যিনি আজ পঞ্চাশ বছর ধ'রে বাঙলা সাহিত্যকে রূপে রসে পুষ্ট করে আসছেন তাঁর কাছেই আবেদন করা ছাড়া আমি অন্য পথ না দেখে আপনাকে আজ বিরক্ত করছি।

আমি জানি না, এই সব লেখা সম্বন্ধে আপনার মত কি। নরেশ বাবুর কোন বইয়ের সমালোচনায় আপনি তাঁর সাহসের প্রশংসা করেছেন। সেটা ব্যাজস্তুতি না সত্যিকার প্রশংসা, বুঝতে পারি না। আমি নিজে এগুলিকে সাহিত্যের আগাছা বলে মনে করি। বাঙলা সাহিত্য যথার্থ রূপ নেবার পূর্ব্বেই এই ধরণের লেখার মোহে প'ড়ে নষ্ট হতে বসেছে, আমার এই ধারণা। সেইজন্যে আপনার মতামতের জন্যে আমি আপনাকে এই চিঠি দিচ্ছি। বিরুদ্ধে বা পক্ষে যে দিকেই আপনি মত দেন, আপনার মত সাধারণের জানা প্রয়োজন।···ক্ষুদ্র লেখকের লেখনীতে সত্য প্রতিবাদও অনেক সময় ঈর্ষ্যা ব'লে হেলা পায়। আপনি কথা বললে আর যাই বলুক, ঈর্ষ্যার অপবাদ কেউ দেবে না। আমার প্রণাম জানবেন। প্রণত শ্রীসজনীকান্ত দাস"

রসিকতাটা বুঝতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই সরাসরি খারিজ করে দিলেন আর্জি। লিখলেন :

"কল্যাণীয়েষু

কঠিন আঘাতে একটা আঙুল সম্প্রতি পঙ্গু হওয়াতে লেখা সহজে সরচে না। ফলে বাকসংযম স্বতঃসিদ্ধ।

আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখতে পাই, হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে গেছে। আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল করো না। কেন করিনে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিক কারণ এস্থলে গ্রাহ্য না হতেও পারে। আলোচনা করতে হ'লে সাহিত্য ও আর্টের মূলতত্ত্ব নিয়ে পড়তে হবে। এখন মনটা ক্লান্ত, উদ্ভ্রান্ত, পাপগ্রহের বক্র দৃষ্টির প্রভাব প্রবল—তাই এখন বাগ-বাত্যার ধূলো দিগদিগন্তে ছড়াবার সখ একটুও নেই। সুসময় যদি আসে তখন আমার যা বলবার বলব। ইতি ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৩৩।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

একদিন রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' আর 'ঘরে বাইরে' নিয়েও এমনি রোষপ্রকাশ হয়েছিল, উঠেছিল দুরিত-দুর্নীতির অভিযোগ। "পারিবারিক সম্পর্ক"কে অসম্মান করার আর্তনাদ। সে যুগের সজনীকান্ত ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। কিন্তু এ যুগের সজনীকান্ত 'নষ্টনীড়' আর 'ঘরে বাইরে' সম্বন্ধে দিব্যি সার্টিফিকেট দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে। ঐ চিঠিতেই তিনি লিখেছেন: "ঠিক যতটুকু পর্য্যন্ত যাওয়া প্রয়োজন, ততটুকুর বেশী আপনি কখনও যাননি। অথচ যে সব জিনিষ নিয়ে আপনি আলোচনা করেছেন সেই সব জিনিষই আধুনিক এই লেখকদের হাতে পড়লে কি রূপ ধারণ করত ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। 'একরাত্রি,' 'নষ্টনীড়' ও 'ঘরে বাইরে' এরা লিখলে কি ঘটত—ভাবতে সাহস হয়না।" যুগে যুগে সজনীকান্তদের এই একই রকম প্রতিক্রিয়া, একই রকম কাণ্ডজ্ঞান। আসন্ন যুগের সজনীকান্তরা এরি মধ্যে হয়তো চিঠি

লিখছেন বুদ্ধদেবকে আর নজরুল ইসলামকে—"ঠিক যতটুকু পর্যন্ত যাওয়া প্রয়োজন ততটুকুর বেশী আপনারা কখনো যাননি ; অথচ যে সব জিনিস নিয়ে আপনারা আলোচনা করেছেন সেই সব জিনিসই আধুনিক লেখকদের হাতে পড়লে কি রূপ ধারণ করত ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। 'বন্দীর বন্দনা' 'মাধবী প্রলাপ' ও 'অনামিকা' এরা লিখলে কি ঘটত—ভাবতে সাহস হয় না।"

সেই এক ভাষা। একই "প্রচলিত রীতি"।

সতেরো

সাহিত্য তো হচ্ছে কিন্তু জীবিকার কি হবে? আর্ট হয়তো প্রেমের চেয়েও বড়, কিন্তু সবার চেয়ে বড় হচ্ছে ক্ষুধা। এই সাহিত্যে কি উদরান্নের সংস্থান হবে?

"আমি আর্টকে প্রিয়ার চেয়েও ভালবাসি—এই কথাটি আজ কদিন ধরে আমার মনে আঘাত দিচ্ছে।" আমাকে লেখা প্রেমেনের আরেকটা চিঠি: "মনে হচ্ছে আমি সুবিধার খাতিরে প্রিয়াকে ছোট করতে পারি, কিন্তু আর্ট নিয়ে খেলা করতে পারি না।) আমার প্রিয়ার চেয়েও আর্ট বড়। আমি যাকে তাকে বিয়ে করতে পারি কিন্তু আর্টকে শুধু নামের বা অর্থের প্রলোভনে হীন করতে পারি না—অন্তত এখন তাই মনে হচ্ছে। সেই আদিম যুগে উলঙ্গ অসভ্য মানুষ সৃষ্টি করবার যে প্রবল অন্ধ প্রেরণায় নারীকে লাভ করবার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে সেই প্রেরণাই আজ রূপান্তরিত হয়ে আর্টিষ্টের মনকে দোলা দিচ্ছে। এই দোলার ভেতর আমি দেখতে পাচ্ছি গ্রহতারার দুর্বার অগ্নিনৃত্যাবেগ, সূর্য্যের বিপুল বহ্নিজ্বালা, বিধাতার অনাদি অনন্ত কামনা—সৃষ্টি, সৃষ্টি—আজ আর্টিষ্টের সৃষ্টি শুধু নারীর ভেতর দিয়ে সৃষ্টির চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে বলেই প্রিয়ার চেয়ে আর্ট বড়। সৃষ্টির ক্ষুধা সমস্ত নিখিলের অণুপরমাণুতে, প্রতি প্রাণীর কোষে কোষে। সেই সৃষ্টির লীলা মানুষ অনেক রকমে করে এসে আজ এক নতুন অপরূপ পথ পেয়েছে। এ পথ শুধু মানুষের—বিধাতার মনের কথাটি বোধ হয় মানুষ এই পথ দিয়ে সব চেয়ে ভালো করে বলতে পারবে; সৃজনকামনার চরম ও পরম পরিতৃপ্তি সে এই পথেই আশা করে! অন্তত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই আর্ট সেই আদিম অনাদি সৃষ্টি-ক্ষুধার রূপান্তরিত বিকাশ।

এতক্ষণ এত কথা বলে হয়ত কথাটাকে জটিল করে ফেললুম, হয়ত কথাটার একদিক বেশি স্পষ্ট করতে গিয়ে আর একদিক সম্বন্ধে ভুল ধারণা করবার সুযোগ দিলুম।....

নারীর মধ্যে প্রিয়াকে চাই এবং প্রিয়ার মধ্যে প্রেমকে চাই। যার কাছে ভালবাসার প্রতিদান পাব তারি মাঝে এ পর্য্যন্ত যত নারীকে ভালবেসেছি ও পেয়েছি ও হারিয়েছি বা ভালবেসেছি ও পাইনি সকলে নতুন করে বাঁচবে—এই আমার মত। জানি এ মত অনেকের কাছে বিতৃষ্ণাময় লাগবে, এ-মত অনেকের কাছে হৃদয়হীনতার পরিচায়কও লাগবে হয়ত। কিন্তু হৃদয়হীন হতে রাজী নই বলেই এই আপাত-হৃদয়হীন মত আমি নিজে পোষণ করি। প্রেম খুঁজতে গিয়ে প্রিয়ার নারীত্ব আমাকে আঘাত দিয়েছে বলে আমি নারীর মধ্যে প্রেম পাবার আশা ত্যাগ করব না। নিজের কথাই বলছি তোর কথা বলতে গিয়ে।

আমার এখন দৃঢ় ধারণা হয়েছে ছেলেবেলা থেকে একটা রূপকথা শুনে আসছি—সে রূপকথা যেমন অসত্য তেমনি সুন্দর। রূপকথাটাকে আমরা কিন্তু তাই রূপকথা ভাবি না, ভাবি সেটা সত্য। মানুষের প্রেম সত্যি করে একবার মাত্র জাগে এই কথাটাই রূপকথা। প্রেম অমর এটা সত্য হতে পারে কিন্তু অমর প্রেম লাভ করবার আগে প্রেমের অনেক আশ্বাস ও আভাস আসে যাকে আমরা তাই বলে ভুল করি।

এক গরীব চাষা অনেক তপস্যা করে এক দেশের এক রাজকন্যাকে পাবার বর পেয়েছিল। কিন্তু রাজকন্যা আসবার সময় প্রথম যে দাসী এল খবর দিতে, সে তাকেই ধরে রেখে দিলে। সে যখন জানলে সে রাজকন্যা নয়, তখন সে ভগবানকে ডেকে বললে, 'তোমার বর ফিরিয়ে নাও, আমার দাসীই ভাল।' তারপর যখন সত্যিকারের রাজকন্যা এল তখন কী অবস্থাটা হল বুঝতেই পারিস।

আমাদের রাজকন্যাকে, দুঃখের বিষয়, সনাক্ত করবার কোনো উপায় নেই। কোনদিন সে আসবে কিনা তাই জানিনা, আর এসেও কখন অসাবধানতায় ফসকে যায় এই ভয়ে আমরা সারা। তাই আমরা প্রথম অগ্রদূতীকেই ধরে বলি অনেক সময়, "বর ফিরিয়ে নাও ভগবান।" ভগবানকে আমরা যতটা সজাগ ও সদয় মনে করি, তিনি বোধহয় ততটা নন কারণ তিনি মাঝে-মাঝে বলেন "তথাস্তু"। আর আমাদের সত্যিকারের রাজকন্যা হয়ত একদিন আসে, যদিও মাঝে মাঝে অগ্রদূতীর ছদ্মবেশ খুলে আসল রাজকন্যা বেরিয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে কিন্তু তিনি বর ফিরিয়ে নেন না, এবং অনেক সময় সদয় হয়েই। তোর জীবনে ভগবান এবার "তথাস্তু" বললেন না কেন কে জানে। যে প্রেমের নীড় মানুষ অটুট করে রচনা করে তার মাঝে থাকে সমস্ত অগ্রদূতীর প্রেমের ছায়া।"

"কল্লোলের" এমন অবস্থা নয় যে লেখকদের পয়সা দিতে পাবে। শুধু শৈলজা আর নৃপেনকেই পাঁচ-দশ টাকা করে দেওয়া হত, ওদের অনটনটা কষ্টকর ছিল বলে। আর সবাই লবডঙ্কা। আমরা শুধু মাটি পাট করছি। হাঁড়ি গড়তে হবে, ঢিল-বালি সব বের করে দিচ্ছি। সাধু গাঁজা তৈরি করছে, তার সাজতে-সাজতেই আনন্দ। আমাদেরও প্রায় তেমনি। লেখবার বিস্তৃত ক্ষেত্র পেয়েছি এতেই আমাদের স্ফূর্তি। ঢালছি আর সাজছি, দম যখন জমবে তখন দেখা যাবে। চকমকির পাথর যদি কারু থাকে তবে ঘা মারলে আগুন বেরুবেই।

তবু একেক দিন দীনেশদা হঠাৎ গলা জড়িয়ে ধরে পাশে বসে পড়তেন। শূন্য বুক-পকেটে একটি টাকা টুপ করে কখন খসে পড়ত। এ টাকাটা দানও নয়, উপার্জনও নয়, শুধু স্বপ্নে কুড়িয়ে-পাওয়া একটি অভাবিত স্নেহস্পর্শের মত—এমনি অনুভব করতাম। নিশ্চিন্ত হতাম, আরো দিন চারেক আড্ডা চালাবার জন্যে ট্র্যাম চলবে।

কিন্তু প্রেমেন শৈলজার অর্থের প্রয়োজন তখন অত্যন্ত। তাই তারা ঠিক করলে আলাদা একটা কাগজ বের করবে। সেই কাগজে ব্যবস্থা করবে অশনাচ্ছাদনের। সঙ্গে সুমন্ত্র মুরলীধর বসু। তত্ত্বধারক বরদা এজেন্সির শিশির নিয়োগী।

বেরুল "কালি-কলম"—তেরশ তেত্রিশের বৈশাখে। দুটো বিশেষত্ব প্রথমেই চোখে পড়ল। এক, সাধাসিধে ঝকঝকে নাম; দুই, একই কাগজের তিনজন সম্পাদক—শৈলজা প্রেমেন আর মুরলীদা। আর প্রথম সংখ্যায় সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা মোহিতলালের 'নাগার্জ্জুন'।

"ত্বরিতে উঠিয়া গেনু মন্ত্রবলে স্মরণের আলোক-তোরণে.
—প্রবেশিনু অকম্পিত নিঃশঙ্ক চরণে!
অমর মিথুন যত মূরছিল মহাভয়ে—শ্লথ হল প্রিয়া আলিঙ্গন।
কহিলাম, "ওগো দেব, ওগো দেবীগণ,
আমি সিদ্ধ নাগার্জ্জুন, জীবনের বীণাযন্ত্রে সকল মূর্চ্ছনা
হানিয়াছি, এবে তাই আসিয়াছি করিতে অর্চ্চনা
তোমাদের রতিরাগ; দাও মোরে দাও ত্বরা করি
কামদুঘা সুরভির দুগ্ধধারা এই মোর করপাত্র ভরি!"
—মানব-অধর-সীধু যে রসনা করিয়াছে পান
অমৃত পায়স তার মনে হল ক্ষার-কটু প্রলেহ সমান।
জগৎ-ঈশ্বরে ডাকি কহিলাম, "ওগো ভগবান!
কি করিব হেথা আমি? তুমি থাক তোমার ভবনে,
আমি যাই; যদি কভু বসিতাম তব সিংহাসনে,
সকল ঐশ্বর্য্য মোর লীলাইয়া নিতাম খেলায়ে—
বাঁকায়ে বিদ্যুৎ-ধনু, নভো-নাভি পূর্ব্বমুখে হেলায়ে হেলায়ে
গড়িতাম ইচ্ছাসুখে নব-নব লোক লোকান্তর।

তবু আমি চাহি না সে, তব রাজ্যে থাক তুমি চির একেশ্বর।
মোর ক্ষুধা মিটিয়াছে ; শশী-সূর্য্য তোমার কন্দুক ?
আমারও খেলনা আছে—প্রেয়সীর সুচারু চুচুক !
স্তোত্র-স্তুতি ভাগ্য তব, তবু কহ শুধাই তোমারে—
কভু কি বেসেছ ভালো মুদিতাক্ষী যশোধারা,
মদিরাক্ষী বসন্তসেনারে ?"

এ-কবিতায় অবশ্য কোনোই দোষ পায়নি "শনিবারের চিঠি" কারণ মোহিতলাল যে নিজেই ঐ দলের মণ্ডল ছিলেন। শুনেছি কৃত্তিবাস ওঝা নাকি ওঁরই ছদ্মনাম! "শনিবারের চিঠিতে" "সরস-সতী" নাম দিয়ে সরস্বতী-বন্দনাটি বিচিত্র।

"সারাটা জাতের শির-দাঁড়াটায় ধরেছে ঘুণ—
মা'র জঠরেও কাম-যাতনায় জ্বলিছে ভ্রূণ !
শুকদেব যথা করেছিল বেদ-অধ্যয়ন—
গর্ভে বসেই শেষ করে তারা বাৎস্যায়ন !

বুলি না ফুটিতে চুরি ক'রে চায়—মোহন ঠাম !
ভাষা না শিখিতে লেখে কামায়ন—কামের সাম।
জ্ঞান হলে পরে মায়েরে দেখে যে বারাঙ্গনা !
তার পরে চায় সারা দেশময় অসতীপণা।

এদেরি পূজোয় ধরা দিয়েছ যে সরস্বতী,
চিনি নে তোমায়, কোন বলে তুমি আছিলে, সতী ?
দেখি তুমি শুধু নাচিয়া বেড়াও হাঁস-পা-তালে,—
অঙ্গে ধবল, কুষ্ঠও বুঝি ওষ্ঠে-গালে !"

"কালি-কলম" বেরুবার পর বাইরে থেকে দেখতে গেলে, "কল্লোলের" সংহতিতে যেন চিড় খেল। প্রথমটা লেগেছিল তাই প্রায় প্রিয়বিচ্ছেদের মত। একটু ভুল-বোঝার ভেলকিও যে না ছিল তা নয়। কেউ কেউ এমন মনে করেছিল যে "কল্লোলের" রীতিমত লাভ হচ্ছে, দীনেশদা ইচ্ছে করেই মুনফার ভাগ-বাঁটোয়ারা করছেন না। এ সন্দেহে যে বিন্দুমাত্র ভিত্তি নেই, তার কারণ "কালি-কলম" নিজেও ব্যবসার ক্ষেত্রে ফেল মারল। এক বছর পরেই প্রেমেন সটকান দিলে, দু বছর পরে শৈলজা। মুরলীদা আরো বছর তিনেক এক পায়ে দাঁড়িয়ে চালিয়েছিলেন বটে কিন্তু মুরলীধ্বনিও ক্ষীণতর হতে-হতে বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে বরদা থাকলেও ভাগ্যে বরদাত্রী জোটে না সব সময়।

সুতরাং প্রমাণ হয়ে গেল, সত্যিকার সিরিয়স পত্রিকা চালিয়ে তা থেকে জীবিকানির্বাহ করা সাধ্যাতীত। বেশির ভাগ পাঠকের চোখ ঢাউসগুলোর দিকে, নয়তো খিস্তি-খেউড়ের দিকে। "কল্লোল" তো শেষের দিকে সুর বেশ খাদে নামিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিল, জনরঞ্জনের প্রলোভনে। কিন্তু তাতে ফল হয় না! অবশিষ্ট ভক্তরাও রুষ্ট হয় আর নিষ্কলঙ্ক ধর্ম থেকে বিচ্যুতি ঘটে। "কল্লোল" তাই "কল্লোলের" মতই মরেছে। ও যে পাতকো হয়ে বেঁচে থাকেনি ওটাই ওর কীর্তি।

টাকা থাকলেই বড়লোক হওয়া যায় বটে, কিন্তু বড় মানুষ হওয়া যায় না। বড় মানুষের বাড়ির একটা লক্ষণ হচ্ছে এই যে, সব ঘরেই আলো থাকে। "কল্লোল" সেই বড় মানুষের বাড়ি। তার সব ঘর আলো করা।

তবু সেদিন "কল্লোল" ভেঙে "কালি-কলমের" সৃষ্টিতে নৃপেনের বিক্ষোভের বোধহয় অন্ত ছিল না। সে ধরল গিয়ে শৈলজাকে, মুখোমুখি প্রচণ্ড ঝগড়া করলে তার সঙ্গে। এমন কি তাকে বিশ্বাসহন্তা পর্যন্ত বললে। শৈলজা বিন্দুমাত্র চঞ্চল হল না। তার স্বাভাবিক সস্মিত গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললে, 'ব্যস্ত নেই, তোকেও আসতে হবে।'

বস্তুত কল্লোল-কালিকলমের মানে কোনো দলাদলি বা বিরোধ-বিপক্ষতা ছিল না। যে "কল্লোলে" লেখে সে "কালি-কলমে"ও লেখে আর যে "কালি-কলমের" লেখক সে "কল্লোলের"ও লেখক। যেমন জগদীশ গুপ্ত, নজরুল, প্রবোধ, জীবনানন্দ, হেম বাগচি। প্রেমেন ফের "কল্লোলে' গল্প লিখল, আমিও "কালি-কলমে" কবিতা লিখলাম। কোথাও ভেদ-বিচ্ছেদ রইল না, পাশাপাশি চলবার পথ মসৃণ হয়ে গেল। বরং বাড়ল আর একটা আড্ডার জায়গা। "কল্লোল" আর "কালি-কলম" একই মুক্ত বিহঙ্গের দুই দীপ্ত পাখা!

কিন্তু নৃপেন প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হয় নি। "কালি-কলমে" লেখা তো দেয়ইনি, বোধহয় কোনদিন যায়ওনি তার আপিসে-আড্ডায়।

মনটা বুদ্ধদেবের দিকে ঝুঁকে পড়ল। এবং তেরোশ তেত্রিশের এক চৈত্রের রাতে ঢাকা রওনা হলাম।

ক্ষিতীন সাহা বুদ্ধদেবের বন্ধু, কলকাতায় মেসে থেকে পড়ে, বাড়ি ঢাকায়। হঠাৎ তার কঠিন অসুখ হয়ে পড়ল, ঢাকায় বাপ-মার কাছে যাবার দরকার। পথে একজন সঙ্গী চাই। আমি বললাম, আমি যাব।

তার আগে পূজোর ছুটিতে বুদ্ধদেব চিঠি লিখেছিল: "আপনি ও নেপেনদা এ ছুটিতে কিন্তু একবার ঢাকায় আসবেনই। আপনাদের দুজনকে আমি প্রগতি-সমিতির পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ পাঠাচ্ছি। যদিও পাথেয় পাঠাতে আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় অক্ষম, তবে এখানে এলে আতিথেয়তার ত্রুটি হবে না। আপনার পকেট আশু রৌপ্য-গর্ভ হয়ে উঠুক।....এ নিমন্ত্রণ আমাদের সবাকার,—আমার একার নয়। আমাদের সম্মিলিত সম্ভাষণ ও আমার ব্যক্তিগত অনুরাগ জ্ঞাপন করি।"

ক্ষিতীনকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সাতচল্লিশ নম্বর পুরানা পল্টনে এসে পৌঁছুলাম। বুদ্ধদেবের বাড়ি। বুদ্ধদেব তো আকাশ

থেকে পড়ল! না, কি, উঠে এল আকাশে! এ কী অবাক কাণ্ড!

আমাকে দেখে একজন বিস্মিত হবে আর তার বিস্ময়টুকু আমি উপভোগ করব এও একটা বিস্ময়!

'আরে, কী ভয়ানক কথা, আপনি?'

'হ্যাঁ, আর ঢাকা থাকা গেল না—চলে এলাম।'

খুশিতে উছলে উঠল বুদ্ধদেব। 'উঠলেন কোথায়?'

'আর কোথায়!'

'দাঁড়ান, টুনুকে খবর পাঠাই, পরিমলকে ডাকি।'

সাধারণ একখানা টিনের ঘর, বেড়া দিয়ে ভাগ করা। প্রান্তের ঘরটা বুদ্ধদেবের। সেই ঘরেই অধিষ্ঠিত হলাম। পাশালো একটা তক্তপোষ আর ন্যাড়া-ন্যাড়া কাঠের দু-একটা টেবিল-চেয়ার সমস্ত ঘরের সম্পদ, আর বইভরা কাঠের একটা আলমারি। দক্ষিণে ফাঁকা মাঠ, উধাও-ধাওয়া অফুরন্ত হাওয়া। একদিকে যেমন উদ্দাম উন্মুক্তি, অন্যদিকে তেমনি কঠোরব্রত কৃচ্ছ্রতা। একদিকে যেমন খামখেয়ালের এলোমেলোমি, অন্যদিকে তেমনি আবার কর্মোদযাপনের সংকল্পস্থৈর্য। আড্ডা হল্লা, তেমনি আবার পরীক্ষার পড়া—তেমনি আবার সাহিত্যের শুশ্রূষা। সমস্ত কিছু মিলে একটা বর্ধন-বিস্তারের উদ্যতি।

প্রায় দিন পনেরো ছিলাম সে-যাত্রায়। প্রচুর সিগারেট,—সামনের মুদিদোকানে এক সিগারেটের বাবদই একা বুদ্ধদেবের তখন ষাট-সত্তর টাকা দেনা—আর অঢেল চা—সব সময়ে বাড়িতে নয়, চায়ের দোকানে, যে কোনো সময়ে যে কোনো চায়ের দোকানে। আর সকালে-সন্ধ্যায় টহল, পায়ে হেঁটে কখনো বা ঢাকার নাম-করা পংখীরাজ ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে। সঙ্গে টুনু বা অজিত দত্ত, পরিমল রায় আর অমলেন্দু বসু। আর গল্প আর কবিতা, ছড়া আর উচ্চ হাসির তারস্বর। শুধু পরিমলের

হাসিটাই একটু শ্লেষাশ্লিষ্ট। সেই সঙ্গে কথায়-কথায় তার ছড়ার চমক স্ফূর্তিকে আরো ধারালো করে তুলত। 'গেলে পাঞ্জাবে, জেলে জান যাবে' কিংবা 'দেশ হয়েছে স্বাধীন, তিন পেয়ালা চা দিন,'—সেই সব ছড়ার দু'-একটা এখনো মনে আছে। ক্রমে-ক্রমে দলে সামিল হল এসে যুবনাশ্ব বা মণীশ ঘটক, তার ভাই সুধীশ ঘটক, আর অনিল ভট্টাচার্য, ছবির জগতের আলফাবিটা—আর সর্বোপরি ভৃগু। নবরত্নের সভা গুলজার হয়ে উঠল। মনে হল যেন বোহিমিয়ায় এসে বাসা নিয়েছি।

বলা বাহুল্য নিভৃততম ছিল বুদ্ধদেব। মুক্ত উঠোনে পিঁড়িতে বসে একসঙ্গে স্নান, পাশাপাশি আসনে বসে নিত্য ভুরিভোজ নিত্যকালের জিনিস হয়ে রয়েছে। সমস্ত অনিয়ম ক্ষমা করে বুদ্ধদেবের মার (অতি শৈশবে মাতৃবিয়োগ হবার পর দিদিমাকেই বুদ্ধদেব মা বলত) যে একটি অনিমেষ স্নেহ ছিল চারপাশে, তারই নীরব স্পর্শ আমাদের নৈকট্যকে আরো যেন নিবিড় করে তুলল। একটা বিরাট মশারির তলায় দুজনে শুতাম একই তক্তপোষে। কোনো কোনো দিন গল্প করে কাব্যালোচনা করে সারারাত না ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিতাম। কোনো কোনো রাতে অজিত এসে জুটত, সঙ্গে অনিল কিংবা ভৃগু। তাস খেলেই রাত ভোর করে দেওয়া হত। বুদ্ধদেব তাস খেলত না, সমস্ত হল্লা-হাসি উপেক্ষা করে পড়ে-পড়ে ঘুমুত এক পাশে।

সে সব দিনে মশারি টাঙানো হত না। লণ্ঠনের আলোতে বসে সুদীর্ঘ রাত্রি তাসখেলা—এক পয়সা যেখানে স্টেক নেই—কিংবা দুই বা ততোধিক বন্ধু মিলে শুদ্ধ কাব্যালোচনা করে রাত পোহানো—সেটা যে কি প্রাণনায় সেদিন সম্ভব হত আজকের হিসেবে তা অনির্ণেয়। যে-যেদিন মশারি ফেলা হত সে-সেদিনও তাকে বাগ মানিয়ে রাখা সাধ্য ছিল না। শেষরাত্রির দিকেই বাতাস উঠত—সে কি উত্তাল-

উদ্দাম বাতাস—আর আমাদের মশারি উড়িয়ে নিয়ে যেত। সবুজ ভোরের আলোয় চোখ চেয়ে মনে হত দুইজনে যেন কোন পাল-তোলা ময়ূরপঙ্খীতে চড়ে কোন নির্জন নদীতে পাড়ি দিয়েছি।

এক দুপুর বেলা অজিত, বুদ্ধদেব আর আমি—আমরা তিনজনে মিলে মুখে-মুখে একটা কবিতা তৈরি করলাম। কবিতাটা ঢাকাকে নিয়ে, নাম 'ঢাকা-ঢিক্কি' বা ঢাকা-ঢক্কা। কবিতার অনুপ্রাস নিয়ে "শনিবারের চিঠির" বিদ্রূপের প্রত্যুত্তর। অনুপ্রাস কতদূর যেতে পারে তারই একটা চূড়ান্ত উদাহরণ :

ফাগুনের গুণে 'সেগুনবাগানে' আগুন বেগুন পোড়ে,
ঠুনকো ঠাটের 'ঠাঠারিবাজারে' ঠাঠা ঠেকিয়াছে ঠিক ;
ঢাকার ঢেঁকিতে ঢাকের ঢেকুর ঢিঢিক্কারেতে ঢোঁড়ে,
সং 'বংশালে' বংশের শালে বংশে সেঁধেছে শিক।

ভুয়া 'উয়ারির' কুয়ার ধুঁয়ায় চুঁয়ায় গুয়ার গুঁয়া,
বাছা 'এছাকের' কাছার কাছেতে কাছিমের কাছি আছে,
'চকের' চাক্কু-চাক্কায় চিকা চকচকি চাখে চুয়া
'সাচিবন্দরে' মন্দোদরীরা বন্দী বান্ধিয়াছে।

পাষণ্ড ঐ 'মৈষুণ্ডির' মুণ্ডে গণ্ডগোল,
'সূত্রাপুরের' সূত্রধরের পুত্রেরা কাৎরায়,
'লালবাগে' লাল ললনার লীলা ললিত-লতিকা-লোল
'জিন্দাবাহার' বৃন্দাবনেরে নিন্দিছে সন্ধ্যায়!

'বক্সীবাজারে' বাক্সে নক্সা মকশো একশোবার,
রমা রমণীরা 'রমনায়' রমে রম্যা রম্ভাসম ;

'একরামপুরে' বিক্রি মাকড়ি লাকড়ি শুক্রবার,
গন্ধে অন্ধ 'নারিন্দ্যা' যেন বিন্দু ইন্দুপম।

চর্ম্মে ঘর্ম্ম 'আর্ম্মেনিটোলা' কর্ম্মে বর্ম্মাদেশ,
টাকে-টিকটিকি-টিকি 'টিকাটুলি' টিকার টিকিট কাটে,
'তাঁতিবাজারের' তোৎলা তোতার তিতা-তরে পিত্তোশ,
'প্যাণ্ডারিয়ার' ভণ্ড গুণ্ডা চণ্ড চঞ্চু চাটে॥

ঢাকায় দুজন পৃষ্ঠপোষক পাওয়া গেল। এক পরিমলকুমার ঘোষ, প্রোফেসর; দুই ফণীভূষণ চক্রবর্তী, বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। জ্ঞানী গুণীদের মধ্যে থেকে কেউ-কেউ আছেন আমাদের স্বপক্ষে, সেইটেই তখন প্রকাণ্ড উপার্জন।

একদিন দুপুরে আকাশ-কালো-করা প্রচণ্ড বৃষ্টি নামল। স্নান করে উঠে ঠিক খাবার সময়টায়। দাঁড়াও, আগে বৃষ্টি দেখি, পরে খাওয়া যাবে। কিন্তু সাধ্য নেই সর্বভঞ্জন সেই প্রভঞ্জনের সামনে জানলা খোলা যায়। ঘরে লণ্ঠন জেলে দুজনে—বুদ্ধদেব আর আমি—ভাত খেলাম অদ্ভুত অবিস্মরণীয় পরিবেশে। হাওয়া যখন পড়ল তখন জানলা খুলে চেয়ে দেখি, সর্বনাশ। অন্ধের নড়ি, আমার একমাত্র ফাউণ্টেন পেনটি টেবিল থেকে পড়ে ভেঙে গিয়েছে।

এর পর আর ঢাকায় থাকার কোনো মানে হয় না।

বুদ্ধদেবের কটা চিঠির টুকরো:

"আপনি যদি ওর সঙ্গে চিঠি লেখালেখি সুরু করেন তা হলে খুব ভেবে-চিন্তে সুন্দর করে লিখবেন কিন্তু। কারণ এইসব চিঠি যে ভবিষ্যতে বাঙলা দেশের কোনো অভিজাত পত্রিকা-বিশেষ গৌরবের সহিত ছাপবে না এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কিন্তু মেয়েটি

আপনার হাতের লেখা পড়তে পারবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি অন্ততঃ আপনাকে এইটুকু অনুরোধ করতে বাধ্য হচ্ছি যে আমাকে চিঠি লেখবার সময় কলমে যেন বেশি করে কালি ভরে নেন এবং অক্ষরগুলোকে ইচ্ছে করে অত ক্ষুদে-ক্ষুদে না করেন। কারণ আমরা ডাক পাই গোধূলি-লগ্নে। তখন ঘরেও আলো জ্বলে না, আকাশের আলোও ম্লান হয়ে আসে। কাজেই আপনার চিঠি পড়তে রীতিমত কষ্ট হয়।”

“অচিন্ত্যবাবু, আষাঢ় মাস থেকে আমরা “প্রগতি” ছেপে বার করচি। মস্ত দুঃসাহসের কাজ, না? হঠাৎ সব ঠিক হয়ে গেল। এখন আর ফেরা যায় না। একবার ভালো করেই চেষ্টা করে দেখি না কি হয়। প্রেমেনবাবুকে এ খবর দেবেন।”

“আষাঢ়” মানে তেরোশ তেত্রিশের আষাঢ় আর “ছেপে” মানে এর আগে “প্রগতি” হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা ছিল।

“আপনি দুঃখ ও নৈরাশ্যের ভেতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন ভেবে আমারও সত্যি-সত্যি মন খারাপ লাগে। কি হয়েছে? কেন? এ সব প্রশ্ন করা সত্যি অসঙ্গত—অন্তত চিঠিতে। কিন্তু আপনার দুঃখের কারণ কি তা জানতে সত্যি ইচ্ছে করে—অলস কৌতূহলবশত নয় কেবল—আপনাকে বন্ধু বলে হৃদয়ে গ্রহণ করেছি, তাই। আপনার প্রতি সুখদুঃখের সঙ্গে আমি নিজেকেও ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বিবেচনা করি। আপনি কি ঢাকায় আসবেন? আসুন না। আমার যতদূর বিশ্বাস ঢাকা আপনার ভালো লাগবে—পল্টনের এই খোলা মাঠের

মধ্যেই একটা মস্ত শান্তি আছে। আপনি এলে আমাদের যে অনেকটা ভালো লাগবে তা তো জানেনই।”

“প্রগতি আগামী বছর চলবে কিনা এখনো ঠিক করিনি। সাধ তো আকাশের মত প্রকাণ্ড, কিন্তু পুঁজিতে যে কুলোয় না। এ পর্যন্ত এর পেছনে নিজেদের যত টাকা ঢালতে হয়েছে তার হিসেব করলে মন খারাপ হয়ে যায়। এ ভাবে পুরোপুরি লোকসান দিয়ে আর এক বছর চালানো সম্ভব নয়। এখনো অবিশ্যি একেবারে হাল ছেড়ে দিইনি। গ্রীষ্মের ছুটি হওয়ামাত্র একবার বিজ্ঞাপন-সংগ্রহের চেষ্টায় কলকাতায় যাব। যদি কিছু পাওয়া যায় তাহলে প্রগতি চলবে। যথাসাধ্য চেষ্টার ফলেও যদি কিছু না হয়, তাহলে আর কি করা? আপনি আর প্রেমেনবাবু মিলে একটা নতুন উপন্যাস যদি লেখেন তা হলে তা দ্বিতীয় বর্ষের আষাঢ় থেকে আরম্ভ করা যায়।

আপনি কবে কলকাতা থেকে বেরোবেন? ঢাকায় কি আসবেন না একবার? শীত প্রায় কেটে গিয়েছে—আর কয়েকদিন পরেই পল্টনের বিস্তৃত মাঠ অতিক্রম করে হু-হু করে জোয়ারের জলের মত দক্ষিণা বাতাস এসে আমার ঘরে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়বে—যে বাতাস গত বছর আপনাকে মুগ্ধ করেছিল, যে বাতাস আপনার কলম ভেঙেছিল। এবারো কি একবার আসবেন না? যখন ইচ্ছে। You are ever welcome here.”

“প্রগতিকে টিকিয়ে রাখা সত্যিই বোধ হয় যাবে না। তবু একেবারে আশা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না—কুসংস্কারগ্রস্ত মনের মত miracleএ বিশ্বাস করবার দিকে ঝুঁকে পড়ছি। প্রগতি উঠে গেলে আমার জীবনে যে vacuum আসবে তা আর কিছু দিয়েই পূর্ণ করবার মত

নয়—সেই হিসেবেই সব চেয়ে খারাপ লাগছে। কালিকলম কি আর এক বছর চলবে?

এবারকার কল্লোলে শৈলজার ছবি দিয়েছে দেখে ভারি আনন্দ পেলাম। আধুনিকদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান করার সময় বোধহয় এসেছে। তাহলে কিন্তু এবার মোহিতলালের ছবিও দিতে হয়। কারণ আজকের দিনে কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন শৈলজানন্দ, কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমনি মোহিতলাল—নয় কি?"

"নজরুল ইসলাম এখানে দিন-কতক কাটিয়ে গেলেন। এবার তাঁর সঙ্গে ভালোমত আলাপ হল। একদিন আমাদের এখানে এসেছিলেন; গানে, গল্পে, হাসিতে একেবারে জমজমাট করে রেখেছিলেন। এত ভালো লাগলো! আর ওঁর গান সত্যি অদ্ভুত! একবার শুনলে সহজে ভোলা যায় না। আমাদের ছুটো নতুন গজল দিয়ে গেছেন, স্বরলিপি সুদ্ধ ছাপবো।....নাট্যমন্দির এখানে এসেছে। তিনরাত অভিনয় হবে। আমি আজ যেতে পারলাম না—একদিনও যেতে পারবো না হয়তো। অর্থাভাব। যাক—একবার তো দেখেইছি। এর পর আবার স্টার আসছে। ঢাকাকে একেবারে লুটে নেবে।

প্রগতি সত্যি-সত্যি আর চললো না। কোনোমতে জ্যৈষ্ঠটা বের করে দিতে পারলেই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। তবু—যদি কখনো অর্থাগম হয়, আবার কি না বার করবো?....আপনার মাকে আমার প্রণাম জানাবেন।"

আঠারো

কোন এক গোরা টিমকে ছ-ছটা গোল দিলে মোহনবাগান। রবি বোস নামে নতুন এক খেলোয়াড় এসেছে ঢাকা থেকে—এ তারই কারুকার্য। সেইবার কি? না, যেবার মনা দত্ত পর পর তিনটে কর্নার-শট থেকে হেড করে পর-পর তিনটে গোল দিলে ডি-সি-এল-আইকে? মোটকথা, ঢাকার লোক যখন এমন একটা অসাধ্যসাধন করল তখন মাঠ থেকে সিধে ঢাকায় চলে না যাওয়ার কোনো মানে হয় না। যে দেশে এমন খেলোয়াড় পাওয়া যায় সে দেশটা কেমন দেখে আসা দরকার।

সুতরাং খেলার মাঠ থেকে সোজা শেয়ালদা এসে ঢাকার ট্রেন ধরল তিনজন। দীনেশরঞ্জন, নজরুল আর নৃপেন। সোজা বুদ্ধদেবের বাড়ি। সেইখানে অতিরিক্ত আকর্ষণ, আমি বসে আছি আগে থেকে।

"দে গরুর গা ধুইয়ে"—মোহনবাগান-মাঠের সেই চীৎকার বুদ্ধদেবের ঘরের মধ্যে ফেটে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিনিনাদ।

সেই সব ছন্নছাড়ারা আজ গেল কোথায়? যারা বলত সমস্বরে—

আমরা সুখের স্ফীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি
আমরা দুখের বক্র মুখের চক্র দেখে ভয় না করি।
ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ,
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

ছিল ভৃগুকুমার গুহ। স্বাস্থ্য নেই স্বাচ্ছন্দ্য নেই, অথচ মধুবর্ষী হাসির প্রস্রবণ। বিমর্ষ হবার অজস্র কারণ থাকলেও যে সদানন্দ। যদি বলতাম, ভৃগু, একটু হাসো তো, অমনি হাসতে সুরু করত। আর সে-হাসি একবার সুরু হলে সহজে থামতে চাইত না। প্রবন্ধ লেখবার

ঝকঝকে কলম ছিল হাতে, কিন্তু যা সবচেয়ে বেশি টানত তা তার হৃদয়ের চাকচিক্য। ছিল অনিল ভটচাজ। নিজের কল্পনার কৌশলে যে দুঃস্থতাকেও শিল্পমণ্ডিত করে তুলেছে! বাঁশি বাজায় আর সিগারেটের ধোঁয়ায় থেকে-থেকে চক্ররচনা করে। মনোজ্ঞ-মধুর সঙ্গস্পর্শের সুধা বিলোয়। ছিল সুধীশ ঘটক। যেন কোন স্বপ্নলোকে নিরুদ্দেশের অভিযাত্রী। সব যেন লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনের যুবরাজ।

যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে
ভাঙা কুলোয় করুক পাখা তোমার যত ভৃত্যগণে।
দগ্ধভালে প্রলয়শিখা দিক না এঁকে তোমার টীকা
পরাও সজ্জা লজ্জাহারা জীর্ণকন্থা ছিন্নবাস ;
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

"ভাই অচিন্ত্য,

বহুকাল পরে আজ বিকেলে তোমার চিঠি পেলাম! আজ সকালেই তোমাকে এক কার্ড লিখেছি, তবু আবার না লিখে পারলাম না।

'প্রগতি' নিশ্চয়ই পেয়েছ—আগাগোড়া কেমন লাগল জানিয়ো। তোমার কাছ থেকে 'প্রগতি' যে স্নেহ ও সহায়তা পেল তার তুলনা নেই। এই ব্যাপারে আমরা কত নিঃস্ব ও নিঃসহায়—ভেবে-ভেবে এক-এক সময় আশ্চর্য লাগে। লাভের মধ্যে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন দুশ্চিন্তা, প্রচুর আর্থিক ক্ষতি ও আরো প্রচুর লোকনিন্দা—একটি লোক নেই যে সত্যি-সত্যি আমাদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তবু কেন চালাচ্ছি? আমাদের মধ্যে যে surplus energy আছে, তা এইভাবে একটা outlet খুঁজে নিয়েছে। খেয়ে-পরে-ঘুমিয়ে নিশ্চিন্তচিত্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারব না, বিধাতা আমাদের এ অভিশাপ দিয়েছেন। তাই একটা কিছু করতে হয়, কোনো একটা নেশায় নিজেদের ডুবিয়ে রাখতে হয়। আমার তো মনে হয়

[illegible] জীবনে [illegible] প্রয়োজন ছিল। যে শক্তি আমাদের ভিতর [illegible] তার কর্মোপযুক্ত ব্যবহার না করলেই অন্যায় হত। তবে অর্থনৈতিকটাই বিশেষ করে পীড়াদায়ক। হাত একেবারে রিক্ত—কি করে চলবে জানিনে। তবু আশা করতে ছাড়িনে। তবু দমে যাই না। কেমন যেন বিশ্বাস জন্মেছে যে 'প্রগতি' চলবেই—যেহেতু চলাটা আমাদের পক্ষে দরকার।

তুমি যদি 'বিচিত্রা'য় চাকরি পাও, তাহলে খুবই সুখের কথা। অর্থের দিকটাই সবচেয়ে বিবেচনা করবার। পঞ্চাশ টাকা এমন মন্দই বা কি। তার উপর টিউশনি তো আছেই। তবে 'বিচিত্রা'য় একটা anti-আধুনিক feeling আছে, কিন্তু তাতে কতটুকুই বা যাবে আসবে? তোমার ল final কবে? ওটা পাশ করলে পর স্থায়ী ভাবে একটা কিছু কাজ করলেই নিশ্চিন্ত হতে পারো।

তোমার চিঠিটা পড়ে অবধি আমার মন কেমন যেন ভারি হয়ে আছে—কিছু ভালো লাগছে না। শুধু ভাবছি, এও কি করে সম্ভব হয়? তুমি যে-সব কথা লিখেছ তা যেন কোনো নিতান্ত conventional বাঙলা উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ। জীবনটাও কি এমনি মামুলি ভাবে চলে? আমাদের গুরুজনেরা আমাদের যা বলে উপহাস করেন, তাঁদের সেই সংস্কারাচ্ছন্ন যুক্তিই কি টিকে থাকবে? আমাদের সমস্ত idealism সব স্বপ্নই কি মিথ্যা? দান্তে কি পাগল ছিল? আর শেলি বোকা? পৃথিবীতে কি কোথাও কবিতা নেই? কবিতা যারা লেখে তারা কি এমনি ভিন্ন জাতের লোক যে তারা সবাইকে শুধু ভুলই বুঝবে? কবির চোখে পরমসুন্দরের যে ছায়া পড়েছে আর কেউ কি তা দেখতে পাবে না? পৃথিবীর সব লোকই কি অন্ধ?

কী প্রচুর বিশ্বাস নিয়ে আমরা চলি, এর জন্য কত ত্যাগস্বীকার করি, কত দুঃখবরণ করে নিই। এ কথা কি কখনো ভাববার যে এর প্রতিদান

এই হতে পারে? আমরা যে নিজেকে একান্ত ভাবে ঢেলে দিয়ে কতুর হয়ে থাকি সে দেয়ার কোনো কূলকিনারা থাকে না। সেই দান যদি অগ্রাহ্য হয়, তাহলে আবার নতুন করে জীবন গড়ে তুলতে পারি এমন ক্ষমতা আমাদের থাকে না। এটা কি আমাদের প্রতি মস্ত অবিচার করা হয় না—অন্যের জীবনকে এমন ভাবে নিষ্ফল করে দেয়ার কি অধিকার আছে? ইতি তোমাদের বুদ্ধদেব”

একবার একসঙ্গে ফিরলাম দুজনে ঢাকা থেকে—বুদ্ধদেব আর আমি। ইস্টিমারে সাধারণ ডেকের যাত্রী—সে ডেকে পাশে বাক্স-তোরঙ্গ রেখে সতরঞ্চি বিছিয়ে হয় ঘুম, নয় তো তাসখেলাই একমাত্র সুকাজ। কিন্তু শুদ্ধ গল্প করেই যে রাশি-রাশি মুগ্ধ মুহূর্ত অপব্যয় করা যায় তা কে জানত। সে গল্পের বিষয় লাগে না, প্রস্তুতি লাগে না। পরিবেশ লাগেনা। যা ছিল আজেবাজে, অর্থাৎ আজ-বাদে কাল যা বাজে হয়ে যাবে, তাতেই ছিল চিরকালের বাজনা।

একটানা জলের শব্দ—আমাদের কথার তোড়ে তা আর লক্ষ্যের মধ্যে আসছে না। কিন্তু স্টিমার যখন-ভোঁ দিয়ে উঠত, তখন একটা গম্ভীর চমক লাগত বুকের মধ্যে। যতক্ষণ না ধ্বনিটা শেষ হত কথা বন্ধ করে থাকতাম। কোনো স্টেশনের কাছাকাছি এলে বা ছেড়ে যাবার উপক্রম করলেই স্টিমার বাঁশি দিত। কিন্তু যখনই বাঁশি বাজত, মনে হত এটা যেন চলে যাবার সুর, ছেড়ে যাবার ইসারা। ট্রেনের সিটির মধ্যে কি-রকম একটা কর্কশ উল্লাস আছে, কিন্তু স্টিমারের বাঁশির মধ্যে কেমন একটা প্রচ্ছন্ন বিষাদ। স্থির স্থলকে লক্ষ্য করে চঞ্চল জলের যে কান্না, এ যেন তারই প্রতীক।

আমার বাসা তখন তিরিশ নম্বর গিরিশ মুখার্জি রোড। সংক্ষেপে তিরিশ গিরিশ। তারই এক তলার এক ছোট্ট কুঠুরিতে আমি সর্বময়। সেই কৃশ-কৃপণ ঘরেই উদার হৃদ্যতায় আতিথ্য নিয়েছে বন্ধুরা। বুদ্ধদেব

আর অজিত, কখনো বা অনিল আর অমলেন্দু। সেই ছোট বদ্ধ ঘরের দেওয়াল যে কি করে সরে-সরে মিলিয়ে যেত দিগন্তে, কি করে সামান্ত শূন্ত বিশাল আকাশ হয়ে উঠত, আজ তা স্বপ্নের মত মনে হয়। হৃদয় যে পৃথিবীর সমস্ত স্থানের চেয়ে বিস্তারময় তা কে না জানে।

"ভাই অচিন্ত্য,

নারায়ণগঞ্জে কয়েক ঘণ্টা halt করে আজ সন্ধ্যায় বাড়ি এসে পৌঁচেছি। টুনু আগেই এসেছিল। মা আমার সঙ্গে এলেন না, আপাতত তিনি দিনকতক নারায়ণগঞ্জেই কাটাবেন। এতে আমারই হল মুস্কিল। মা না থাকলে এ বাড়ি আমার কাছে শূন্ত, অর্থহীন। শারীরিক অস্থবিধে, আশ্বাস ইত্যাদি ছাড়াও মা-র অভাব আমার কাছে অনেকখানি। মা না থাকলে মনে হয় না যে এ বাড়িতে আমার সত্যিকার স্থান আছে। ছুটির বাকি কটা দিন খুব যে স্থখে কাটবে এমন মনে হচ্ছে না। এখন আপশোষ হচ্ছে এত শিগগির চলে এলাম বলে। ভাবছি, আরো কয়েকটা দিন কাটিয়ে এলে কারুর কিছু ক্ষতি হত না—এক তোমার ছাড়া;—তা তোমার ওপর জোর কি আবদার চলে বই কি। কলকাতায় এই দিনগুলি যে কি ভরপুর আনন্দে কেটেছে এখন বুঝতে পারছি। তোমাদের প্রত্যেকের কথা কী গভীর স্নেহের সঙ্গেই না স্মরণ করছি। বিশেষ করে স্থধীশকে মনে পড়ছে। আসবার সময় স্টেশনে ওব মুখখানা ভারি মলিন দেখেছিলাম।

ঢাকা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে—পথঘাট নির্জ্জন। পরিমল বাড়ি চলে গেছে, থাকবার মধ্যে অমল আর অনিল। সন্ধ্যেবেলায় ওদের সঙ্গে খানিকক্ষণ ঘুরলাম—টুনুও ছিলো। এখানে এখন কিছুই যেন করার নেই। আমার ঘরটা নোংরা, অগোছাল হয়ে আছে—মার হাত না পড়লে শোধরাবে না। এখন পর্য্যন্ত জিনিসপত্রও খুলিনি—ভারি ক্লান্ত লাগছে অথচ ঘুম আসছে না। কাল দিনের বেলায় সব সিজিলমিছিল

করে গুছিয়ে বসতে হবে। তারপর একবার কাজের মধ্যে ডুব দিতে পারলেই হু-হু করে দিন কেটে যাবে।

'কল্লোলে'র সবাইকে আমাদের কথা বোলো। তোমাদের সঙ্গে আবার যে কবে দেখা হবে তারি দিন গুনছি। ইতি। চিরানুরক্ত বুদ্ধদেব"

"ভাই অচিন্ত্য,

D. R. "স্বদেশী-বাজারের" গল্প পড়ে আমাকে চিঠি লিখেছেন গল্প চেয়ে। প্রত্যুত্তরে আমি একটি গল্প পাঠিয়ে দিয়েছি। টাকার কথা খোলাখুলি লিখেছি—সেটাই ভালো। লেখাটা in itself আর আমার life-এর কোন point নয়; অর্থাগমের সম্ভাবনা না দেখলে আর লিখবো না—লিখতে ইচ্ছাও করে না। এই জন্যই মাসখানেকের মধ্যে এক লাইনও কবিতা লিখিনি। আত্মসমর্থনকল্পে D. R.-কে অনেক কথা লিখতে হয়েছে। আশা করি সে চিঠি ও গল্প তুমি পড়েছ।

এখন পর্য্যন্ত যে ব্যবস্থা আছে তাতে ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যেই কলকাতায় গিয়ে উপস্থিত হতে পারবো, আশা করি। কলেজ ছুটি হবার আগেই পালাবো; কারণ তা না হলে অসম্ভব ভিড়ে পথিমধ্যেই প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে। ক্যাপটেন ঘোষ নেবুতলায় বাসা নিয়েছেন, তাঁর ওখানে এবার উঠবো। তোমার ল'-র কথা আমিও ভেবে রেখেছি। রোজ বিকালে দেখা হলেই চলবে। ভৃগুও কলকাতায় আসবে। টুনুর ঠিক নেই, ওর first class পাওয়া এখন সব চেয়ে দরকার। শীতের ছোট দিন—মিষ্টি রোদ—দুচারজন বন্ধু, সময়ের আবার ডানা গজাবে, ছোটখাট জিনিস নিয়ে খুশির আর অন্ত থাকবে না।

'প্রগতি' তুলে দিলাম। অসম্ভব—অসম্ভব—আর চালানো একেবারে অসম্ভব। আমার ইহকাল-পরকালে, অন্তরে-বাহিরে, বাক্যে-মনে আর আপনার বলে' কিছু রইলো না। কত আশা নিয়েই যে সুরু

করেছিলাম, কত উচ্চাভিলাষ, স্নেহ, আনন্দ—কী প্রকাণ্ড idealism-ই এর পেছনে ছিলো। যাক, এখন বাজারে যা কিছু ধার আছে তা একটু-একটু করে শোধ করে উঠতে পারলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। অত্যন্ত প্রিয়জনও দীর্ঘকাল বিষম রোগে ভুগলে যেমন তার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় হয়ে ওঠে, 'প্রগতি'ও শেষের দিকে তেমনি অসহ্য হয়ে উঠেছিল। 'প্রগতির' মৃত্যুসংবাদ কলকাতায় ব্রডকাস্ট করে দিয়ো। তুমি আমার প্রাণপূর্ণ ভালোবাসা নাও। ইতি। তোমার বুদ্ধদেব"

"অচিন্ত্য,

শেষ পর্য্যন্ত 'প্রগতি' বোধহয় উঠে গেলো না। তুমি বলবে অমন প্রাণান্ত করে চালিয়ে লাভ কি? লাভ আছে।

পরিমলবাবুর (ঘোষ) সঙ্গে আজ কথা কয়ে এলাম। তিনি পঁচিশ টাকার মত মাসিক সাহায্য জুটিয়ে দিতে পারবেন, আশ্বাস দিলেন। আমি কলকাতায় দশের ব্যবস্থা করেছি। সবসুদ্ধ পঞ্চাশ টাকার মত দেখা যাচ্ছে। আরো কিছু পাবো আশা করা যাচ্ছে। তার ওপর বিজ্ঞাপনে দুটো-পাঁচটা টাকা কি আর না উঠবে! উপস্থিত ঋণ শোধ করবার মত উপায়ও পরিমলবাবু বাৎলে দিলেন। এবং কাগজ যদি চলেই, কিছু ঋণ থাকলে যায় আসে না।

তোমার কাছে কিছু সাহায্য চাই। পাঁচটা টাকা তুমি সহজেই spare করতে পারো। সম্পূর্ণ নিজেদের একটা কাগজ থাকা—সেটা কি কম সুখের? আধুনিক সাহিত্যের আন্দোলনটা আমরা কয়েকজনে মিলে control করছি, এ কথা ভাবতে পারার luxury কি কম? কিন্তু তোমার সঙ্গে argue করেই বা কি লাভ? তোমার কাছে শুধু মিনতি করতে পারি।

মনে হচ্ছে কাকে যেন হারাতে বসেছিলাম, ফিরে পেতে চলেছি।

শরীর যদিও অত্যন্ত খারাপ, মন ভালো লাগছে। কিন্তু তুমি আমাকে নিরাশ করো না। With love, B."

"কল্লোল" থেকে কচিৎ যেতাম আমরা চীনে পাড়ার রেস্তরাঁতে। তখন নানকিন ক্যাণ্টন আর চাঙোয়া তিনটেই চীনে-পাড়ার মধ্যেই ছিল, একটাও বেরিয়ে আসেনি কুলচ্যুত হয়ে। ব্ল্যাক আর বার্ন দুটো কথাই কদাকার, কিন্তু ব্ল্যাকবার্ন একত্র হয়ে যখন একটা গলির সঙ্কেত আনে তখন স্বপ্নে-দেখা একটা রূপকথার রাজ্য বলে মনে হয়!

শহরের কৃত্রিম একঘেয়েমির মধ্যে থেকে হঠাৎ যেন একটা ছুটির সংবাদ। রুক্ষ রুটিনের পর হঠাৎ যেন একটু সুন্দর অসম্বদ্ধতা—সুন্দর অযত্নবিন্যাস। দেশের মধ্যে বিদেশ—কর্তব্যের মধ্যখানে হঠাৎ একটু দিবাস্বপ্ন।

এলেই চট করে মনে হয় আর কোথাও যেন এসেছি। শুধু আলাদা নয়, বেশ একটু অচেনা-অচেনা। সমস্ত শহরের ছুটোছুটির ছন্দের সঙ্গে এখানকার কোনো মিল নেই। এখানে সব যেন ঢিলে-ঢালা, ঢিমে-তেতালা। খাটো-খাটো পোশাকে বেঁটে-বেঁটে কতকগুলি লোক, আর পুতুলের মত অগুনতি শিশু। ভাসা-ভাসা চোখে হাসি-হাসি মুখ! একেকটা হরফে একেকটা ছবি এমনি সব চিত্রিত সাইনবোর্ডে বিচিত্র দোকান। ভিতরের দিকটা অন্ধকার, যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন, কারা হয়ত ঠুকঠাক কাজ করছে আপন মনে, কারা হয়তো বা চুপচাপ জুয়ো খেলছে গুম হয়ে আর দীর্ঘ নলে প্রচণ্ড ধূমপান করছে। যারা চলেছে তারা যেন ঠিক চলে যাচ্ছে না, ঘোরাফেরা করছে। ভিড়ে-ভাড়ে যতটা গোলমাল হওয়া দরকার তার চেয়ে অনেক নিঃশব্দ। হয়তো কখনো একটা রিকশার টুং-টাং, কিংবা একটা ফিটনের খুটখাট। সবই যেন আস্তে-সুস্থে গড়িমসি করে চলেছে। এদের চোখের মত গ্যাসপোস্টের আলোও যেন কেমন ঘোলাটে, মিটিমিটি। ভয়ে পা-টা যেন একটু

ছমছম করে। আর ছমছম করে বলেই সব সময়েই এত নতুন নতুন মনে হয়। কোনো জিনিসের নতুনত্ব বজায় রাখতে পারে শুধু দুটো জিনিস—এক ভয়, দুই ভালোবাসা।

সরু গলি, আবছা আলো, অকুলীন পাড়া,—অথচ এরি মধ্যে জাঁকালো রেস্তরাঁ, সাজসজ্জার ঢালাঢালি। হাতির দাঁতের কাঠিতে চাউ-চাউ খাবে, না সপ-সুই? না কি আস্ত-সমস্ত একটি পক্ষীনীড়? এ এমন একটা জায়গা যেখানে শুধু জঠরেরই খিদে মেটে না, চিত্তের উপবাস মেটে—যে চিত্ত একটু সুন্দর কবিতা, সুন্দর বন্ধুতা, আর সুন্দর পরিবেশের জন্যে সমুৎসুক।

তখন একটা বাগভঙ্গি চলেছে আধুনিকদের লেখায়। সেটা হচ্ছে গল্পে-উপন্যাসে ক্রিয়াপদে বর্তমানকালের ব্যবহার। এ পর্যন্ত রাম বললে, রাম খেল, রাম হাসল ছিল—এখন সুরু হল রাম বলে, রাম খায়, রাম হাসে। সর্বনাশ, প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম যে, "শনিবারের চিঠি" ব্যঙ্গ সুরু করল। অথচ সজনীকান্তর প্রথম উপন্যাস "অজয়ে" এই বর্তমান-কালের ক্রিয়াপদ। একবার এক ডাক্তার বসন্তের প্রতিষেধকরূপে টিকে নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালায়। সভা করে-করে সকলকে জ্ঞান বিলোয়, টিকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। এমনি এক টিকাবর্জন সভায় বক্তৃতা দিচ্ছে ডাক্তার, অমনি ভিড়ের মধ্যে থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল: তুমি তোমার আস্তিন গুটোও দেখি। আস্তিন গুটিয়ে দেখা গেল ডাক্তারের নিজের হাতে টিকে দেওয়া।

তেমনি আরেকটা চলেছিল বানানভঙ্গি। সংস্কৃত শব্দের বানানকে বিশুদ্ধ রেখে বাংলা বা দেশজ শব্দের বানানকে সরল করে আনা। নীচ যে অর্থে নিকৃষ্ট তাকে নীচই রাখা আর যে অর্থে নিম্ন তাকে নিচে ফেলা। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে ণত্ব-ষত্ব বিধানকে উড়িয়ে দেওয়া—তিনটে স-কে একীভূত করার সূত্র খোঁজা। রবীন্দ্রনাথ যে কেন চষমা বা জিনিষ বা

পুষতু লিখবেন তা তো বুঝে ওঠা যায় না। রানি বলতেই বা মূর্ধন্য ণ লোপ করবেন তো দীর্ঘ ঈ-কার কেন লোপ করবেন না তা কে বলবে। কিন্তু সব চেয়ে পীড়াদায়ক হয়ে উঠল মূর্ধন্য ষ-এর সঙ্গে ট-এর সম্মিলন। নষ্ট-ভ্রষ্ট স্পষ্ট করে লেখ, আপত্তি নেই, কিন্তু স্টিমার স্টেশন অগাস্ট ক্রিস্টমাসের বেলায় মূর্ধন্য ষ-এ ট দেবার যুক্তি কি? একমাত্র যুক্তি দন্ত্য স-এ ট-র টাইপ নেই ছাপাখানায়—যেটা কোনো যুক্তিই নয়। টাইপ নেই তো দন্ত্য স-য় হসন্ত দিয়ে লেখা যাক। যথা স্‌টিমার, স্‌টেশন স্‌ট্যাম্প আর স্‌টেথিসকোপ। নিন্দুকেরা ভাবলে এ আবার কী নতুন রকম সুরু করলে। লাগো হসন্তের পিছনে। হসন্ত খসিয়ে দিয়ে তারা কথাগুলোকে নতুন রূপসজ্জা দিলে—সটিমার আর সটেশন—আহা, কি সটাইল রে বাবা!

সজনীকান্ত একদিন কল্লোল-আপিসে এসে উপস্থিত হল। আড্ডা জমাতে নয় অবিশ্যি, কখানা পুরানো কাগজ কিনতে নগদ দামে। উদ্দেশ্য মহৎ, সাধ্যমত প্রচার করতে কাউকে। ভাবখানা এমন একটু প্রশ্রয় পেলেই যেন আড্ডার ভোজে পাত পেড়ে বসে পড়ে। আসলে সজনীকান্ত তো "কল্লোলেরই" লোক, ভুল করে অন্য পাড়ায় ঘর নিয়েছে। এই রোয়াকে না বসে বসেছে অন্য রোয়াকে। তেমনি দীনেশরঞ্জনও "শনিবারের চিঠির" হেড পিয়াদা! "শনিবারের চিঠির" প্রথম হেডপিস, বেত্রহস্ত ষণ্ডামার্কের ছবিটি তাঁরই আঁকা। সবই এক ঝাঁকের কই, এক সানকির ইয়ার, শুধু টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। নইলে একই কর্মনিষ্ঠা। একই তেজ। একই পুরুষকার।

প্রেমেন শুয়ে ছিল তক্তপোষে। বললুম, 'আলাপ করিয়ে দিই—'

টানা একটু প্রশ্রয় দিলেই সজনীকান্তকে অনায়াসে চেয়ার থেকে টেনে এনে শুইয়ে দেয়া যেত তক্তপোষে—অঢেল আড্ডার ঢিলেমিতে। কিন্তু কলির ভীমের মত প্রেমেন হঠাৎ হুমকে উঠল: 'কে সজনী দাস?'

এ একেবারে দরজায় খিল চেপে ঘর বন্ধ করে দেওয়া। আলো নিবিয়ে মাথার উপরে লেপ টেনে দিয়ে ঘুমুনো। প্রশ্নের উত্তর থাকলেও প্রশ্নকর্তার কান নেই। আবার শুয়ে পড়ল প্রেমেন।

সজনীকান্ত হাসল হয়তো মনে মনে। ভাবখানা, কে সজনী দাস, দেখাচ্ছি তোমাকে।

টেকনিক বদলাল সজনীকান্ত। অত্যল্পকালের মধ্যে প্রেমেনকে বন্ধু করে ফেলল।

সঙ্গে-সঙ্গে শৈলজা। ক্রমে-ক্রমে নজরুল। পিছু-পিছু নৃপেন।

শক্তিধর সজনীকান্ত! লেখনীতে তো বটেই, ব্যক্তিত্বেও।

পুরীতে বেড়াতে গিয়েছি, সঙ্গে বুদ্ধদেব আর অজিত। একদিন দেখি সমুদ্র থেকে কে উঠে আসছে। পুরাণে-মহাভারতে দেখেছি কেউ কেউ অমনি উদ্ভূত হয়েছে সমুদ্র থেকে। তাদের কারুর হাতে বিষভাণ্ডও হয়তো ছিল। কিন্তু এমনটি কাউকে দেখব তা কল্পনাও করতে পারিনি। আর কেউ নয়, স্বয়ং সজনীকান্ত।

একই হোটেলে আছি। প্রায় একই ভোজনভ্রমণের গণ্ডীর মধ্যে। একই হাস্যপরিহাসের পরিমণ্ডলে।

সজনীকান্ত বললে, শুধু বিষভাণ্ড নয়, সুধাপাত্রও আছে। অর্থাৎ বন্ধু হবারও গুণ আছে আমার মধ্যে।

তাতে সন্দেহ কি, কিন্তু আমরাও যদি বন্ধু হয়ে যাই তবে ব্যবসা চলবে কি দিয়ে? কাকে নিয়ে থাকবে? গালাগালের মধ্যে ব্যক্তিবিদ্বেষ একটু মেশাতে হবে তো? বন্ধু করে ফেললে ঐটুকু ঝাঁজ আনবে কোত্থেকে? তোমার ব্যবসায় মন্দা পড়বে যে।

কথাটা ঠিকই বলেছ। তোমাদের সাহিত্য, আমাদের ব্যবসা। সাহিত্যিকরা রাজহাঁস আর ব্যবসায়ীরা পাতিহাঁস। পাতিহাঁসের খাদ্য জল-কাদা, রাজহাঁসের খাদ্য দুধ। কিন্তু গালাগাল সইতে পারবে তো?

গালাগাল দিচ্ছ কে বলছে? দস্যু রত্নাকরও প্রথমে 'মরা' 'মরা' বলেছিল। মরার বাড়া গাল নেই। সবাই ভেবেছিল বুঝি গাল দিচ্ছে। কিন্তু, জানো তো, 'ম' মানে ঈশ্বর, আর 'রা' মানে জগৎ—আগে ঈশ্বর পরে জগৎ। তরে গেল রত্নাকর। অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের স্তব করলেন, প্রথমেই বললেন, অচিন্ত্যং অব্যক্তং অনন্তং অব্যয়ং! আর বুদ্ধদেব,—তিনি তো ভগবান তথাগত—'নামোচ্চারণভেষজাৎ' তুমিও পার হয়ে যাবে দেখো।

আর তোমরা?

আমরা তো ভালো দলেই আছি। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী থেকে সুরু করে নজরুল ইসলাম পর্যন্ত সবাইর সঙ্গে আমরাও নিন্দার এক পঙক্তিতে বসেছি—আমাদের ভয় নেই!

তথাস্তু! তবে একটা নব সাহিত্য-বন্দনা শোন:

"জয় নবসাহিত্য জয় হে
জয় শাশ্বত, জয় নিত্যসাহিত্য জয় হে।
জয়, অধুনা-প্রবর্ত্তিত বঙ্গে
রহ চিরপ্রচলিত রঙ্গে
শ্রমিকের, ধনিকের, গণিকার, বণিকের
সাম্যের কাম্যের, শাশ্বত ক্ষণিকের—
জড় ও পাষাণের ভস্ম ও শ্মশানের
আঁস্তাকুড়ে যাহা ফেলি উদ্বৃত্ত হে
সকল অভিনব-সাহিত্য জয় হে।
প্রগতি-কল্লোল-কালিকলম
অন্তর ক্ষতেতে লেপিলে মলম
রসের নব নব অভিব্যক্তি
উত্তরা ধূপছায়া আত্মশক্তি—

[illegible] বিভিন্ন নিত্য   গঙ্গার সলিলে অভিষিক্ত
জয় নব সাহিত্য জয় হে
জয় হে জয় হে জয় হে
প্রাচীন হইল রসাতলগত, তরুণ হল নির্ভয় হে
জয় হে জয় হে জয় হে।"

হেম বাগচির সঙ্গে আলাপ হয় বলাই সিংহি লেন-এর মেসে। জীবনানন্দের বেলায় যেমন, ওর বেলায়ও ওর ঠিকানা খুঁজে নিয়ে ওকে বার করি। নতুন-লেখক বা শিল্পী খুঁজে নিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করাতে দারুণ উৎসাহ, বিশেষত সে যদি মর্মজ্ঞ হয়। হেম হচ্ছে তেমন কবি যার সান্নিধ্যে এসে বসলে মনে হয় নিবিড়স্নিগ্ধ বৃক্ষছায়াতলে এসে বসেছি। সবল-বিশাল চেহারা, চোখ দুটি দীর্ঘ ও শীতল—স্বপ্নময়। তীব্রতার চেয়ে প্রশান্তি, গাঢ়তার চেয়ে গভীরতার দিকে দৃষ্টি বেশি। প্রথম যখন ওকে পাই তখন ওর জীবনে সদ্য মাতৃবিয়োগব্যথার ছায়া পড়েছে—সেই ছায়ায় ওর জীবনের সমস্ত ভঙ্গিটি কমনীয়। সেই লাবণ্যটি সমস্ত জীবনে সে স্নেহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে লালন করেছে, তাই তার কবিতায় এই শুচিতা এই স্নিগ্ধতা। হার্ডিঞ্জ হস্টেলে থেকে হেম যখন ল পড়ে তখন প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় চারতলার উপরে তার ঘরে আড্ডা দিতে গিয়েছি, দ্বৈত কলকূজন ছেড়ে পরে চলে এসেছি বহুস্বননের "কল্লোলে"। কোনো উদ্দামতায় হেম নেই, সে আছে নির্মল স্থৈর্যে, কোনো তর্কতীক্ষ্ণতায় সে নেই; সে আছে উত্তপ্ত উপলব্ধিতে। নিকষকষিত সোনার মতই সে মহার্ঘ।

কিন্তু প্রবোধকুমার সান্যাল অন্য জাতের মানুষ। ক্ষিতি-অপ-তেজ হয়তো ঠিকই আছে, কিন্তু মরুৎ আর ব্যোম যেন অন্য জগতের। মুক্ত হাওয়ার মুক্ত আকাশের মানুষ সে, আর সেই হাওয়া আর আকাশ আমাদের এই বদ্ধ জলার জীবনে অল্পদৃষ্ট। তাকে খুঁজে নিতে হয় না,

সে আপনা থেকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। "কল্লোলে" প্রথম বছরেই তাঁর গল্প বেরোয়, কিন্তু সশরীরে সে দেখা দেয় চতুর্থ বর্ষে। আর দেখা দেওয়া মাত্রই তার সঙ্গে রক্তের রাখিবন্ধন হয়ে গেল। প্রবোধের চরিত্রে একটা প্রবল বন্যতা ছিল, সেই সঙ্গে ছিল একটি আশ্চর্য স্থৈর্য ও দৃঢ়তার প্রতিশ্রুতি। বাসা ভেঙে দিতে পারে প্রবোধ, কিন্তু কোনোদিন আশ্রয় তুলে দেবে না কিছুতেই। বিচ্ছেদ আছে প্রবোধের কাছে, কিন্তু বিয়োগ নেই। সমস্ত চাঞ্চল্য-চাপল্য সত্ত্বেও তার হৃদয়ে একটা বলিষ্ঠ ঔদার্য আছে, সমস্ত উত্থানে-পতনে তার মধ্যে জেগে আছে ঘরছাড়া সদাতৃপ্ত সন্ন্যাসী। দুর্বিপাকে পড়েও তার এই উদারতা ঘোচে না। শত ঝড়েও মুছে যায় না তার মনের নীলাকাশ। আর সকলের সঙ্গে বুদ্ধির ও বিদ্যার যোগাযোগ, প্রবোধের সঙ্গে একেবারে অন্তরের সংস্পর্শ। ওর মাঝে মেঘ এলেও মলিনতা আসে না। 'রমতা' সাধু আর 'বহতা' জল, মানে যে সাধু ঘুরে বেড়ায় আর যে জলে নিরন্তর স্রোত বয়, তা কখনো মলিন হয় না।

উনিশ

ঘর ছোট কিন্তু হৃদয় অসীমব্যাপ্ত। প্রচেষ্টা সংকীর্ণ কিন্তু কল্পনা, অকুতোভয়। লেখনীতে কুণ্ঠা কিন্তু অন্তরে অকাপট্যের তেজ।

যেহেতু আমরা সাহিত্যিক সেহেতু আমরা সমগ্র বিশ্বজনের আত্মজন এমনি একটা গর্ব ছিল মনে-মনে। সমস্ত রসপিপাসু মনের আমরা প্রতিবেশী। আমাদের জন্যে দেশের ব্যবধান নেই, ভাষার অন্তরায় নেই। আমাদের গতিবিধি পরিধিহীন। সকলের মনের নির্জনে আমাদের নিত্যকালের নিমন্ত্রণ' পৃথিবীর সমস্ত কবি ও লেখকের সঙ্গে আমরা সমবেত হয়েছি একই মন্দিরে, সম্মিলিত হয়েছি একই উপাসনায়। আসনের তারতম্য আছে, আছে ভাষণের গুণভেদ—কিন্তু সন্দেহ কি, সত্যের দেবালয়ে সুন্দরের বন্দনায় একত্র হয়েছি সকলে, এক সামমন্ত্রে! সমস্ত পৃথিবী আমাদের স্বদেশ, সমস্ত মানুষ আমাদের ভাই—সেই অব্যর্থ প্রতিশ্রুতিতে।

সুদূর বাঙলার নবীন লেখক বিশ্বের দরবারে কীর্তিমানদের সঙ্গে সমানধর্মিতা দাবি করছে—সাহস আছে বটে। কিন্তু "কল্লোলের" সে যুগটাই সাহসের যুগ, যে সাহসে রোমান্টিসিজমের মোহ মাখানো। শুধু সূত্রপাতের সাহস নয়, সম্পূরণের সাহস। সেই সাহসে একদিন আমরা বিশ্বের প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের মিত্রতা দাবি করে বসলাম, নিমন্ত্রণ করলাম আমাদের যজ্ঞসভায়। আমাদের এই গুপুরি-নারকেল ধান-পাটের দেশকে যিনি বিশ্বের মানচিত্রে চিত্রিত করেছেন সেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরিচায়ক। ভাষায় উত্তাপ ছিল, ছিল ভাবের আন্তরিকতা, অনেকেই প্রত্যভিবাদন করলেন "কল্লোলকে"।

ইতঃপূর্বে ডক্টর কালিদাস নাগ গোকুলের সঙ্গে "জাঁ ক্রিস্তফ্" অনুবাদ সুরু করেছেন। গোকুল মারা যাবার পর শান্তা দেবী হাত মেলালেন অনুবাদে। কালিদাসবাবুই রলাঁর আত্মিক দীপ্তির প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় নিয়ে এলেন "কল্লোলে"। ফ্রান্সে ছিলেন শিক্ষাব্যপদেশে, আর ছিলেন রলাঁর সহসান্নিধ্যের স্নেহচ্ছায়ায়। তাই প্রথম আমরা রলাঁকেই চিঠি লিখলাম। চিঠির ইতিতে প্রথমে সই করল দীনেশরঞ্জন—যজ্ঞের পুরোধা, পরে আমরা—যজ্ঞভাগীরা।

মহাপ্রাণ রলাঁ মহামানবের ভাষায় সে চিঠির উত্তর দিলেন। ফরাসীতে লেখা সেই চিঠি ইংরিজিতে তর্জমা করেছেন কালিদাসবাবু:

February 8, 1925

Dear Sir,

I have received two of your kind letters—the letter which you collectively addressed to me with your collaborators and that of 15th January accompanying the parcel of your Review. I beg to thank you cordially for that.

I am happy that my dear friend Dr. Kalidas Nag presents my "Jean Christophe" to the readers of Kallol and that my vagabond child—Christohhe starts exploring the routes of India after having traversed through the heart of Europe. He carries in his sack a double secret which seems contradictory : *Revolt* and *Harmony*. He learnt the first quite early. The second came to him only after years from the hands of *Grazia*. May every one of my friends meet *Grazia* (real or symbolical) !

I have sent to you a few days ago one of my photographs as you have asked and I have written on the back of it a few lines in French : for I don't write English. And it is absolutely necessary that you should

learn a little French or one of the Latin languages which are much nearer to your language (Bengali) by the warm and musical sonority than the English language.

Now I in my turn demand certain things from you. While you do me the honour of translating Jean Christophe in Bengali, some of my European friends desire to be familiar with your modern literature—novels, (romance) short stories, essays etc, from the Indian writers, which may be published gradually by Emil Roninger of Zuric who has already taken the initiative in publishing the works of Gandhi. What is wanted is the translation of your contemporary publications, as for example, we shall be happy to know the works of Saratchandra Chatterjee whose small volume of *Srikanta* translated by K. C, Sen and Thompson, has struck our imagination by his art and original personality. Is it possible to arrange for the translation of some of the prose works of your most distinguished living authors? That would be a work which will glorify your country, for they would be translated and spread in different countries of the west.

I would request the young writers of India to publish in English the *biographies* of the great personalities of India: Poets, Artists, Thinkers etc. on the same models as my lives of Bethoven, Michael Angelo, Tolstoy, and Mahatma Gandhi. Nothing is better qualified to inspire the admiration and love for India in the heart of Europe which knows them not: Europe is strongly individualistic, she will always be struck more by a *Figure*, by *a Person* than by an Idea. Show her your great men—Sages and your Heroes.

I submit to you these suggestions and I request you

dear Dinesh Ranjan Das and your collaborators of Kallol, to believe me to be your cordial and devoted friend.

Romain Rolland

যে ফটোগ্রাফটি পাঠিয়েছিলেন তার পিঠেও ফরাসীতে লিখে দিয়েছিলেন কয়েক লাইন। তার ইংরিজি অনুবাদ এইরূপ :

To my Friends of India :

Europe and Asia form one and the same vessel. Of that the prow is Europe. And the chamber of watching is India, Empress of Thought, of innumerable eyes. Light to thee, mine eyes. For thou belongs to me. And mine sprit is Thine. We are nothing but one indivisible Being.

Romain Rolland

রলাঁর বোন কিন্তু ইংরিজিতে চিঠি লিখলেন, আর সব চেয়ে আশ্চর্য, সুদূর বিদেশে থেকেও বাঙলা ভাষা তিনি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছেন —শুধু পড়া নয়, লেখাও। তাঁর চিঠিটা দীনেশরঞ্জনের গল্পের বই "মাটির নেশা"কে অবলম্বন করে লেখা—কিন্তু, আসলে, বাঙলা সাহিত্যের প্রতি মমত্বপ্রেরিত। মূল চিঠিটাই তুলে দিচ্ছি :

February 10/26.
Villa Olga.

Dear Mr. Dass,

I did not thank you sooner for the books you sent to my brother and to me with such kind messages inscribed on them, because—as I wrote to Dr. Nag last month, I wanted to peruse at least part of their contents before acknowledging your gift.

In spite of my limited knowledge of your language I was able to understand and enjoy fully the stories read in your মাটির নেশা. Of course I may have missed

many a nice shade and I do not pretend to judge the literary merit of the style! But I can appreciate the *substance* of them. And পার্ব্বতীর piety and motherly love for the foundling, the poor cobbler দুলাল's misfortunes in the city, the domestic scenes in the story কমল মধু awoke in me a twofold interest: making me once more aware of the oneness of human nature and setting up before my western eyes a vivid picture of Eastern customs of every day life.

I thank you too for Gokulchandra Nag's works. I was deeply moved by মাধুরী. But I shall write later on to his brother about it.

I want also to tell you in my brother's name and my own, how much we appreciate the gallant effort of কল্লোল. My wish is to grow more able to follow closely what it publishes (I am still a slave to my dictionary and plod on wasting much precious time) so that I may deserve at last a small part of the praise Dr. Nag gave me in the পৌষ number and of which I am quite unworthy.

Sending you my brother's best greetings, you, dear Mr. Das, most sincerely.

Yours
Maudline Rolland

চিঠিটার মধ্যে লক্ষিতব্য বিষয় হচ্ছে, বাংলা কথাগুলো ভাঙা-ভাঙা বাংলা হরফে লেখা।

তেমনি চিঠি লিখল জাসিন্তো বেনাভাতে, যোয়ান বোয়ার আর কুট হামসুনের পক্ষে তাঁর স্ত্রী। চিঠিগুলি অবিশ্যি মামুলি—সেটা বিষয় নয়, বিষয় হচ্ছে তাঁদের সৌজন্য, তাঁদের মিত্রতার স্বীকৃতি। সেই স্বীকৃতিতেই তারা মূল্যবান।

Mr. Dinah Ranjan Das,

Dear Sir,

Thank you with all my heart for your letter. I send you the photo you ask for. Some of my works are published in America (English translation) but I have not the volumes.

My best salutation to your friends and believe yours.

Jacinto Benavente

Madrid, Spain $\frac{6}{25}$

Hvalstad, 2. 4. 25. (Norway)

To

Kallol Publishing House

and my friends in Calcutta.

It is with the greatest pleasure I have lately received your greetings. Please accept my best wishes and my fraternal compliments.

Sicerely

Johan Bojer.

Grimstad, Norway

Dear Sir,

My husband asks me to thank you very much for the friendly letter.

Respectfully yours

Mrs. Knut Hamsun.

উপরের তিনটি চিঠিই ইংরিজিতে লেখা—স্বহস্তে। একমাত্র রমাঁ রলাঁই পরভাষায় লেখেন না দেখা যাচ্ছে। আর রবার্ট ব্রিজেস-এর পক্ষ থেকে পাওয়া গেল এই চিঠিটা :

Chilswell
Boar's Hill
Oxford, July 15

Dear Sir

I write at Mr. Robert Bridges' request to send you in response to your letter of June 18 a photograph.

He also suggests that I should send you a copy of the latest tract brought out by the *Society of Pure English*, which he thinks will interest the Group that you write of.

Yours faithfully
M. M. Bridges.

কিন্তু এইচ জি ওয়েলসের চিঠিটা সারবান। সোনার অক্ষরে বাঁধিয়ে রাখার মত॥

Easton Glebe
Dunmow

Warmest greetings to your friendly band and all good wishes to *Kallol*. An Englishman should be a good Englishman and a Bengali should be a good Bengali but also each of them should be a good world citizen and both fellow workers in the great Republic of Human Thought and Effort.

Feb. 14th, 1925. *H. G. Wells.*

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মান্য-বরেণ্যকেই অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। উপরি-উক্তরা ছাড়া অবশিষ্টগণ কেউ হয়ত পাননি চিঠি, কেউ হয়তো বা উপেক্ষা করলেন। কিন্তু সব চেয়ে প্রাণস্পর্শ করল ইয়োন নোগুচি। সোজাসুজি কবিতা পাঠিয়ে দিলে একটা। হৃদয়ের ব্যাকুলতার উত্তরে

হৃদয়ের গভীরতা। কবিতাটি ইংরিজিতে লেখা—মূল না অনুবাদ বোঝবার উপায় নেই, কিন্তু কবিতাটি অপরূপ।

I followed the Twilight :

I followed the twilight to find where it went—
It was lost in the day's full light.
I followed the twilight to find where it went—
It was lost in the dark of night.
Last night I wept in a passion of joy
To-night the passion of sorrow came.
O light and darkness, sorrow and joy,
Tell me, are ye the same ?

Yone Noguchi.

কালিদাস নাগ "কল্লোলের" জ্যেষ্ঠতুল্য ছিলেন—শুধু গোকুলের অগ্রজ হবার সম্পর্কেই নয়, নিজের স্নেহবলিষ্ঠ অভিভাবকত্বের গুণে। অনেক বিপদে নিজে বুক এগিয়ে দিয়েছেন। যখনই নৌকো ঘূর্ণির মধ্যে পড়েছে, হাল তুলে নিয়েছেন নিজের হাতে। ঘোরালো মেঘকে কি করে হাওয়া করে দিতে হয় শিখিয়ে দিয়েছেন সেই মধুমন্ত্র। দুঃখের মধ্যে নিজে মানুষ হয়েছেন বলে শিখিয়ে দিয়েছেন সেই কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, বাধাকে বশীভূত করার তপঃপ্রতাপ। নিজে লেখনী ধরেছেন "কল্লোলের" পৃষ্ঠায়—শুধু স্বনামে নয়, দীপঙ্করের ছদ্মনামে। দীপঙ্করের কবিতা দীপোজ্জ্বলা।

সব চেয়ে বড় কাজ তিনি কল্লোলের দলকে "প্রবাসী"তে আসন করে দিলেন। সংকীর্ণ গিরিসঙ্কট থেকে নিয়ে গেলেন প্রশস্ত রাজপথে। তখনকার দিনে "প্রবাসী"ই বাংলা সাহিত্যের কুলীন পত্রিকা, তাতে জায়গা পাওয়া মানেই জাতে-ওঠা, সঙ্গে-সঙ্গে কিছু বা দক্ষিণার খুদকণা। আমাদের তখন কলা বেচার চেয়ে রথ দেখাই বড় কাম্য। কিন্তু দেখা

গেল রথের বাহকরা আমাদের উপর ভারি খাপ্পা। কিন্তু কালিদাসবাবু দমলেন না—একেবারে রথের উপরে বসিয়ে ছাড়লেন।

ওদিকে সব চেয়ে জনপ্রিয় ছিল "ভারতবর্ষ"—কাটতির জনশ্রুতি পরিস্ফীত। আশাতীতরূপে সেখানে একদিন ডাক দিলেন জলধর সেন। সর্বকালের সর্ববয়সের চিরন্তন দাদা। অতি-আধুনিক সাহিত্যিক বলে কোনো ভীরু সংস্কার তো নেইই বরং যেখানে শক্তি দেখলেন সেখানেই স্বীকৃতিতে উদার-উচ্ছল হয়ে উঠলেন। শুধু পত্রিকায় জায়গা করে দেয়া নয়, একেবারে হৃদয়ের মধ্যে নিয়ে আসা। মুঠো ভরে শুধু দক্ষিণা দেয়া নয়, হৃদয়ের দাক্ষিণ্য দেয়া। প্রণাম করতে গিয়েছি, ত্হাত দিয়ে তুলে ধরে বুকের মধ্যে পিষে ধরেছেন। এ মামুলি কোলাকুলি নয়—এ আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্ভাষণ। একজন রায়বাহাত্বর, প্রখ্যাত এক পত্রিকার সম্পাদক, সর্বোপরি কৃতার্থম্মন্য সাহিত্যিক—অথচ অহঙ্কারের অবলেশ নেই। ছোট-বড় কৃতী-অকৃতী—সকলের প্রতি তাঁর অপক্ষপাত পক্ষপাতিত্ব। বাংলা সাহিত্যের সংসারে একমাত্র জলধর সেনই অজাতশত্রু।

গ্রীষ্মের ত্বপুরে ভারতবর্ষের আপিসে খালি গায়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন, মুখে অর্ধদগ্ধ চুরুট, পাশে টেবল-ফ্যান চলছে—এই মূর্তিটিই বেশি করে মনে আসছে। তাঁকে চুরুট ছাড়া দেখেছি বলে মনে পড়ে না—আর সে চুরুট সর্বদাই অর্ধদগ্ধ। সম্পাদকের লেখা প্রত্যেকটি চিঠি তিনি স্বহস্তে জবাব দিতেন—আর সব চেয়ে আশ্চর্য, ছানি-কাটানো চোখেও প্রুফ দেখতেন বর্জাইস টাইপের। কানে খাটো ছিলেন—সে শ্রবণাল্পতার নানারকম মজার গল্প প্রচলিত আছে—কিন্তু প্রাণে খাটো ছিলেন না। প্রাণে অপরিমেয় ছিলেন।

হয়তো গিয়ে বললাম, 'আমার গল্পটা পড়েছেন?'

জলধরদাদা উত্তর দিলেন: 'কাল লালগোলায় গিয়েছিলুম।'

'কেমন লাগল গল্পটা ?'

'হরিদাসবাবু ? নিচেই আছেন—দেখলে না উঠে আসতে ?'

'যদি টাকাটা—'

'ভারতবর্ষ ? কাল বেরুবে।'

চেঁচিয়ে বলছিলুম এতক্ষণ যাতে সহজে শোনেন। হঠাৎ গলা নামালুম, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ করলুম, আর, আশ্চর্য, অমনি শুনতে পেলেন সহজে। খবর পেলুম গল্প পড়া ছাড়া ছাপা শেষ হয়ে গেছে। কাল কাগজ বেরুবে তা বেরোক, আজ যখন এসেছ আজকেই টাকাটা নিয়ে যাও।

জলধরের মতই শ্যামস্নিগ্ধ। বর্ষার জল শুধু সমুদ্র-নদীতেই পড়েনা, দরিদ্রের খানা-ডোবাতেও পড়ে। অকিঞ্চনতমও নিমন্ত্রণ করলে বয়সের শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে জলধরদাদা সর্বাগ্রে এসে উপস্থিত হয়েছেন—সে কসবাতেই হোক বা কাশীপুরেই হোক। মনে আছে, বেহালায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে রবিবাসরের সন্ধ্যায় জলধরদাদা এসেছেন। সেখানে হঠাৎ এক প্রতিবেশী ভদ্রলোক এসে উপস্থিত—জলধরদাদাকে 'মাস্টারমশাই' সম্বোধন করে এক শ্রদ্ধাপ্লুত প্রণাম। কোন সুদূর অতীতে শিক্ষকতা করেছিলেন, তবু জলধরদাদা প্রাক্তন ছাত্রকে চিনতে পারলেন। চিনতে পারল তাঁর চক্ষু তত নয় যত তাঁর প্রাণ। পরের বাড়িতে বসে ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করে তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না জলধরদাদা। তাই পরদিন আবার বেহালায় সেই ছাত্রের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন নিরিবিলি।

আমাদের পূর্বাগতদের প্রায় সকলেরই স্পর্শ পড়েছিল "কল্লোলে"। "ভারতী"র দল বলতে যাদেরকে বোঝায় তাদেরই মুখপাত্রদের। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব। বিখ্যাত "বারোয়ারী উপন্যাসের" গৌরবদীপ্ত পরিচ্ছেদ। সৌরীন্দ্রমোহন ও নরেন্দ্র দেব উপন্যাস লিখেছেন "কল্লোলে", হেমেন্দ্রকুমার কবিতা আর প্রেমাঙ্কুর গল্প। পুরানো চালে ভাত বাড়ে তারই আকর্ষণে ও-সব ভাণ্ডারে মাঝে-মাঝে হাত পাততো দীনেশরঞ্জন, স্বজনপালনের খাতিরে ওঁরাও কার্পণ্য করতেন না, অবারিত হতেন। তবু "কল্লোলে" ওঁদের লেখা প্রকাশিত হলেও ওঁদের লেখায় "কল্লোল" প্রকাশিত হয়নি।

সবার চেয়ে নিকট ছিলেন নরেনদা। প্রায় জলধারদাদারই দোসর, তাঁরই মত সর্বতোভদ্র, তাঁরই মত নিঃশত্রু। আর-আররা কল্লোল-আপিসে কদাচিৎ আসতেন, কিন্তু নরেনদাকে অমনি কালে-ভদ্রের ঘরে ফেলা যায়না। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, ওরফে বুড়োদা, খুব একজন কইয়ে-বইয়ে লোক, ফুর্তিবাজ গপ্পে, হেমেনদা আবার তেমনি গম্ভীর, গভীরসঞ্চারী। মাঝখানে নরেনদা, পরিহাস-প্রসন্ন, যে পরিহাস সর্ব অবস্থায়ই মাধুর্য-মার্জিত। "কল্লোলে" প্রকাশিত তাঁর উপন্যাসে তিনি এক চমকপ্রদ উক্তি করেন। ঠিক তিনি করেন না, তাঁর নায়ককে দিয়ে করান। কথাটা আসলে নির্দোষ নিরীহ, কিন্তু সমালোচকরা চমকে ওঠে বলেই চমকপ্রদ। "Cousins are always the best targets." সমাজ-তত্ত্বের একটা মোটা কথা, যার বলে বর্তমানে হিন্দু বিবাহ-আইন পর্যন্ত সংশোধিত হতে যাচ্ছে। কিন্তু সেকালে ঐ সরল কথাটাই সমালোচকের বিচারে অশ্লীল ছিল। যা কিছু চলতি মতের পন্থী নয় তাই অশ্লীল।

"শনিবারের চিঠি" প্রতি মাসে 'মণিমুক্তা' ছাপত। খুব যত্ন করে আহরণ করা রত্নাবলী। অর্থাৎ কোনখানে কোথায় কি বিকৃতি পাওয়া যায় তাই

বেছে বেছে কুড়িয়ে এনে সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিবেশন করা। বেশির ভাগই প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন, খাপছাড়া ভাবে খানিকটা শিথিল উদ্ধৃতি। তাই ও-সবকে শুধু-মণি না বলে মধ্যমণিও বলা চলে। একখানা "কল্লোল" বা "কালিকলম", "প্রগতি" বা "ধূপছায়া" কিনে কি হবে, তার চেয়ে একখানা "শনিবারের চিঠি" কিনে আনি। এক থালায় বহু ভোজ্যের আস্বাদ ও আঘ্রাণ পাব। সঙ্গে-সঙ্গে বিবেককেও আশ্বাস দিতে পারব, সাহিত্যকে শ্লীল, ধর্মকে খাঁটি ও সমাজকে অটুট রাখবার কাজ করছি। একেই বলে ব্যবসার বাহাদুরি। বিষ যদি বিষের ওষুধ হয়, কণ্টক যদি কণ্টকের, তবে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অশ্লীলতাই বা ব্যবহার করা যাবে না কেন? আর কে না জানে, যদি একটু ধর্মের নাম একটু সমাজস্বাস্থ্যের নাম ঢোকানো যায় তবে অশ্লীলতাও উপাদেয় লাগে।

এই সময় "হসন্তিকা" বেরোয়। উদ্যোক্তা "ভারতী"র দলের শেষ রথীরা। শুনতে মনে হয় হাসির পত্রিকা, কিন্তু হসন্তিকার আসল অর্থ হচ্ছে ধুনুচি, অগ্নিপাত্র। তার মানে, সে হাসাবেও আবার দগ্ধও করবে। অর্থাৎ এক দিকে "শনিবারের চিঠিকে" ঠুকবে অন্য দিকে আধুনিক সাহিত্যের পিঠ চাপড়াবে। মতলব যাই থাক ফল দাঁড়াল পানসে। "শনিবারের চিঠির" তুলনায় অনেক জোলো আর হালকা। অত জোরালো তো নয়ই, অমন নির্জলাও নয়।

"শনিবারের চিঠির" মণিমুক্তার বিরুদ্ধে আক্ষেপ করছে "হসন্তিকা" :

"আমরা সখের মেথর গো দাদা, আমরা সখের মুর্দ্দফরাস
মাথায় বহিয়া ময়লা আনিয়া সাজাই মোদের ঘরের ফরাস।
শকুনি গৃধিনী ভাগাড়ের চিল, টেক্কা কে দেয়, মোদের সাথ?
যেখানে নোংরা, ছোঁ মারিয়া পড়ি, তুলে নিই ভরা ভরিয়া হাত।
গলা ধ্বসা যত বিকৃত জিনিস কে করে বাছাই মোদের মতো?
আমরা জহুরি পচা পঙ্কের যাচাই করা তো মোদের ব্রত।

মোদের ব্যাসাতি ময়লা-মাণিক আঁস্তাকুড় যে ক্ষেত্র তার,
নর্দমা আর পগার প্রভৃতি লয়েছি কায়েমী ইজারা ভার!"

আর যাই হোক, খুব জোরদার ব্যঙ্গ কবিতা নয়। আর, প্রত্যুত্তরে "শনিবারের চিঠির" ব্যঙ্গ হল কবিতাটাকেই মণি-মুক্তার নথিভুক্ত করা।

বুদ্ধদেবের চিঠি :

"তোমার চিঠিখানা পড়ে ভারি আনন্দ হল। এক-একবার নতুন করে প্রগতির প্রতি তোমার যথার্থ প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাই—আর বিস্ময়ে ও আনন্দে মনটা ভরে যায়। আমরা নিজেরা দু'চারজন ছাড়া প্রগতিকে এমন গভীর ভাবে কেউ cherish করে না একথা জোর করে বলতে পারি প্রথম যখন প্রগতি বার করি তখন আশা করিনি তোমাকে এতটা নিকটে পাওয়ার সৌভাগ্য হবে।

চিঠিতেই প্রায় one-third গ্রাহক ছেড়ে দিয়েছে ; ভি পি তো সবে পাঠালাম—কটা ফেরৎ আসে বলা যায় না। আরম্ভ মোটেই promising নয়। তবু একেবারে নিরাশ হবার কারণ নেই বোধ হয়। নতুন গ্রাহকও দুচারজন করে হচ্ছে—এ পর্যন্ত চারজনের টাকা পেয়েছি—আরো অনেক-গুলো promise পাওয়া গেছে। মোটমাট গ্রাহক-সংখ্যা এবার বাড়বে ব'লেই আশা করি—গত বছরের সংখ্যার অন্তত দেড়গুণ হতে বাধ্য শেষ পর্যন্ত। তা ছাড়া advt.ও বেশ কিছু পাওয়া যাচ্ছে। ও বিজ্ঞাপনটা নরেন দেব দিয়েছেন—ওঁর নিজের বইগুলোর। আগে ইচ্ছে ছিল বিনি পয়সায় ছাপানোর—পরে মাসে পাঁচ টাকা দিতে রাজি হয়েছেন। মন্দ কি?

হসন্তিকা পড়েছি। তুমি যা বলেছ সবই ঠিক কথা। এক হিসেবে শনিবারের চিঠির চাইতে হসন্তিকা ঢের নিকৃষ্ট ধরনের কাগজ হয়েছে। শনিবারের চিঠি আর যা-ই হোক sincere—ওরা যা বলে তা ওরা নিজেরা বিশ্বাস করে। কিন্তু হসন্তিকার এই গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে আসার প্রবৃত্তিটা অতি জঘন্য। কিছু না বুঝে এলোপাথাড়ি বাজে

সমালোচনা—কতখানি মানসিক অধঃপতন হলে যে এ সম্ভব জানিনে। তার ওপর, আগাগোড়া ওদের patronising attitudeটাই সব চেয়ে অসহ্য। আমাদের যেন অত্যন্ত কৃপার চোখে দেখে! এর চেয়ে শনিবারের চিঠির sworn enmity অনেক ভালো অনেক সুসহ।"

হাসির কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে যায় দা-ঠাকুরকে। দা-ঠাকুর মানে শরৎ পণ্ডিত মশাই। যিনি কলকাতাকে 'কেবল ভুলে ভরা' দেখেছেন—সঙ্গে-সঙ্গে হয়তো জগৎ-সংসারকেও। 'নিমতলার ঘাটের নিমগাছটা'র কথা যিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন অবিরত। মাঝে-মধ্যে আসতেন কল্লোলের দোকানে। কথার পিঠে কথা বলার অপূর্ব দক্ষতা ছিল, আর সে সব কথার চাতুরী যেমন মাধুরীও তেমনি। তাঁর হাসির নিচে একটি প্রচ্ছন্নদর্শন বেদনা ছিল। যে-বেদনা জন্ম নেয় পরিচ্ছন্ন দর্শনে। খালি গায়ে একটি চাদর জড়িয়ে আসতেন। প্রচণ্ড শীত, খালি গায়ের উপরে তেমনি একখানি পাতলা চাদর দা-ঠাকুরের। কে যেন জিগগেস করল আশ্চর্য হয়ে, এই একটা সামান্য চাদরে শীত মানে? (ট্যাঁক থেকে একটা পয়সা বার করলেন দা-ঠাকুর, বললেন, 'পয়সার গরম!')

চৌষট্টি দিন রোগভোগের পর তাঁর একটি ছেলে মারা যায়। যেদিন মারা গেল সেদিনই দা-ঠাকুর "কল্লোলে" এলেন। বললেন, 'চৌষট্টি দিন ড্র রেখেছিলাম, আজ গোল দিয়ে দিলে।'

রাধারাণী দেবী "কল্লোলে" লিখেছেন—তিনি কল্লোল যুগেরই কবি। ইদানীন্তন কালে তিনিই প্রথম মহিলা যাঁর কবিতায় বিপ্লব আভাত হয়েছে। তখনো তিনি দত্ত, দেবদত্ত হননি। এবং রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রাগৃহে আধুনিক সাহিত্যের যে বিচার-সভা বসে তাতে ফরিয়াদী পক্ষে প্রথম বক্তা রাধারাণী। সেদিনকার তাঁর সেই দার্ঢ্য ও দীপ্তি ভোলবার নয়।

হেমেন্দ্রলাল রায় ঠিক ভারতীর যুগে পড়েন না, আবার "কল্লোল"-এরও দলছাড়া। তবু কল্লোল-আপিসে আসতেন আড্ডা দিতে। স্বভাবসমৃদ্ধ

সৌজন্যে সকলের সঙ্গে মিশতেন সতীর্থের মত . "কল্লোল" যখন মাঝেমাঝে বাইরে চড়াইভাতি করতে গিয়েছে, হয় বোটানিক্‌সে নয় তো কৃষ্ণনগরে, নজরুলের বা আফজলের বাড়িতে, তখন হেমেন্দ্রলালও সঙ্গ নিয়েছেন। উল্লাসে-উচ্ছ্বাসে ছিলেন না কিন্তু আনন্দে-আহ্লাদে ছিলেন। হৈ-হল্লাতে সামর্থ্য না থাকলেও সমর্থন ছিল। উন্মুক্ত মনের মিত্রতা ছিল ব্যবহারে।

কল্লোল-আপিসে একবার একটা খুব গম্ভীর সভা করেছিলাম আমরা। সেই ছোট, ঘন, মায়াময় ঘরটিতে অনেকেই একত্র হয়েছিল সেদিন। কালিদাস নাগ, নরেন্দ্র দেব, দীনেশরঞ্জন, মুরলীধর, শৈলজা, প্রেমেন, সুবোধ রায়, পবিত্র, নৃপেন, ভূপতি, হরিহর এবং আরো কেউ-কেউ। সেদিন ঠিক হয়েছিল "কল্লোলকে" ঘিরে একটা বলবান সাহিত্য-গোষ্ঠী তৈরি করতে হবে। যার মধ্য দিয়ে একটা মহৎ প্রেরণা ও বৃহৎ প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্য শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। একটা কিছু বড় রকমের সৃষ্টি, বড় রকমের প্রজ্ঞা। সমস্ত বাধা বিপদ ও ব্যর্থ বিতর্ক উপেক্ষা করে একাগ্রসাধন।

দেখি সে সভায় কখন হেমেন্দ্রলাল এসে উপস্থিত হয়েছেন। নিঃশব্দে রয়েছেন কোণ ঘেঁসে। হেমেন্দ্রলাল "কল্লোলের" তেমন লোক যাঁকে কল্লোলের সভায় নিমন্ত্রণ না করলেও যোগ দিতে পারেন অনায়াসে।

মনে আছে সেদিনের সেই সভার চৌহদ্দিটা মিত্রতার মাঠ থেকে ক্রমে-ক্রমে অন্তরঙ্গতার অঙ্গনে ছোট করে আনা হয়েছিল। দীনেশদাকে ঘিরে সেদিন বসেছিলাম আমরা কজন। স্থির করেছিলাম, সাহিত্যিক সিদ্ধিও যোগজ সিদ্ধি—কেউ তাই বিয়ে করব না। অনন্যচেতা হয়ে বদ্ধপদ্মাসনে শুধু সাহিত্যেরই ধ্যান করব। শুধু তাই নয়, থাকব একসঙ্গে, এক ব্যারাকে, এক হাঁড়িতে। সকলের আয় একই লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে জড়ো হবে, দর বুঝে নয় দরকার বুঝে হবে তার সমান বাঁটোয়ারা। সুন্দর স্বপ্নের উপনিবেশ স্থাপন করব।

নৃপেন তো প্রায় তখুনি ব্যারাকের জায়গা খুঁজতে ছোটে। প্রেমেন গ্রামের পক্ষপাতী। দীনেশদা বললেন, যেখানেই হোক, নদী চাই, গঙ্গা চাই।

সুরতরঙ্গিনী পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা।

এই সময়কার চিঠি একটা দীনেশদার :

"আমরা কি প্রত্যেক দিন ভাবি না, আমি শ্রান্ত ক্লান্ত, আর পারি না। অথচ আমরাই শ্রান্তিকে অবহেলা করে শান্তি লাভ করি।

সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা আমাদের—এ সবগুলিকে একাগ্র ও একায়ত্ত করে নিতে হবে। আমাদের 'আমাকে' স্বীকার করতে হবে। নিজেকে পূর্ণ করে নিতে হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হোক বলে আমাদের তৃপ্তি হয় না, আমরা তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করব বলেই এই অসীম শক্তি নিয়ে এসেছি। আমরা কে? আমরা তারা যারা রণোন্মত্ত বীরের মত উন্মুক্ত অসি নিয়ে মরণকে আহ্বান করে না—তারা, যারা অসীম ধৈর্যে ও করুণায় অক্ষয় শক্তি ও আনন্দ নিয়ে মৃত্যুকে বরাভয় দেয়। আমরা অভয়—অভয়ার সন্তান। অমর বলে আমরা বলীয়ান—আমরা এক—বহুর অনুপ্রেরণা। আমরা দুর্বলের ভরসা—দুর্যোধনের ভীতি। মহারাজ্যেশ্বরের অমৃতলোকের রথী আমরা—আমরা তাঁর কিঙ্কর-কিঙ্করী নই।

অবসাদ-অভিমান আমাদের আসে, কিন্তু সকলকে তাড়িয়ে নয়, এ সকলকে ঘাড়ে করে উঠে দাঁড়াই আমরা। যত দুর্ব্বার পথ সামনে পড়ে তত দুর্জ্জয় হই। তাই নয় কি? আমরা যে এসেছিলাম, বেঁচেছিলাম, বেঁচে থাকবও—এ কথা পৃথিবীকে স্বীকার করতে হয়েছে, করতে হচ্ছে, হবে-ও।

ছিন্নভিন্ন এই হৃদয় আমাদের সাতখানে ছুটে বেড়ায়। এই ছোটার মধ্যেই আমারা সত্যের সন্ধান পাই। সত্যের মৃগয়া করে আমাদের মন আবার ধ্যানলোকে ফিরে আসে। আমরা হাসি-কাঁদি, জীবনকে শতধা

করে আমরাই আবার ভাঙা হাড় জোড়া লাগাই। এই ভাবটাই আমার আজকের চিন্তা, তোমাকে লিখলাম। প্রকাশের অক্ষমতা মার্জ্জনা করো।

চার দিকে প্রলয়ের মেঘ, অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে ব'সে আছি, তবু মনে হয়, আসুক প্রলয়, তার সহস্র আক্রোশের শেষ পাওনাও তো আমার।

সকলে ভাল। আজ বিদায় হই। তোমার খবর দিও। জেগে ওঠ, বেঁচে ওঠ, হেঁইয়ো বলে তেড়ে ওঠ—দেখবে কাঁধের বোঝা বুকে করে চলতে পারছ। D.R."

কিছুকাল পরে বুদ্ধদেবের চিঠি পেলাম :

"হঠাৎ বিয়ে করা ঠিক করে ফেললে যে? আমার আশঙ্কা হয় কি জানো? বিয়ে করে তুমি একেবারে তৈলস্নিগ্ধ সাধারণ ঘরোয়া বাঙালী না বনে যাও। 'গৃহশান্তিনিকেতনের' আকর্ষণ কম নয়, কিন্তু সেটা পার্থিব—এবং কবিপ্রতিভা দৈব ও শতবর্ষের তপস্যার ফল। বাঁধা পড়ার আগে এই কথা ভালো করে ভেবে নেবে তো?"

"কল্লোলে" আসবার আগেই হেমেন্দ্রলালের দেখা পাই। প্রেমেন আর আমি দুজনে যুক্তভাবে প্রথম উপন্যাস লিখছি। কাঁচা লেখা বলেই বইর নাম 'বাঁকালেখা' ছিল তা নয়, জীবনের যিনি গ্রন্থকার তিনিই যে কুটিলাক্ষর—ছিল এমনি একটা গভীর বক্রোক্তি। তখন হেমেন্দ্রলালের সম্পাদনায় "মহিলা" নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরুত, শৈলজা আমাদের নিয়ে গেল সেখানে। শৈলজার উপন্যাস 'বাংলার মেয়ে' ছাপা হচ্ছিল "মহিলায়"—সেটা শেষ হইতেই সুরু হয়ে গেল 'বাঁকা-লেখা'। ক্রমে বইটা গ্রন্থাকারিত হল। মূলে সেই হেমেন্দ্রলালের সহযোগ।

সে সবদিন নায়ক-নায়িকার জন্মপত্রের ছক কেটে-কেটে আমাদের দিন যেত—প্রেমেনের আর আমার। কোন কক্ষে কোন চরিত্রের স্থিতি বা সঞ্চার এই নিয়ে গবেষণা। বাড়িতে বৈঠকখানা থাকবার মত কেউই সম্ভ্রান্ত নই, তাই কালিঘাটের গঙ্গার ঘাটে কিংবা হরিশ পার্কের

বেঞ্চিতে কিংবা এমনি রাস্তায় টহল দিতে-দিতে চলত আমাদের কূটতর্ক ; যত লিখতাম তার চেয়ে কাটাকুটি করতাম বেশি—আর যদি একবার শেষ হল, গোটা বই তিন-তিনবার কপি করতেও পেছ-পা হলাম না। প্রথম উপন্যাস ছাপা হচ্চে—সে উৎসাহ কে শাসন করে!

কিছু টাকা-কড়ি পাব এ আশাও ছিল হয়তো মনে মনে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তা আর হাতে এল না, হাওয়াতে মিলিয়ে গেল।

এমনি অর্থাভাব প্রত্যেকের পায়ে-পায়ে ফিরেছে। সাপের নিশ্বাস ফেলেছে শুব্ধতায়। হাঁড়ি চাপিয়ে চালের সন্ধানে বেরিয়েছে—প্রকাশক বলেছে, কেটে-ছেঁটে ছোট করুন বই, কিংবা হয়তো বায়না ধরেছে ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তুলুন। আয়ের স্থিরতা না থাকলে কাম্যকর্মে ধৈর্য আসবে কি করে? অব্যবস্থ মন কি করে একাগ্র হবে? সর্বক্ষণ যদি দারিদ্র্যের সঙ্গেই যুঝতে হয় তবে সর্বানন্দ সাহিত্যসৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায়? কোথায় বা সংগঠনের সাফল্য?

শৈলজা খোলার বস্তিতে থেকেছে, পানের দোকান দিয়েছিল ভবানীপুরে। প্রেমেন ওষুধের বিজ্ঞাপন লিখেছে, খবরের কাগজের প্রুফ দেখেছে। নৃপেন টিউশানি করেছে, বাজারের ভাড়াটে নোট লিখেছে। আর-আররা কেউ নির্বাক যুগের বায়স্কোপে টাইটেল তর্জমা করেছে. রাজামহারাজার নামে গল্প লিখে দিয়েছে, কখনো বা হোমরাচোমরা কারুর সভাপতির অভিভাষণ। যত রকমের উঁচা মামলা। যদি সুদিনের দেখা পাই—যদি মনের মুক্ত হাওয়ায় বসে গভীর উপলব্ধির মৌনে সত্যিকারের কিছু সৃষ্টি করতে পারি একাদন।

বুদ্ধদেবের একটা চিঠি এখানে তুলে দিচ্ছি :

"এখানে কিছুই যেন করার নেই—সন্ধ্যা কি করে কাটবে এ সমস্যা রোজ নতুন বিভীষিকা আনে। সঙ্গীরা যে যার কাজে ব্যস্ত ; এমন কি টুনুও পরীক্ষা নিয়ে লেগেছে। প্রথমত, টাকা নেই। রাত নটা নাগাদ

বাড়ি ফিরি—দেখি সমস্ত পাড়াটাই নিঃঝাম হয়ে গেছে;—অন্ধকার একটা ঘর; নিজহাতে আলো জ্বালাতে হয়;—ঠাণ্ডা ভাত, ঠাণ্ডা বিছানা। কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমি যেন পাগল হয়ে গেছি। ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম;—পরে জেগে, যতক্ষণ আমার ঘুম না এল ভারি ভয় করতে লাগলো। মা নেই, সেইজন্যই বোধ হয় এত বেশি খারাপ লাগছে। নিজের হাতে চা তৈরী করতে হয়, সেইটে একটা torture. এদিকে আবার প্রেস সোমবারের মধ্যে নিদেন একশো টাকা চেয়েছে;—ওদের দোষ নেই, অনেকদিনের পাওনা, মোট ১৮০৲। এতদিন কোনোমতে আজ-কাল করে চালিয়ে আসছি;—এবারে না দিতে পারলে credit থাকবে না। কাগজের দোকানো ঢের পাবে; এমাসের কাগজ নগদ দাম ছাড়া আনা যাবে না। কি করে যে টাকার জোগাড় হবে কেউ জানে না। নিষ্কৃতির সহজ পন্থা হচ্ছে প্রগতির মহাপ্রয়াণ;—কিন্তু প্রগতি ছেড়ে দেবো, এ কথা ভাবতেও আমার সারা মন যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে ওঠে। প্রগতির অভাব যেন প্রিয়ার বিরহের চেয়েও শত লক্ষ গুণে মর্মান্তিক ও দুঃসহ। একমাত্র উপায়—ধার;—কিন্তু আমাকে কে ধার দেবে? মার এমন কোনো গয়না-টয়নাও নেই যা কাজে লাগাতে পারি;—যা ছিলো আগেই গেছে। তবু চেষ্টার ত্রুটি করবো না, কিন্তু কোথাও পাবো কি-না, আমার এখন থেকেই সন্দেহ হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কি যে হবে, তা ভাবতেও আমার গা কালিয়ে আসে। যাক—এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারলাম কিনা, পরের চিঠিতেই জানতে পাবে।

এই বিষাদ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে এক-এক সময় ইচ্ছে করে, ভয়ানক desperate একটা কিছু করে ফেলি—চুরি বা খুন বা বিয়ে! কিন্তু হায়! সেটুকু সৎসাহসও যদি থাকতো!"

প্রবোধ যখন "কল্লোলে" এল তখন "কল্লোল" আরো জমজমাট হয়েছে

আমার প্রথম একক উপন্যাসের নাম “বেদে”, আর প্রবোধের “যাযাবর”। এই নিয়ে “শনিবারের চিঠি” একটা সুন্দর রসিকতা করেছিল। বলেছিল, একজন বলছে: বে দে, আর অমনি আরেকজন বলে উঠছে: যা, যা বর। লোকটার বিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়েছিল কিনা জানা যায়না, কিন্তু সভা ছেড়ে চলে যে যায়নি তাতে সন্দেহ কি। মুকুট না জুটুক, পিঁড়ি আঁকড়ে বসে আছে সে ঠিক।

এক দিকে যত ব্যঙ্গ, অন্য দিকে তত ব্যঞ্জনা। মিথ্যার পাশ কাটিয়ে নয়, মিথ্যার মূলোচ্ছেদ করে সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়াও। শাখায় না গিয়ে শিকড়ে যাও, কৃত্রিম ছেড়ে আদিমে; সমাজের গায়ে যেখানে-যেখানে সিল্কের ব্যাণ্ডেজ আছে তার পরিহাসটা প্রকট করো। যারা পতিত, পীড়িত, দরিদ্রিত, তাদেরকে বাঙ্ময় করে তোলো। নতুনের নামজারি করো চারদিকে। কি লিখবে শুধু নয় কেমন করে লিখবে, গঠনে কি সৌষ্ঠব দেবে, সে সম্বন্ধেও সচেতন হও। ঘোলা আছে জল, স্রোতে-স্রোতে পরিস্রুত হয়ে যাবে। শুধু এগিয়ে চলো, সন্তরণে সিন্ধুগমন অনিবার্য।

ওরা যত হানবে তত মানবে আমাদের। চলো এগিয়ে।

বস্তুত বিরুদ্ধ পক্ষের সমালোচনাও কম প্ররোচনা জোগাতনা। ভঙ্গিতে কিছু ত্বরা ও ভাষায় কিছু অসংযম নিশ্চয়ই ছিল, সেই সঙ্গে ছিল কিছুটা শক্তিময় স্বকীয়তা। প্রতিপক্ষ শুধু খোসাভুষিই কুড়িয়েছে, সার-শস্যের দিকে দৃষ্টি দেয়নি। নিন্দা করবার অধিকার পেতে হলে যে প্রশংসা করতেও জানতে হয় সে বোধ সেদিন দুর্লভ ছিল। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠি লেখেন। সে চিঠি তেরোশ চৌত্রিশের মাঘ মাসের শনিবারের চিঠিতে ছাপা হয়। তার অংশবিশেষ এইরূপ:

“সাহিত্যের দোহাই ছেড়ে দিয়ে সমাজহিতের দোহাই দিতে পারো।

আমার নিজের বিশ্বাস শনিবারের চিঠির শাসনের দ্বারাই অপর পক্ষে সাহিত্যের বিকৃতি উত্তেজনা পাচ্চে। যে সব লেখা উৎকট ভঙ্গীর দ্বারা নিজের সৃষ্টিছাড়া বিশেষত্বে ধাক্কা মেরে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমালোচনার খোঁচা তাদের সেই ধাক্কা মারাকেই সাহায্য করে। সম্ভবত ক্ষণজীবীর আয়ু এ-তে বেড়েই যায়। তাই যদি না হয়, তবু সম্ভবত এতে বিশেষ কিছু ফল হয় না। আইনে প্রাণদণ্ডের বিধান আছে, প্রাণহত্যাও থামচে না।

ব্যঙ্গরসকে চিরসাহিত্যের কোঠায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আর্টের দাবী আছে। শনিবারের চিঠির অনেক লেখকের কলম সাহিত্যের কলম, অসাধারণ তীক্ষ্ণ, সাহিত্যের অস্ত্রশালায় তার স্থান—নব-নব হাস্যরূপের সৃষ্টিতে তার নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে, ব্যক্তিবিশেষের মুখ বন্ধ করা তার কাজ নয়। সে কাজ করবারও লোক আছে, তাদের কাগজী লেখক বলা যেতে পারে, তারা প্যারাগ্রাফ-বিহারী।

আর একটা কথা যোগ ক'রে দিই। যে সব লেখক বে-আব্রু লেখা লিখেচে, তাদের কারো কারো রচনাশক্তি আছে। যেখানে তাদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে সেটা স্বীকার করা ভালো। যেটা প্রশংসার যোগ্য তাকে প্রশংসা করলে তাতে নিন্দা করবার অনিন্দনীয় অধিকার পাওয়া যায়।"

সঙ্গে-সঙ্গেই আবার রবীন্দ্রনাথ নবযৌবনের 'উদ্বোধন' গাইলেন :

"বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার
সৃষ্টি তাহার খেলা।
দস্যুর মতো ভেঙে-চুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা।
মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
পরশ পাথর হাতে আছে তার,

তাইতো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে
উদ্ধত অবহেলা ॥
বলো 'জয় জয়', বলো 'নাহি ভয়'—
কালের প্রয়াণ পথে
আসে নির্দয় নব যৌবন
ভাঙনের মহারথে ॥"

এই ভাঙনের রথে আরো একজন এসেছিলেন—তিনি জগদীশ গুপ্ত। সতেজ-সজীব লেখক, বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন। দুর্দান্ত সাহসে অনেক উদ্দীপ্ত গল্প লিখেছেন। বয়সে কিছু বড় কিন্তু বোধে সমান তপ্তোজ্জ্বল। তাঁরও যেটা দোষ সেটাও ঐ তারুণ্যের দোষ—হয়তো বা প্রগাঢ় প্রৌঢ়তার। কিন্তু আসলে যে তেজী তাকে কখনো দোষ অর্শে না। "তেজীয়সাং ন দোষায়।" যেখানে আগুন আছে সেখানেই আলো জ্বলবার সম্ভাবনা। আগুন তাই অর্হনীয়।

জগদীশ গুপ্ত কোনো দিন কল্লোল-আপিসে আসেননি। মফস্বল শহরে থাকতেন, সেখানেই থেকেছেন স্বনিষ্ঠায়। লোককোলাহলের মধ্যে এসে সাফল্যের সার্টিফিকেট খোঁজেননি। সাহিত্যকে ভালোবেসেছেন প্রাণ দিয়ে। প্রাণ দিয়ে সাহিত্যরচনা করেছেন। স্বস্থান-সংস্থিত একনিষ্ঠ শিল্পকার।

অনেকের কাছেই তিনি অদেখা, হয়তো বা অনুপস্থিত। নদী বেগধারাই বৃদ্ধি পায়। আধুনিক সাহিত্যের নদীতে তিনি একটা বড় রকমের বেগ। লম্বা ছিপছিপে কালো রঙের মানুষটি, চোখে বেশি পাওয়ারের পুরু চশমা, চোখের চাউনি কখনো উদাস কখনো তীক্ষ্ণ—মাথার চুলে পাক ধরেছে, তবু ঠোঁটের উপর কালো গোঁফজোড়াটি বেশ জমকালো। "কালি-কলমকে" তিনি অফুরন্ত সাহায্য করেছেন গল্প দিয়ে, সেই সম্পর্কে মুরলীদার সঙ্গে তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গতা জমে ওঠে।

যৌবন যে বয়সে নয়, মনের মাধুরীতে, জগদীশ গুপ্ত তার আরেক প্রমাণ।

বিখ্যাত 'জাপান' বইর লেখক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোপুরি ভারতীর দলের লোক। অথচ আশ্চর্য, পুরোপুরি কল্লোল-যুগের বাসিন্দা। একটি জাগ্রত সংস্কারমুক্ত আধুনিক মনের অধিকারী। "কল্লোল" বার হবার পর থেকেই "কল্লোলে" যাতায়াত করতেন, "কালি-কলম" বেরুলে একদিন নিজের থেকেই সোজা চলে এলেন "কালি-কলমে"। আধুনিক সাহিত্যপ্রচেষ্টায় তাঁরা সক্রিয় সহানুভূতি—কেননা—"কালি-কলমে" নিজেই তিনি উপন্যাস লিখলেন 'চিত্রবহা'—তা ছাড়া নবাগতদের মধ্যে যখন যেটুকু শক্তির আভাস দেখলেন অভ্যর্থনা করলেন। চারদিকের এত সব জটিল-কুটিলের মধ্যে এমন একজন সহজ-সরলের দেখা পাব ভাবতে পারিনি।

সঙ্গে এল তাঁর বন্ধু, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়। কাগুজী-নাম আনন্দসুন্দর ঠাকুর। চেহারায় ও চরিত্রে সত্যিই আনন্দসুন্দর। অন্তর-বাহিরে একটি রুচির পরিচ্ছন্নতা। রসঘন প্রবন্ধ লিখতেন মাঝে-মাঝে, প্রচ্ছন্নচারী একটি পরিহাস থাকত অন্তরালে। জীবনের গভীরে একটি শান্ত আনন্দ লালন করছেন তাঁর মুখরুচি দেখলেই মনে হত। কিন্তু যখনই কল্লোল-আপিসে ঢুকতেন, মুখে একটি করুণ আর্তি ফুটিয়ে শোকাচ্ছন্ন কণ্ঠে বলে উঠতেন—সব বুঝি যায়!

'সব বুঝি যায়!' সে এক অপূর্ব শ্লেষোক্তি। সেই বক্রোক্তিকা অননুকরণীয়।

কথাটা বোধহয় "কল্লোলের" প্রতিই বিশেষ করে লক্ষ্য করা। সমালোচকের যেটা কোপ তাকেই তিনি কাতরতায় রূপান্তরিত করেছেন।

কিছুই যায় না। সব ঘুরে-ঘুরে আসে। শুধু ভোল বদলায়।

কিন্তু কে জানত ভারতীর দলের একজন প্রবীণ লেখকের উপন্যাসকে লক্ষ্য করে 'কালি-কলম-আপিসে পুঁলিশ হানা দেবে! শুধু হানা নয়,

একেবারে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে এসেছে। কার বিরুদ্ধে? সম্পাদক মুরলীধর বসু আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় আর প্রকাশক শিশিরকুমার নিয়োগীর বিরুদ্ধে। অপরাধ? অপরাধ অশ্লীল-সাহিত্য-প্রচার।

আমরা সার্চ করব আপিস। সার্চ-ওয়ারেণ্ট আছে। বললে লাল-পাগড়ি।

দূষ্য লেখাটা কি?

লেখা কি একটা? দুটো। সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'চিত্রবহা' আর নিরুপম গুপ্তর গল্প 'শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে।' নিন, বার করুন সংখ্যাগুলো—

মনে মনে হাসলেন মুরলীদা। নিরুপম গুপ্ত! সে আবার কে?

নিরুপম গুপ্ত ছদ্মবেশী। চট করে তাঁকে চিনে ফেলতে সকলেরই একটু দেরি হবে।

লেখরাজ সামন্ত শৈলজার ছদ্মনাম। "কালিকলমে" প্রকাশিত তার গল্প 'দিদিমণি' আর প্রেমেনের গল্প 'পোনাঘাট পেরিয়ে' সম্বন্ধে কাশীর মহেন্দ্র রায় আপত্তি জানান। তাঁর আপত্তি, লেখা দুটো অশ্লীল, প্রকাশ-অযোগ্য। তেমনি তাঁর আপত্তি নজরুলের 'মাধবী প্রলাপ' ও মোহিতলালের 'নাগার্জুনের' বিরুদ্ধে। এই নিয়ে মুরলীদার সঙ্গে পত্রে দীর্ঘকাল তাঁর তর্কবিতর্ক হয়। মুরলীদা বলেন, আপনার বক্তব্য গুছিয়ে প্রবন্ধ লিখুন একটা। মহেন্দ্র রায় আধুনিক সাহিত্যের উপর প্রবন্ধ লেখেন। তার পালটা জবাব দেন সত্যসন্ধ সিংহ। সত্যসন্ধ সিংহ ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ছদ্মনাম।

শুধু প্রবন্ধ লিখেই তৃপ্তি পাচ্ছিলেননা মহেন্দ্রবাবু। তিনি একটা গল্পও লিখলেন। আর সেই গল্পই 'শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে'।

এ কি ভাগ্যের রসিকতা! যিনি নিজে অশ্লীলতার বিরোধী তাঁরই লেখা অশ্লীলতার দায়ে আইনের কবলে পড়বে!

ভাগ্যের রসিকতা আরো তৈরি হচ্ছে নেপথ্যে। নিন, আপনাদের দুজনকে—মুরলীধর বসু ও শিশিরকুমার নিয়োগীকে—গ্রেপ্তার করলাম। ভয় নেই, নিয়ে যাব না দড়ি বেঁধে। আমার নিজের দায়িত্বে কয়েক ঘণ্টার জন্তে আপনাদের 'বেল' দিয়ে যাচ্ছি। কাল বেলা এগারোটার মধ্যে আপনারা হাজির হবেন লালবাজারে। ইতিমধ্যে শৈলজাবাবুকেও খবর দিন, :তিনিও যেন কাল সঙ্গে থাকেন। ঠিক সময় হাজির হবেন কিন্তু, নইলে—বুঝছেনই তো—আচ্ছা, এখন তবে আসি।

কাছেই বেঙ্গল-কেমিক্যালের আপিসে সুরেশবাবু কাজ করতেন। খবর পেয়ে ছুটে এলেন। তখুনি খানা-তল্লাসি আর গ্রেপ্তারের খবরটা নিজে লিখে দৈনিক বঙ্গবাণী আর লিবার্টি পত্রিকায় ছাপাতে পাঠালেন।

আর মুরলীদা ছুটলেন কালিঘাটে, শৈলজাকে খবর দিতে।

সব বুঝি যায়!

একুশ

পরদিন সকালে মুরলীধর বসু আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লালবাজারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভীতভয়সূদন শূলপাণির নাম স্মরণ করতে-করতে।

প্রথমেই এক হোমরাচোমরার সঙ্গে দেখা। বাঙালি, কিন্তু বাংলাতে যে কথা কইছেন এ নিতান্ত কৃপাপরবশ হয়ে।

দেখতে তো সুধী-সজ্জনের মতই মনে হচ্ছে। আপনাদের এ কাজ?

'পড়েছেন আপনি?'

Darn it—আমি পড়ব ও সব হ্যাস্টি স্ল্যাং? কোনো রেসপেকটেবল লোক বাংলা পড়ে?

'তা তো ঠিকই। তবে আমাদেরটাও যদি না পড়তেন—'

আমরা পড়েছি নাকি গায়ে পড়ে? আমাদেরকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে পড়িয়ে ছেড়েছে। আপনাদেরই বন্ধু মশাই। আপনাদেরই এক গোত্র।

'কে? কারা?'

সাহিত্যজগতের সব শূর-বীর, ধন-রত্ন—এক কথায় সব কেষ্টবিষ্টু। তাদের কথা কি ফেলতে পারি? নইলে এ সব দিকে নজর দেবার আমাদের ফুরসৎ কই? বোমা-বারুদ ধরব, না, ধরব এসব কাগজের ঠোঙা?

পুলিশপুঙ্গব ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন। পরে মনে করলেন এ ভঙ্গিটা যথার্থ হচ্ছে না। পরমুহূর্তেই মেঘগম্ভীর হলেন। বললেন, 'রবিঠাকুর শরৎ চাটুজ্জে নরেশ সেন চারু বাঁড়ুয্যে—কাউকে ছাড়বনা মশাই। আপনাদের কেসটার নিষ্পত্তি হয়ে গেলেই ও-সব বড় দিকে ধাওয়া করব। তখন দেখবেন—'

বিনয়ে বিগলিত হবার মতন কথা। গদ্গদ ভাবে বললেন মুরলীধর:

'এ তো অতি উত্তম কথা। পিছুতে-পিছুতে একেবারে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত। তবে দয়া করে ঐ বড় দিক থেকে সুরু করলেই কি ঠিক হতনা ?'

'না।' প্রবলপ্রবর হুঙ্কার ছাড়লেন: 'গোড়াতে এই এটা একটা টেস্ট কেস হয়ে যাক।'

রাঘববোয়াল ছেড়ে দিয়ে চিরকালই কি চুনোপুঁটিদের দিকে নজর ? গদির অধিপতিদের ছেড়ে সামান্য মুদি-মনিহারি ?

চালান হয়ে গেলেন পুলিশ-কোর্টে।

সতীপ্রসাদ সেন—আমাদের গোরাবাবু—পুলিশ-কোর্টের উদীয়মান উকিল—জামিনের ব্যবস্থা করে দিলেন। মোকদ্দমা জোড়াবাগান কোর্টে স্থানান্তরিত হল। তারিখ পড়ল শুনানির।

এখন কি করা !

প্রভাবান্বিত বন্ধু ছিল কেউ মুরলীধরের। তিনি এগিয়ে এলেন। বললেন, 'বলো তো, তারক সাধুকে গিয়ে ধরি। তারক যখন তখন নিশ্চয়ই ত্রাণ করে দেবেন। ত্রাহি মাং মধুসূদন না বলে ত্রাহি মাং তারকব্রহ্মন বললে নিশ্চয়ই কাজ হবে।'

মুরলীধর হাসলেন। বললেন, 'না, তেমন কিছুর দরকার নেই।'

'তা হলে কি করবে ? এ সব বড় নোংরা ব্যাপার। আর্টের বিচার আর আদালতের বিচার এক নাও হতে পারে। আর যদি কনভিকশান হয়ে যায় তা হলে শাস্তি তো হবেই, উপরন্তু তোমার ইস্কুলের কাজটি যাবে।'

'তা জানি। তবু—থাক।' মুরলীধর অবিচলিত রইলেন। বললেন, 'সাহিত্যকে ভালবাসি ; পূজা করি সেবা করি সাহিত্যের। জীবন নিয়েই সাহিত্য—সমগ্র, অখণ্ড জীবন। তাকে বাদ দিয়ে জীবনবাদী হই কি করে ? সু আর কু দুইই বাস করে পাশাপাশি। কে যে কী এই নিয়ে তর্ক। সত্য কতদূর পর্যন্ত সুন্দর, আর সুন্দর কতক্ষণ পর্যন্ত সত্য এই নিয়ে ঝগড়া। প্রুডারি আর পর্নোগ্রাফি দুটোকেই ঘৃণা করি। সত্যের

থেকে নিই সাহস আর সুন্দরের থেকে নিই সীমাবোধ—আমরা স্রষ্টা, আমরা সমাধিসিদ্ধ।'

ভদ্রলোক কেটে পড়লেন।

ঠিক হল লড়া হবেনা মামলা। না, কোনো তদবির-তালাস নয়, নয় ছুটোছুটি-হায়রানি। শুধু একটা স্টেটমেণ্ট দাখিল করে দিয়ে চুপ করে থাকা। ফল ফল যা হবার তা হোক।

গেলেন ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর কাছে। একে সার্থকনামা উকিল, তার উপরে সাহিত্যিক, সর্বোপরি অতি-আধুনিক সাহিত্যের পরাক্রান্ত পরিপোষক। অভিযুক্ত লেখা দুটো মন দিয়ে পড়লেন অনেকক্ষণ। বললেন, নট-গিলটি প্লিড করুন।

যতদূর মনে পড়ে, 'চিত্রবহা'র দুটি পরিচ্ছেদ নিয়ে নালিশ হয়েছিল। এক 'যৌবনবেদনা', দুই 'নরকের দ্বার'। আর 'শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহের' [illegible] ।

সবচেয়ে আশ্চর্য, 'চিত্রবহাকে' প্রশংসা করেছিল "শনিবারের চিঠি"। এমন কি, তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেছিল।

এই ভূতের-মুখে-রাম-নামের কারণ আছে। সুরেশবাবু মোহিতলালের বন্ধু। আর 'চিত্রবহা' মোহিতলালের সুপারিশেই ছাপা হয় "কালি-কলমে"।

"শনিবারের চিঠিতে" চিত্রবহা সম্বন্ধে লেখা হয়:

"....লেখক মানবজীবনের ভালো-মন্দ সুন্দর-কুৎসিত সকল দিকের মধ্য দিয়া একটা চরিত্রের বিকাশ ও জীবনের পরিণাম চিত্রিত করিয়াছেন। জীবনকে যদি কেহ সমগ্রভাবে দেখিবার চেষ্টা করেন তবে কিছুই বাদ দিবার প্রয়োজন হয়না। কারণ তাহা হইলে তাহার সর্ব্বাংশের একটা সামঞ্জস্য ধরা পড়ে। কু ও সু দুই মিলিয়া একটি অখণ্ড রাগিনীর সৃষ্টি করে, তাহা moralও নয়, immoralও নয়—আরও বড়, আরও রহস্যময়।..."

চমৎকার সুস্থ মানুষের মত কথা। ঋদ্ধিবাচনও করতে জানে তাহলে "শনিবারের চিঠি"! তা জানে বৈকি। দলের হলে বা দরকার হলে করতে হয় বৈকি সুখ্যাতি! অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

নরেশচন্দ্র স্টেটমেণ্টের খসড়া করে দিলেন। বললেন, 'প্রত্যেকে একখানা করে কপি কোর্টে পেশ করে দিন।'

তথাস্তু। কিন্তু উকিলের দল ছাড়েনা। বলে, ফাইট করুন। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মার খাবেন কেন?

বুঝবেনা কিছুতেই, উলটে বোঝাবে. ব্যাপারটা বুঝুন। এ ছেলেখেলা নয়, জরিমানা ছেড়ে জেল হয়ে যেতে পারে। ফরোয়ার্ডে না খেলুন গোলে গিয়ে দাঁড়ান। ফাঁকা গোলে বল মেরে পুলিশ জিতে যাবে এক শটে?

মহা বিড়ম্বনা। এক দিকে সমালোচক, অন্য দিকে পুলিশ, মাঝখানে উকিল। যেন একদিকে শেয়াকুল অন্য দিকে বাবলা, মধ্যস্থলে খেজুর।

মুরলীধর তবু নড়েন না।

'এর মশাই কোনো মানেই হয়না। হয় স্রেফ apologise করুন, আর না-হয় আমাদের লড়তে দিন। ফি-র ভয় করছেন, এক পয়সাও ফি চাইনা আমরা। সাহিত্যের জন্যে এ আমাদের labour of love।'

মনে-মনে হাসলেন মুরলীধর। বললেন, 'ধন্যবাদ।'

ভিড় ঠেলে আদালত-ঘরে ঢুকলেন তিনজনে। সার্জেণ্ট আর লালপাগড়ি, গাঁটকাটা আর পকেটমার, চোর আর জুয়াড়ী, বেশ্যা আর গুণ্ডা, বাউণ্ডুলে আর ভবঘুরে! তারই পাশে প্রকাশক আর সম্পাদক, আর সাহিত্যিক।

ঢুকলেন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। কটা ছেঁড়া মামলার পর ডাক পড়ল "কালি-কলমের"।

কে জানে কেন, কাঠগড়ায় পাঠালেন না আসামীদের। চেয়ারে বসতে সংকেত করলেন।

এলেন মহামান্য পি-পি, হাতে একখণ্ড বাঁধানো "কালি-কলম"। অভিযুক্ত অংশবিশেষ নীল পেন্সিলে মোটা করে দাগানো। বইখানা যে তাঁকে সরবরাহ করেছে সে যে ভিতরের লোক তাতে সন্দেহ কি।

যারা আমাদের মতের ও পথের বিরোধী, অথবা ভিন্নপন্থী ও ভিন্নমত, তাদের অভ্যুদয় দেখলে আমাদের মন সংকুচিত বা অপ্রমুদিত হয়। সেটা মনের আময়, অশুদ্ধতা। মনের সেই অপবিত্রতা দূর করবার জন্যে ভিন্নপন্থীদের পুণ্যাংশ চিন্তা করে মনে মুদিতা-ভাব আনা দরকার। পুষ্পহার দুজনকেই প্রসন্ন করে, যে ধারণ করে আর যে ঘ্রাণ নেয়। তেমনি তোমার অর্জিত পুণ্যের সৌরভে আমিও প্রমুদিত হচ্ছি। এই ভাবটিই বিশুদ্ধ ভাব।

কিন্তু এ কি সহজ সাধনা? সাহিত্যিক হিসেবে যার আকাঙ্ক্ষিত যশ হলনা সে কি পারে পরের সাহিত্যধর্মে হৃদয়ে অনুমোদনভাব পোষণ করতে?

পি-পি বক্তৃতার পিপে খুললেন। এরা সমাজের কলঙ্ক, দেশের শত্রু, রাষ্ট্রের আবর্জনা। এদেরকে আর এখন নুন খাইয়ে মারা যাবেনা, যদি আইনে থাকত, লৌহশলাকায় বিদ্ধ করতে হত সর্বাঙ্গে।

আসামীদের পক্ষে কি বক্তব্য আছে? কিছু নয়, শুধু এই বিবৃতিপত্র। শুধু বাক্য থাকলেই কাব্য হয়না। বক্তৃতা দিয়ে রস বোঝানো যায়না অরসিককে।

সেই নামহীন উকিল তবু নাছোড়বান্দা। সে একটা বক্তৃতা ঝাড়বেই আসামীপক্ষে। বিনা পয়সায় এমন সুযোগ বুঝি আর তার মিলবেনা জীবনে।

'আমাদের পক্ষে কোনো উকিল নেই।' বললেন মুরলীধরেরই 'একমাত্র ভবিষ্যৎই আমাদের উকিল।' .নে জানতেন

ম্যাজিস্ট্রেট উকিলকে বসতে বললেন। বারে, আজ যা

তারিখ পালটে তারিখ পড়তে লাগল। শেষে এল রায়-প্রকাশের দিন।

আদালতের বারান্দায় দুই বন্ধু প্রতীক্ষা করে আছে। শৈলজানন্দ আর মুরলীধর। সাহিত্য-বিচারে কী দণ্ড নির্ধারিত হয় তাদের! দারিদ্র্য আর প্রত্যাখ্যানের পর আর কী লাঞ্ছনা!

'কি হবে কে জানে!' শুষ্ক মুখে হাসল শৈলজা।

'কি আবার হবে! বড়জোর ফাইন হবে।' মুরলীধর উড়িয়ে দিলেন কথাটা।

'শুধু ফাইনও যদি হয়, তাও দিতে পারবনা।'

'অগত্যা ওদের অতিথিই না হয় হওয়া যাবে দিন কতকের জন্যে। তাই বা মন্দ কি!' মুরলীধর হাসলেন: 'গল্পলেখার নতুন খোরাক পাবে।'

'সেই লাভ।' সান্ত্বনা পেল শৈলজা।

দুপুরের পর রায় বেরুল। পি-পির সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞানের আখ্যান-ব্যাখ্যান বিশেষ কাজে লা... ম্যাজিস্ট্রেটের। আসামীদের তিনি benefit of doubt দিয়ে ছেড়ে দিয়ে...ন।

আদর্শবাদী মুরলীধর। ইস্কুলমাস্টার ছিলেন, কিন্তু সেই সংকীর্ণ বন্দীদশা থেকে মুক্ত ছিলেন জীবনে। নিজে কখনো গল্প-উপন্যাস লেখেননি, প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় প্রসঙ্গ লিখেছেন—তাই ভয় ছিল ঐ সীমিত ক্ষেত্রে না মাস্টারি করে বসেন। কিন্তু, না, চিরন্তন মানুষের উদার মহাবিদ্যালয়ে তিনি পিপাসু সাহিত্যিকের মতই চিরনবীন ছাত্র। সাহিত্যের একটি প্রশস্ত আদর্শের প্রতি আহিতলক্ষ্য ছিলেন। ভ্রষ্ট হননি কোনোদিন, স্বমতবিঘাতক মীমাংসা করেননি কোনো অবস্থায়।

পড়ল ...তা নয়, নিষ্ঠার সঙ্গে প্রীতি মিশিয়েছেন। আর যেখানেই প্রীতি কে অমৃতের আস্বাদ।

বসতে সংকে নীলিয়া বসুও কল্লোলযুগের লেখিকা। এবং অকালপ্রয়াতা।

নিম্ন মধ্যবিত্তের সংসার নিয়ে গল্প লেখতেন। বিষয়ের আনুকূল্যে লিখন-ভঙ্গিতে একটি স্বচ্ছ সারল্য ছিল। এই সারল্য অনেক নীরব অর্চনার ফল।

"কালি-কলমের" মামলা উপলক্ষ্য করে শচীন সেনগুপ্ত আধুনিক সাহিত্যের সমর্থনে অনেক লিখেছিলেন তাঁর "নবশক্তিতে"। তার আগে তাঁর "আত্মশক্তিতে"। শচীন সেনগুপ্ত নিজেও একজন বিপ্লবী নাট্যকার, তাঁর নাটক 'ঝড়ের পরে' উপলক্ষ্য করেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ঘূরন্ত রঙ্গমঞ্চ তৈরি হয়। নিজেও তিনি ভাঙনের রঙে ভাবনাগুলিকে রাঙিয়ে নিয়েছেন, তাই "কল্লোলের" লেখকদের সঙ্গে তাঁর একটা অন্তরের ঐক্য ছিল। দারিদ্র্যের সঙ্গে এক ঘরে বাস করতেন, এক ছিন্ন শয্যায়—অনুচর বলতে নৈরাশ্য বা নিরাশ্বাস। তবু সমস্ত শ্রীহীনতার ঊর্ধ্বে একটি মহান স্বপ্ন ছিল—কষ্টের উত্তরে নিষ্ঠা, উপবাসের উত্তরে উপাসনা। এমন লোকের সঙ্গে "কল্লোলের" আত্মীয়তা হবে না তো কার হবে?

আরো একজন গুপ্ত-হীন গুপ্ত লেখক ছিলেন—অরসিক রায়ের ছদ্মনামে। খুচরো ভাবে খোঁচা মারতেন, তাতে ধার থাকলেও ভার ছিলনা। তখনকার দিনে আধুনিক সাহিত্যকে 'অশ্লীল' বলাই ফ্যাশান ছিল যেমন এককালে ফ্যাশান ছিল রবীন্দ্রনাথের লেখাকে 'দুর্বোধ্য' বলা। আশীর্বাদ করতেই অনেক সাহসের প্রয়োজন হয়, অনেক দীর্ঘ-দর্শিতার। যারা লেখক নন, শুধু সমালোচক, তাঁদের কাছে এই সহানুভূতি, এই দূরব্যাপিতা আশা করা যাবে কি করে? নগদ-বিদায়ের লেখক হয় জানি, তাঁরা ছিলেন নগদ-বিদায়ের সমালোচক। তাই যাঁরা আধুনিক সাহিত্যের স্বস্তিবাচন করেছেন—রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে রাধাকমল-ধূর্জটিপ্রসাদ পর্যন্ত—তাঁদেরকেও ওঁরা রেহাই দেননি।

রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ। তিনি একদেশদর্শীর মত শুধু দোষেরই সন্ধান নেননি, যা প্রশংসনীয় তাকেও সংবর্ধনা করেছেন। তিনি জানতেন এক লেখা আরেক লেখাকে অতিক্রম করে যায় বারে-বারে, আজ যা

প্রতিমা কালকে আবার তা মাটি—আবার মাটি থেকেই নতুনতরো মূর্তি। তাই আজ যা ঘোলা কাল তাই সুনির্মল। প্রশ্ন হচ্ছে বেগ আছে কিনা স্রোত আছে কিনা—আবদ্ধ থাকলেও আছে কিনা বন্ধনহীনের দৃষ্টিপাত। তাই সেদিন তিনি শৈলজা-প্রেমেন বুদ্ধদেব-প্রবোধ কাউকেই স্বীকার করতে বা সংবর্ধনা করতে কুণ্ঠিত হননি। সেদিন তাই তিনি লিখেছিলেন :

"সব লেখা লুপ্ত হয়, বারম্বার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি। হয়েছে সময়
নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে। হোক লয়
সমাপ্তির রেখা-দুর্গ। নবলেখা আসি দর্পভরে
তার ভগ্ন স্তূপরাশি বিকীর্ণ করিয়া দূরান্তরে
উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়,
নবীনের রথযাত্রা লাগি। অজ্ঞাতের পরিচয়
অনভিজ্ঞ নিক জিনে। কালের মন্দিরে পূজাঘরে
যুগ-বিজয়ার দিনে পূজার্চ্চনা সাঙ্গ হ'লে পরে
যায় প্রতিমার দিন। ধূলা তারে ডাক দিয়া কয়,—
'ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবিরে অক্ষয়,
তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রতিমা,
প্রকাশিবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা ॥'"

আসলে, কী অভিযোগ এই আধুনিক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে?

এই সম্বন্ধে "কল্লোলে" একটা জবানবন্দি বেরোয় নতুন লেখকদের পক্ষ থেকে। সেটা রচনা করে কৃত্তিবাস ভদ্র, ওরফে প্রেমেন্দ্র মিত্র।

"নতুন লেখকেরা নাকি অশ্লীল।

পৃথিবীতে বুদ্ধ খৃষ্ট ও চৈতন্তেরা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তায় চলে

এ কথা তারা না হয় নাই মানল, মিথ্যা ও পাপকে ধামাচাপা দিলে যে মারা যায় এ কথাও নাকি তারা মানেনা!

তাদের পটে নাকি সাধুর মস্তক ঘিরে জ্যোতির্মণ্ডল দেখা যায়না, পাষণ্ডকেও নাকি সে পটে মানুষ বলে ভ্রম হয়! ন্যায়ের অমোঘদণ্ড নাকি সেখানে আগাগোড়া সমস্ত পরিচ্ছেদ সন্ধান করে শেষ পরিচ্ছেদে অভ্রান্ত ভাবে পাপীর মস্তকে পতিত হয়না।

"নৌকাডুবির" লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত কমলাকে রমেশের প্রতি স্বাভাবিক স্বতস্ফূর্ত প্রেম থেকে অর্থহীন কারণে বিচ্ছিন্ন করে অপরিচিত স্বামীর উদ্দেশ্যে অসম্ভব অভিসারে প্রেরণ না ক'রে, 'পথ-নির্দ্দেশ'-এর রচয়িতা শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুটি মিলন-ব্যাকুল পরস্পরের সান্নিধ্যে সার্থক হৃদয়কে অপরূপ যথেচ্ছ পথ-নির্দ্দেশ না ক'রে তারা নাকি ঋষি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিখিলেশের বিমলাকে আত্মোপলব্ধির স্বাধীনতা দেওয়ার পরম অশ্লীলতাকে সমর্থন করে, সত্যদ্রষ্টা নির্ভীক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে অভয়ার জ্যোতির্ম্ময় নারীত্বকে নমস্কার করে!

সব চেয়ে তাদের বড় অপরাধ, তারা নাকি সাহিত্যে আভিজাত্য মানেনা। মুটে মজুর কুলি খালাসী দারিদ্র্য বস্তি ইত্যাদি যে সব অস্বস্তিকর সত্যকে সর্দ্দি, বাত, স্থূলতা ইত্যাদির মতন অনাবশ্যক অথচ আপাতত অপরিহার্য ব'লে জীবনেই কোনরকমে ক্ষমা করা যায়—এবং বড় জোড় কবিতায় একবার—'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু' ইত্যাদি ব'লে আলগোছে হা-হুতাশ করে ফেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, তারা সাহিত্যের স্বপ্ন-বিলাসের মধ্যে সে সবও নাকি টেনে আনতে চায়!

শুধু তাই! বস্তির অন্তরের জীবনধারাকে তারা প্রায় 'গ্যারেজ'-ওয়ালা প্রাসাদের অন্তরালের জীবনধারার মত সমান পঙ্কিল মনে করে! এমন কি, তারা মানে যে প্রাসাদপুষ্ট জীবনের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য সময়ে-সময়ে বস্তির জীবনকে ধরি-ধরিও করে!

তারা নাকি আবিষ্কার করেছে—পাপী পাপ করেনা, পাপ করে মানুষ, বা আরো স্পষ্ট করে বল্লে মানুষের সামান্য ভগ্নাংশ; মানুষের মনুষ্যত্ব দুনিয়ার সমস্ত পাপের পাওনা অনায়াসে চুকিয়েও দেউলে হয়না!

এ আবিষ্কারের দায়িত্বটুকু পর্য্যন্ত নিজেদের ঘাড়ে না নিয়ে তারা নাকি বলে বেড়ায়—বুদ্ধ খৃষ্ট শ্রীচৈতন্যের কাছ থেকে তারা এগুলি বেমালুম চুরি করেছে মাত্র।

মানুষের একটা দেহ আছে এই অশ্লীল কিংবদন্তীতে তারা নাকি বিশ্বাস করে এবং তাদের নাকি ধারণা যে, এই পরম রহস্যময় অপরূপ দেহে অশ্লীল যদি কিছু থাকে ত সে তাকে অতিরিক্ত আবরণে অস্বাভাবিক প্রাধান্য দেবার প্রবৃত্তি।

—ইতি।

কিন্তু অভিজাত, নিষ্কর্মা, মানবহিতৈষী সমাজরক্ষক আর্টত্রাতারা থাকতে ইতি হবার জো নেই।

এই সব সুস্থ সবল নীতিবলে বলীয়ান মানবজাতির স্বনিযুক্ত ত্রাতা ও স্বেচ্ছাসেবকদের সাধু ও ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে আমাদের ঘোরতর আস্থা আছে!

মানুষের এই সামান্য তিন চার হাজার বছরের ইতিহাসেই তাঁদের হিতৈষী হাতের চিহ্ন বহু জায়গায় সুস্পষ্ট।

'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' দুটি ক্ষীণপ্রাণ কাগজের কণ্ঠদলন ত সামান্য কথা। কালে হয়ত তারা পৃথিবীর সমস্ত বিদ্রোহী ও বেসুরো কণ্ঠকেই একেবারে স্তব্ধ ক'রে ধরণীকে শ্লীলতা ও ভব্যতার এমন স্বর্গ করে তুলতে পারেন যে, অতিবড় নিন্দুকেরও প্রমাণ করতে সাধ্য হবেনা, রামের জ্যামিতিক জীবন থেকে শ্যামের জ্যামিতিক জীবন বিন্দুমাত্র তফাৎ; এবং মাতা ধরিত্রী এতগুলি ছাঁচে-কাটা সুসন্তান ধারণ করবার পরম আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে সূর্য্যের অগ্নিজঠরে পুনঃপ্রবেশ

করে আত্মহত্যা করতে চাইবেন। এতদূর বিশ্বাসও আমাদের আছে।

তবে মানুষ আসলে সমস্ত শ্লীলতার চেয়ে পবিত্র ও সমস্ত ভব্যতার চেয়ে মহৎ—এই যা ভরসা।”

আমি আরেকটু যোগ করে দিই। যেখানে দাহ সেখানেই তো দ্যুতির সম্ভাবনা, যেখানে কাম সেখানেই তো প্রেমের আবির্ভাব। সুতরাং স্বীকার করো, আশীর্বাদ করো।

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মুন্সিগঞ্জ সাহিত্য-সম্মিলনীর অভিভাষণ থেকে কিছু অংশ তুলে দিলে মন্দ হবেন।

“এমনই ত হয়; সাহিত্য-সাধনায় নবীন সাহিত্যিকের এই ত সব চাইতে বড় সান্ত্বনা। সে জানে আজকের লাঞ্ছনাটাই জীবনে তার একমাত্র এবং সবটুকু নয়, অনাগতের মধ্যেও তার দিন আছে। হোক সে শতবর্ষ পরে, কিন্তু সেদিনের ব্যাকুল ব্যথিত নর-নারী শত-লক্ষ হাত বাড়িয়ে আজকের দেওয়া তার সমস্ত কালি মুছে দেবে।...আজ তাকে বিদ্রোহী মনে হতে পারে, প্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থার পাশে তার রচনা আজ অদ্ভুত দেখাবে, কিন্তু সাহিত্য ত খবরের কাগজ নয়। বর্ত্তমানের প্রাচীর তুলে দিয়ে ত তার চতুঃসীমা সীমাবদ্ধ করা যাবেনা। গতি তার ভবিষ্যতের মাঝে। আজ যাকে চোখে দেখা যায়না, আজও যে এসে পৌঁছয়নি, তারই কাছে তার পুরস্কার, তারই কাছে তার সংবর্দ্ধনার আসন পাতা আছে।

আগেকার দিনে বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে আর যা নালিশই থাক, দুর্নীতির নালিশ ছিলনা; ওটা বোধকরি তখনও খেয়াল হয়নি। এটা এসেছে হালে।....সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানিনে। নর-নারীর বহুদিনের পুঞ্জীভূত বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিশে আছে। কিন্তু একান্ত নির্দ্দয় মূর্ত্তি

দেখা দেয় কেবল নর-নারীর ভালবাসার বেলায়।....পুরুষের তত মুস্কিল নেই, তার ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে; কিন্তু কোনও সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই সে শুধু নারী। তাই সতীত্বের মহিমা প্রচারই হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য।....একনিষ্ঠ প্রেমের মর্য্যাদা নবীন সাহিত্যিক বোঝে, এর প্রতি তার সম্মান ও শ্রদ্ধার অবধি নাই, কিন্তু সে যা সইতে পারেনা, তা হচ্ছে ফাঁকি।...সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্ব্বেও ছিলনা, পরেও হয়ত একদিন থাকবেনা। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়।...

তবে একটা নালিশ এই করা যেতে পারে যে, পূর্ব্বের মত রাজা-রাজড়া জমিদারের দুঃখদৈন্যবন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্যসেবীর মন আর ভরে না। তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপশোবের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে নিজের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে রুশ সাহিত্যের মত যে দিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ-বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্যসাধনা কেবল স্বদেশ নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।"

এইবার বিরোধী দলের 'নব-সাহিত্য-বন্দনাটা' আবার মনে করিয়ে দিই।

"রাজ্যোস্থানে রচিলে বস্তি,
স্বস্তি নব সাহিত্য স্বস্তি,
পথ-কর্দ্দমে ধূলি ও পঙ্কে
ঘোষিলে আপন বিজয়-শঙ্খে,
লাঞ্ছিতা পতিতার উদ্‌ঘাটিলে দ্বার
সতীত্বে তাহারে কৈলে অভিষিক্ত—
জয় নব সাহিত্য জয় হে।"

"কালি-কলমের" মামলা উপলক্ষ্য করে আরো একজন এগিয়ে এল। "চিত্রবহা"র জন্যে লড়তে। সে অন্নদাশঙ্কর। তখন সে বিলেতে, 'চিত্রবহা' চেয়ে নিয়ে পড়ল সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। তারপর তার প্রশংসায় দীর্ঘ এক প্রবন্ধ লিখলে। সেটা "নবশক্তিতে" ছাপা হল। লিখলে মুরলীদাকে: 'মোকদ্দমার রায়ে খুশি হতে পারলাম না। আসল প্রশ্নের মীমাংসা হলো কই? আমাদের সাহিত্যিকদের ম্যানিফেস্টো কই?'

লণ্ডন থেকে আমাকে লেখা অন্নদাশঙ্করের একটা চিঠি এখানে তুলে দিচ্ছি:

শ্রদ্ধাস্পদেষু

"কল্লোলে"র বৈশাখ সংখ্যার প্রতীক্ষায় ছিলুম। আপনার "বেদে" পড়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন সে কথা মোটের ওপর আমারও কথা। কিন্তু আমার মনে হয় মিথুনাসক্তি নিয়ে আরেকটু ব্যাপকভাবে ভাববার সময় এসেছে। হঠাৎ একই যুগে এতগুলো ছোট-বড়-মাঝারি লেখক মিথুনাসক্তিকে অত্যধিক প্রাধান্য দিতে গেল কেন? দেখে শুনে মনে হয় বিংশ শতাব্দীর লেখকমাত্রই যেন Keatsএর মতো বলতে চায়, "I felt like some watcher of the skies when a new planet swims into his ken". আলিবাবার সামনে যেন পাতালপুরীর দ্বার খুলে গেছে। "শোনো শোনো অমৃতের পুত্রগণ, আমি জেনেছি সেই দুর্ব্বার প্রবৃত্তিকে, যে প্রবৃত্তি সকল কিছুকে জন্ম দেয়, যে প্রবৃত্তিকে স্বীকার করলে মরণ সত্ত্বেও তোমরা বাঁচবে—তোমাদের থেকে যারা জন্মাবে তাদেরি মধ্যে বাঁচবে। অসার এই সংসারে কেবল সেই প্রবৃত্তিই সার, অনিত্য এই জগতে কেবল সেই প্রবৃত্তিই নিত্য।"—এ যুগের ঋষিরা যেন এই তত্ত্বই ঘোষণা করেছেন। Personal immortality-তে তাঁদের আস্থা নেই—race immortality-ই তাঁদের একমাত্র আশা। এবং race immortality-র

ভূমিকা হচ্ছে Sex। যে বস্তু গত কয়েক শতাব্দীর বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়া সাহিত্যে taboo হয়েছিল কিম্বা বড় জোর রেষ্টোরেশন যুগের ইংলণ্ডে বা ভারতচন্দ্রীয় যুগের বাংলাদেশে বৈঠকখানাবিহারী বাবুদের মদের সঙ্গে চাটের স্থান নিয়েছিল সেই বস্তুই আজকের সমস্যাসংকুল বিশ্বে নতুন নক্ষত্রের মতো উদয় হলো। একে যদি বিকারের লক্ষণ মনে করা যায় তবে ভুল করা হবে। আসলে এটা হচ্ছে প্রকৃতির পুনরাবিষ্কার। মানুষের গভীরতম প্রকৃতি বহু শত বছরের কৃত্রিমতার তলায় তলিয়ে গিয়েছিল। এতদিনে পুনরুদ্ধারের দিন এলো। অনেকখানি আবর্জ্জনা না সরালে পুনরুদ্ধার হয়না। অথচ আবর্জ্জনা সরানো কাজটা বড় অরুচিকর। Sex সম্বন্ধে ঘাঁটাঘাঁটি সেইজন্যে বড় বীভৎস বোধ হচ্ছে। কিছুকাল পরে এই বীভৎসতা—এই বিশ্রী কৌতূহল—এই আধেক ঢেকে আধেক দেখানো—এসব বাসি হয়ে যাবে। Sexকে আমরা বিস্ময়সহকারে প্রণাম করবো, আদিম মানব যেমন করে সূর্য্যদেবতাকে প্রণাম করতো। এখনো আমরা sophistication কাটিয়ে উঠতে পারিনি বলে বাড়াবাড়ি করছি। কিন্তু এমন যুগ আসবেই যখন জন্মরহস্যকে আমরা অলৌকিক অহেতুক অতি বিস্ময়কর বলে নতুন ঋগ্বেদ রচনা করবো, নতুন আবেস্তা, নতুন Genesis. ভগবানকে পুনরাবিষ্কার করা বিংশ শতাব্দীর সব চেয়ে বড় কাজ—সেই কাজেরই অঙ্গ সৃষ্টিতত্ত্ব পুনরাবিষ্কার। বিজ্ঞান ভাবীকালের মহাকাব্য রচনার আয়োজন করে দিচ্ছে—এইবার আবির্ভাব হবে সেই মহাকবিদের যাঁরা অষ্টোত্তর শত উপনিষৎ লিখে সকলের অমৃতত্ব ঘোষণা করবেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সন্ধি হবে তখন। দেহ ও মনের বহুকালীন বন্দ্বটারও নিষ্পত্তি হবে সেই সঙ্গে।...

ভালো কথা, 'কল্লোলের' দলের কেউ বা কার' কিছুকালের জন্যে ইউরোপে আসেননা কেন? Parisএ থাকবার খরচ মাসে ৬০।৬৫৲

যদি নিজের হাতে রান্না করে খান। একসঙ্গে তিন চার জন থাকলে আরো কম খরচ। গল্প ও প্রবন্ধ লিখে এর অন্তত অর্দ্ধেক রোজগার করা কি আপনার পক্ষে বা বুদ্ধদেব বসুর পক্ষে বা প্রবোধকুমার সান্যালের পক্ষে শক্ত? বাকী অর্দ্ধেক কি আপনাদেরকে বন্ধুরা দেবে না? Parisএ বছর দুয়েক থাকা যে কত দিক থেকে কত দরকার তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবেনা। বাঙালী ছাড়া সব জাতের সাহিত্যিক বাংলা ছাড়া সব ভাষায় ওখান থেকে কাগজ বার করে। 'কল্লোলের' আপিস কলকাতা থেকে Parisএ তুলে আনেন না কেন? (Countee Cullen এখন Parisএ থাকেন—দেখা হলো।) আমার নমস্কার! ইতি। আপনার—

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

কাউন্টি কালেন সেকালের নিগ্রো কবি। তার দুটো লাইন এখনো মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে:

Yet do I marvel at this curious thing:
To make a poet black and bid him sing!

বাইশ

জানা নেই শোনা নেই, অন্নদাশঙ্করের হঠাৎ একটা চিঠি পেলাম। বিলেত থেকে লেখা, যখন সে সেখানে ট্রেনিংএ। চিঠিতে আমার সম্বন্ধে হয়তো কিছু অতিশয়োক্তি ছিল—এহ বাহ্য—কি লিখেছে তার চেয়ে কে লিখেছে সেইটেই গণনীয়। পত্রের চেয়েও স্পর্শটাই বেশি স্বাদু, বেশি স্বাগত। অন্নদাশঙ্করের সেই হস্তলিপি জীবনের পত্রে জীবনদেবতার নতুনতরো স্বাক্ষর।

বিলেত থেকে এলে তার সঙ্গে মিলিত হলাম। তাকে দেখার প্রথম সেই দিনটি এখনো মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সে শুধু রৌদ্রের উজ্জ্বলতা নয়, একটি অনির্বেয় তারুণ্যের উজ্জ্বলতা। অন্নদাশঙ্করের "তারুণ্য" কল্লোলযুগের মর্মবাণী।

ক্রমে ক্রমে সেই পরিচয়ের কলি বন্ধুতার ফুলে বিকশিত হয়ে উঠল। লাগল তাতে অন্তরঙ্গতার সৌরভ। দুজনে শান্তিনিকেতনে গেলাম, রবীন্দ্রনাথের সন্নিধানে। অমিয় চক্রবর্তীর অতিথি হলাম। কটা দিন সুখস্বপ্নের মত কেটে গেল। সুখ যায় কিন্তু স্মৃতি যায়না।

অন্নদাশঙ্করের চিঠি :

বন্ধু,

আমি ভেবেছিলুম তোমার অসুখ করেছে, শারীরিক অসুখ। তাই বেশ একটু উদ্বিগ্ন ছিলুম। আজকের চিঠি পেয়ে বোঝা গেলো অসুখ করেছে বৈ কি, কিন্তু মানসিক। উদ্বেগটা বেশী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মানুষের সংস্কার অন্তরকম।...

সরস্বতী পূজার সময় এখানে এলে কেমন হয়? বিবেচনা করে লিখো। সাহিত্যিক জলবায়ুর অভাবে মারা যাচ্ছি। দ্বিজেন মজুমদার না থাকলে এতদিনে ভূত হয়ে যেতুম।

কাল রাত্রি ২টার সময় ডিনার ও ডান্স থেকে ফিরি। নাচতে জানিনে, বসে বসে পর্য্যবেক্ষণ করছিলুম কে কী পরেছে, কত রং মেখেছে, ক'বার চোখ নাচায় ও কানের দুল দোলায়, কেমন করে nervous হাসি হাসে—যেন হিক্কা উঠেছে। ইত্যাদি। ইংরেজ ও ইঙ্গবঙ্গদের ভিড়ে আমার এত খারাপ লাগছিল তবু study করার লোভ দমন করতে পারছিলুমনা।

পরশু রাতে ১টা অবধি হয়েছিল fancy dress ball. আমি সেজেছিলুম সন্ন্যাসী। সকলে তারিফ করেছিল।

এমনি করে দিন কাটছে। কবে কে নিমন্ত্রণ করলে, কে করলে না, কে ইচ্ছে করে অপমান করলে, কে মান রাখলেনা—এই সব নিয়ে মন কষাকষি চলেছে ক্লাবের মেম্বরদের সঙ্গে। মুস্কিল হয়েছে এই যে দ্বিজেন ও আমি হাফগেরস্থ। আমরা যদি একেবারে পার্টিতে যাওয়া বন্ধ করে দিতুম ও সানন্দে একঘরে হতুম, তবে এসব pin prick থেকে বাঁচা যেতো। কিন্তু আমরা dinner jacket পরে খেতে যাই অথচ বাঙালী মেয়েদের বিজাতীয়তা দেখে মর্ম্মাহত হই; আমরা ইংরেজী পোষাকে চলি ফিরি, অথচ কোনো বাঙালী তার স্ত্রীকে "dearie" ডাকছে শুনলে চটে যাই। আমাদের চেয়ে যারা আরেক ডিগ্রী সাহেবিয়ানাগ্রস্ত তাদের সম্বন্ধে আমাদের যে আক্রোশ আমাদের ওপরে ডেপুটীবাবুদের বোধ হয় সেই আক্রোশ। কিন্তু জাতিভেদের দরুণ ডেপুটী-উকীল-জমিদার ইত্যাদির সঙ্গে আমাদের পরিচয় পর্য্যন্ত হয়নি।

মোটের উপর বড় বিশ্রী লাগছে। টেনিসটা রোজ খেলি সেই এক আনন্দ। আরেক আনন্দ চিঠি ও কাব্যাদি লেখা।

অমিয় দুখানা চিঠি লিখেছিলেন। তুমি কি শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কিছু লিখছো? আমি সত্বর সুরু করবো।"

"বন্ধু,

Departmentalএ ফেল করবো এ একেবারে মৃত্যুর মতো নিশ্চিত। অতএব আজকের এই বাদলা অপরাহ্নটিতে তোমার সঙ্গে আলাপ করবো। কোকিল ঝড়বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে অশ্রান্ত আলাপ করছে—ভবানীপুরে বা আলিপুরে শুনতে পাও?

আমার বিয়ের সম্বন্ধ ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে। তোমার আসে? সাহিত্য তো তুমিও লেখো, কিন্তু কেউ কি তাই পড়ে তোমাকে মন-প্রাণ সঁপে? যদি আই-সি এসটা কোনোক্রমে পাশ করে থাকতে, তবে হঠাৎ সবাই তোমার সাহিত্যের দরুণ তোমাকে পতিরূপে কামনা করতো এবং তুমি প্রত্যাখ্যান করলে hunger strike করতো। এই কয়েক মাসে আমার ভারি মজার মজার অভিজ্ঞতা হয়েছে। বলব তোমাকে।

অনেক সুন্দর সুন্দর গল্পের প্লট মাথায় ঘুরছে। লিখে উঠতে পারছিনে। সমাজটাকে আরেকটু ভালো করে দেখতে-শুনতে চাই। কিন্তু এ চাকরীতে থেকে সমাজের সঙ্গে point of contact জোটেনা। আমরা ক্লাব-চর জীব। ক্লাবে সম্প্রতি বাঙালী মেয়ের দুর্ভিক্ষ।

Departmentalএর সময় কলকাতায় যে ক'দিন থাকবো সেই সময়ের মধ্যে জনকয়েক সাহিত্যিককে চা খাওয়াতে চাই। সেই সূত্রে পরিচয় হবে। তুমি নাম suggest করো দেখি।

তুমি কলকাতাতেই একটা লেকচারারী জোগাড় করে থেকে যাও। মুনসেফী বড় বিদঘুটে। তোমাদের কি খুব টাকার টানাটানি?..."

"বন্ধু,

অনেকদিন পর তুমি আমাকে একখানা চিঠির মত চিঠি লিখলে। চিঠির জবাব আমি প্রাপ্তিমাত্রে লিখতে ভালোবাসি, দেরি করলে লিখতে প্রবৃত্তি হয়না, ভাব ঘুলিয়ে যায়।...

দশ বছর আমি সমাজ-ছাড়া, কদাচ আমার আপনার লোকেদের

সঙ্গে দেখা হয়। কচিৎ তাদের উপর আমি নির্ভর করেছি অন্নবস্ত্রের জন্যে বা সাংসারিক সুবিধার জন্যে। এমনি করে আমি একটা Semi-সন্ন্যাসী হয়ে পড়েছি। আমার পক্ষে বিয়ে করা হচ্ছে সমাজের সঙ্গে পুরোদস্তুর জড়িয়ে পড়া—শ্বশুর শাশুড়ী শালা শালী ইত্যাদির উৎপাত সওয়া। তাহলে চিরকাল এই চাকরীতে বাঁধা থাকতে হয়। তাহলে ইউরোপে পালিয়ে বসবাস করা চলেনা। একলা মানুষের অনেক সুবিধা। He can travel from China to Peru.

মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে বটে বিয়ে করে সংসারী হই—একটি জমিদারী কিনি, বাগানবাড়ীতে থাকি, নিজের ইস্কুলে পড়াই, নিজের হাতে বীজ বুনি ও ফসল কাটি। একটি কল্যাণী বধূ, কয়েকটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলেমেয়ে।

কিন্তু এর জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। এস্বপ্ন একা আমার হলে চলবে না। আরেকজনের হওয়া চাই। সাহিত্য আমার কাছে প্রাণের মতো প্রিয়। কিন্তু ওর চেয়ে প্রিয় সুসমঞ্জস প্রেম। ও-জিনিষ পেলে আমি হয়তো সাহিত্য ছেড়ে দিতে পারি। জীবনের মধ্যাহ্ন কালটা purely উপলব্ধি করতে চাই; তারপরে সন্ধ্যা এলে জীবনের রূপকথা বলার সময় হবে।...

I feel like a child very often. আমি খানিক কেঁচেছি। যুবক হতে আমার কিছু বিলম্ব হবে, কৈশোরটা ভালো করে শেষ করে নিই। আমার বিয়ের বয়স হয়নি।

তোমার চাকরীর জন্যে চিন্তিত হয়েছি। তুমি খুব অল্প বেতনে কাজ করতে রাজী হও তো ঢেঙ্কানালের রাজাকে লিখতে পারি। ঢেঙ্কানালের জল-হাওয়া ভালো। কত কম মাইনেতে কাজ করতে পারো, লিখো। ঢেঙ্কানলে চার পাঁচজন মানুষের একটি পরিবার ৪০।৪৫৲ টাকায় বেশ চলে। ভাবলে বলছিনে যে তুমি ৫০৲ টাকায় চাকরিতে রাজি হও। Say, 100/- ?...ইতি। তোমার অন্নদা।"

অন্নদাশঙ্কর তেমন একজন বিরল সাহিত্যিক যার সান্নিধ্যে গিয়ে বসলে আধ্যাত্মিকতার একটি সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। (তেমন আরেকজনকে দেখেছি। সে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।) একটি মৌন মহত্ত্ব যে তার চিন্তায় তা যেন স্পষ্ট স্পর্শ করি। কোনো কথা না বলে তার কাছে চুপ করে বসে-থাকাটিও অনেক কথা-ভরা। আত্মার সঙ্গে আত্মার যখন কথা হয় তখনই মহৎ আর্ট জন্ম নেয়। অন্নদাশঙ্কর সেই মহৎ আর্টের অন্বেষক। সাহিত্যের আদর্শ তার এত উঁচু, যা তার আয়ত্ত, অধিকৃত, তাতে সে আপ্তকাম নয়। জীবনে সে স্বস্থ ও শান্ত হতে পারে, কিন্তু সৃজনে সে অপরিতৃপ্ত। এমনিতে সহজ গৃহস্থ মানুষ, কিন্তু আসলে সে বন্দী প্রমিথিউস।

স্বচ্ছ সরল কথা, স্নিগ্ধ মুক্ত হাসি—চিত্তনৈর্মল্যের দুটি অপরূপ চিহ্ন। স্টাইল বা লিখনরীতিই যদি মানুষ হয় তবে অন্নদাশঙ্করকে বুঝতে কারুর ভুল হবেনা। মৌনের আবেগ নিষ্ঠার কাঠিন্য আর বৈরাগ্যের গাম্ভীর্য নিয়ে অন্নদাশঙ্কর। ভিড়ের মধ্যে থেকেও সে অসঙ্গ, অবিকৃত। আর যার বিকার নেই তার বিনাশও নেই। যাকে আমরা বাস্তব বলি তাই বিকার্য—শুধু কটি স্বপ্নই বুঝি অবিনাশী, মৃত্যুহীন। অন্নদাশঙ্কর সেই কটি স্বপ্নের চারু কারু।

ভালো লেখা লিখতে হবে। তার জন্যে চাই ভালো করে ভাবা, ভালো করে অনুভব করা আর ভালো করে প্রকাশ করা—তার মানে, একসঙ্গে মন প্রাণ আর আত্মার অধিকারী হওয়া। অন্নদাশঙ্করের লেখায় এই মন প্রাণ আর আত্মার মহামিলন।

অমিয় চক্রবর্তী "কল্লোলে" না লিখলেও কল্লোলযুগের মানুষ। এই অর্থে যে, তিনি তদানীন্তন তারুণ্যের সমর্থক ছিলেন। নিজেও অন্তরে সংক্রামিত করে নিয়েছিলেন সেই নতুনের বহ্নিকণা। "শনিবারের চিঠির" বিরুদ্ধে আমাদের হয়ে লড়েছিলেন "বিচিত্রায়"।

পুরোনো দিনের ফাইলে তাঁর একটা মাত্র চিঠি খুঁজে পাচ্ছি।

'প্রিয়বরেষু, আপনার চিঠিখানি পেয়ে খুব ভালো লাগল। এবারকার যাত্রাপর্ব্ব সুন্দর হোক—আপনাদের নূতন পত্রিকা ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়ে নিজেকে বিকশিত করুক এই কামনা করি। "কল্লোল"কে আপনি চৈতন্যময় মুক্তির বাণীতে মুখর করে তুলবেন—তার বীর্য অন্তরের নির্ম্মলতারই পরিচয় হবে।

রবীন্দ্রনাথের এই ছোটো গানটি বোধ হয় কোথাও প্রকাশিত হয়নি। তিনি যাবার আগে ব'লে গিয়েছিলেন "মহুয়ার" কবিতা বাদে কোনো কিছু থাকলে তা আপনাকে পাঠাতে।

তাঁর ঠিকানা দিচ্ছি।...আপনি ঐ ঠিকানায় চিঠি লিখলে তিনি পাবেন—তবে পেতে দেরি হবে কেননা তিনি কোনো স্থানেই বেশি সময় থাকবেন না, কাজের ভিড়ও তাঁকে ঘিরে রাখবে। আপনার চিঠি এবং নূতন পত্রিকা পেলে তিনি বিশেষ আনন্দিত হবেন।

আমার একটা কবিতা পাঠালাম—এইটুকু অনুরোধমাত্র যেন ছাপার ভুল না হয়। এই ভয়বশত কোথাও কোনো কবিতা ছাপাতে ভরসা হয় না। "প্রবাসীতে"ও ভুল করেছে—হয়তো এ বিষয়ে আমাদের কাগজপত্র অসাবধানী। কবিতা ছাপানোর কথা বলছি—কিন্তু বলা বাহুল্য এবারকার রচনা উপযুক্ত না ঠেকলে কখনোই ছাপাবেন না। পরে অন্য কিছু লিখে পাঠাতে চেষ্টা করব।

আমার একটা বক্তব্য ছিল। আপনার "বেদে" সম্বন্ধে কবির লেখা চিঠিখানি আপনি যদি সমগ্র উদ্ধৃত করে নূতন "কল্লোলে" ছাপান একটা বড়ো কাজ হবে। ঐ পত্রের মূল্য সমস্ত দেশের কাছে, আপনার লেখার সমালোচনা আছে কিন্তু তা ব্যক্তিগতের চেয়ে বেশি।"

গানটি "দুয়ার" নাম দিয়ে "কল্লোলে" ছাপা হয়েছিল। এ দুয়ার প্রকাশ-প্রারম্ভের প্রতীক, চিরকালের অনাগতের আমন্ত্রণ। সেই অর্থে এ গানটির প্রযুক্ততা "কল্লোলে" অত্যন্ত স্পষ্ট।

হে দুয়ার, তুমি আছো মুক্ত অনুক্ষণ
রুদ্ধ শুধু অন্ধের নয়ন।
অন্তরে কী আছে তাহা বোঝেনা সে তাই
প্রবেশিতে সংশয় সদাই ॥

হে দুয়ার, নিত্য জাগে রাত্রি দিনমান
সুগম্ভীর তোমার আহ্বান।
সূর্য্যের উদয় মাঝে খোলো আপনারে
তারকায় খোলো অন্ধকারে ॥

হে দুয়ার, বীজ হতে অঙ্কুরের দলে
খোলো পথ, ফুল হতে ফলে।
যুগ হতে যুগান্তর করো অবারিত
মৃত্যু হতে পরম অমৃত ॥

হে দুয়ার, জীবলোক তোরণে তোরণে
করে যাত্রা মরণে মরণে।
মুক্তি সাধনার পথে তোমার ইঙ্গিতে
"মা ভৈঃ" বাজে নৈরাশ্যনিশীথে ॥

অমিয়বাবুর ভাই অজিত চক্রবর্তীর নাম সাহিত্যের দৈনিক বাজারে প্রচলিত নয়। কেননা সে তো সাহিত্য রচনা করেনি, সে সাহিত্য ভজনা করেছে। ভক্ত কি ভজনীয়ের চেয়ে কম? রসস্রষ্টার দাম কি যদি রসজ্ঞ না থাকে? চারদিকেই যদি অরসিক-বেরসিকের দল, তবে তো সমস্ত সৃষ্টি রসাতলে। অজিত চক্রবর্তী ছিল রসোপভোগের দলে, তার কাজ ছিল তার বোধের দীপ্তি দিয়ে লেখকদের বোধিকে উত্তেজিত করা। ট্রামে-বাসে রাস্তায়-ঘাটে যেখানেই দেখা হোক, কার কী কবিতা ভালো লেগেছে তাই মুখস্ত বলা। অনেক দিন দেখা না হলে বাড়িতে বয়ে

এসে অন্তত প্রশংসনীয় অংশটুকুকে চিহ্নিত করে যাওয়া। যার সৃষ্টিকে সুন্দর বলে অনুভব করলাম সেই আনন্দ সৃষ্টিকর্তাকে পৌঁছে না দিলে আস্বাদনের পূর্ণতা কই ?

সর্বতোদীপ্ত যৌবনের প্রতিভূ ছিল অজিত। সে যে অকালে মরে গেল তাতেও তার রসবোধের গভীরতা উহ্য ছিল। জীর্ণ বসন ছাড়তে যদি ভয় নেই তবে মৃত্যুতে বা কী ভয় ? তার নিঃশব্দ মুখে এই রসাস্বাদের প্রসন্নতাটি চিরকালের জন্যে লেখা হয়ে আছে।

একদিন এক হালকা দুপুরে কল্লোল-আপিসের ঠিকানায় লম্বাটে খামে একটা চিঠি পেলাম। কবিতায় লেখা-চিঠি—১০৯ সীতারাম ঘোষ স্টিট থেকে লিখেছে কে এক শ্যামল রায়। কবিতাটি উদ্ধৃত করতে সংকোচ হচ্ছে, কবির তরফ থেকে নয়, আমার নিজের তরফ থেকে। কিন্তু যখন ভাবি শ্যামল রায় বিষ্ণু দে এবং এই চিঠির সূত্র ধরেই তার "কল্লোলে" আবির্ভাব, তখন চিঠিটির নিশ্চয়ই কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তাই তুলে দিচ্ছি :

"হৃদয়ের মাঝে আছে যে গোপন বেদে,
অদ্ভুত তার বিচিত্র কিবা ভাষা,
অপরূপ তার ক্ষণিকের ভালোবাসা
ঘোরে সে কেবল খেয়ালিয়া হেসে কেঁদে।
ভাষার বাঁধন রেখে দেছে তারে বেঁধে
ফোটেনিক তার অতীত স্মৃতি ও আশা,
জোটেনিক তার কবিদের স্নেহ-হাসা—
বেদে যে ডুবেছে মনুনিষিদ্ধ ক্লেদে!
তুমি দিলে তার মূকমুখমাঝে ভাষা
হে নবস্রষ্টা! দিলে জীবনের আশা।
বনজ্যোৎস্নার আলোতে ছেয়েছে মন,
মৈত্রেয়ী মোরে মিত্র করেছে তার,

"আজানী খুলিছে উদাস হিয়ার দ্বার—
হৃদয়বেদিয়া ঘুরিছে—এই জীবন ?"

স্বপ্নভরা ছুটি সস্মিত চোখ, সুমিতমৃদু কথা আর সরলসুস্থ হাসি—এই তখন বিষ্ণু দে। এন্তার বই আর দেদার সিগারেট—ছুইই অজস্র পড়তে আর পোড়াতে দেয় বন্ধুদের। বেশবাসে সাদাসিধে হয়েও বিশেষভাবে পরিচ্ছন্ন, ব্যবহারে একটু নির্লিপ্ত হয়েও সৌজন্যসুন্দর। কাছে গেলে সহজে চলে আসতে ইচ্ছে করেনা। বুদ্ধির ঝলস বা বিত্তের জৌলুসের বাইরেও এমন একটি নিভৃত হৃদ্যতা আছে যা মনকে আকর্ষণ করে, ভিড় সরিয়ে মনের অন্দরে বসিয়ে রাখে। যেটুকু তার স্থান ও যেটুকু তার সংস্থান তারই মধ্যে তার সৌন্দর্যের অধিষ্ঠান দেখেছি। ঠিক গল্প নয়, কেচ্ছা শুনতে ও বলতে খুব ভালবাসে বিষ্ণু। এবং সে সব কাহিনীর মধ্যে যেটুকুতে দ্বেষমুক্ত শ্লেষ আছে সেটুকুই আহরণ ও বিতরণ করে। স্মৃতিশক্তি প্রখর, তাই মজাদার কাহিনীর সঞ্চয় তার অফুরন্ত। অল্প কথায় অনেক অর্থের সূচনা করতে জানে বলে বিষ্ণুর রচনায় নিরুদ্ধ আবেগ, প্রোজ্জ্বল কাঠিন্য।

"প্রগতিতে" তখন 'পুরাণের পুনর্জন্ম' লেখা হচ্ছে—হালের সমাজ ও সভ্যতার পরিবেশে রামায়ণের পুনর্লেখন। প্রভু গুহ-ঠাকুরতাই সে লেখার উদ্বোধন করেছেন। তারই অনুসরণে বিষ্ণু "কল্লোলে" 'পৌরাণিক প্রশাখা' লিখলে—ভরতকে নিয়ে। প্রভু গুহ-ঠাকুরতা ঢাকার দলের মুকুটমণি—ব্যক্তিত্বে-স্বাতন্ত্র্যে শোভনমোহন। ওঁর কাছ থেকে সাহিত্যবিষয়ে পাঠ নেওয়া, বই পড়তে চাওয়া বা সিগারেট খেতে পাওয়া প্রায় একটা সম্মাননার জিনিস ছিল। আমার ত্রিশ-গিরিশের বাসায় যখন উনি প্রথম আসেন, তখন মনে হয়েছিল লক্ষ্মীছাড়াদের দলে এ কোন লক্ষ্মীমন্ত রাজপুত্র! কিন্তু যিনি লক্ষ্মীছাড়াদের গুরু তাঁকে সুলক্ষণাক্রান্ত মনে করার কোনো কারণ ছিলনা। নোঙর-ছেঁড়া ভাঙা নৌকোয় তিনিও অপারে পাড়ি জমিয়েছেন।

"আমরা নোঙর-ছেঁড়া ভাঙা তরী ভেসেছি কেবল।
আমরা এবার খুঁজে দেখি অকূলেতে কূল মেলে কি,
দ্বীপ আছে কি ভবসাগরে—
যদি সুখ না জোটে দেখব ডুবে কোথায় রসাতল॥"

"ধূপছায়া" বেরোয় এ সময়। আধুনিক সাহিত্যেরই পতাকাবাহী পত্রিকা। সম্পাদক ডাক্তার রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় স্কুলে আমার আর প্রেমেনের সহপাঠী ছিল। তাই আমাদের দলে টানল সহজেই। সেই টানে আমরা ও-দল থেকে নতুন কয়েকজন লেখককে "কল্লোলে" নিয়ে এলাম। পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় আগেই এসেছিল, এবার এল সত্যেন্দ্র দাস, প্রণব রায়, ফণীন্দ্র পাল আর সুনীল ধর। ভবের পদ্মপত্রে আরো কটি চঞ্চল জলবিন্দু। নবীনের দীপ্তার্করাগে ঝলমল।

"কল্লোলের" এ নব পর্যায়টি আরো মধুর হয়ে উঠল। দুয়ার অনুক্ষণ খোলা আছে, হে তরুণ, জরাহীন যৌবনের পূজারী, নবজীবনের বার্তাবহ, এখানে তোমাদের অনন্ত নিমন্ত্রণ। বর্ষে-বর্ষে যুগে-যুগে আসবে এমনি এই যৌবনের ঢেউ। ধরন-ধারন-করণ-কারণ-না-জানা শাসন-বারণ-না-মানা নিঃসম্বলের দল। স্বপ্নের নিশান নিয়ে সত্যের চারণেরা। "কল্লোল" চিরযুবা। চিরযুবা বলেই চিরজীবী।

সত্যেন্দ্র দাস কোথায় সরে পড়ল, থেকে গেল আর চার-জন, পাঁচুগোপাল, প্রণব, ফণী আর সুনীল—"বন্ধু-চতুষ্টয়"। একটি সংযুক্ত প্রচেষ্টা ও একটি প্রীতিপ্রেরিত একপ্রাণতা। যেন বিরাট একটা বন্যার জল কোথায় গিয়ে নিভৃতে একটি স্তব্ধ-শীতল জলাশয় রচনা করেছে। "কল্লোল" উঠে গেলে আড্ডার খোঁজে চলে এসেছি এই বন্ধু-চতুষ্টয়ের আখড়ায়। পেয়েছি সেই হৃদয়ের উষ্ণতা, সেই নিবিড় ঐক্যবোধ। মনে হয়নি উঠে গেছে "কল্লোল"।

এ সময়ে নবাগত বন্ধুদের সমাগমে "মহাকাল" নামে এক পত্রিকার

আবির্ভাব হয়। "শনিবারের চিঠির" প্রত্যুক্তি। "শনিবারের চিঠি" যেমন বাংলাসাহিত্যের শ্রদ্ধেয়দের গাল দিচ্ছে—যেমন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র—তেমনি আরো কজন শ্রদ্ধাভাজনদের—যাদের প্রতি "শনিবারের চিঠির" মমতা আছে—তাদেরকে অপদস্থ করা। "মহাকালের" সঙ্গে আমি, বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু সংশ্লিষ্ট ছিলাম। মহাকাল অনন্তকাল ধরে রক্তের অক্ষরে মানুষের জীবনের ইতিহাস লেখে, কিন্তু এ "মহাকাল" যে কিছুকাল পরেই নিজের ইতিহাসটুকু নিয়ে কালের কালিমায় বিলুপ্ত হয়ে গেল এ একটা মহাশান্তি। বিবেচনা করে দেখলাম, যে সৃষ্টিকর্তা সে শুধু রচনাই করে সমালোচনা করেনা। যিনি আকাশ ভরে এত তারার দীপ জ্বালিয়েছেন তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র লেখেন না। মল্লিনাথের চেয়ে কালিদাস অতুলনীয়রূপে বড়। সৃষ্টিতে যে অপটু সেই পরের উচ্ছিষ্ট ঘাঁটে। নিজের পূর্ণতার দিকে না গিয়ে সে যায় পরের ছিদ্রান্বেষণের দিকে। লেখক না হয়ে অবশেষে সমালোচক হয়।

নিন্দা করছে তো করুক। নিন্দার উত্তর কি নিন্দা? নিন্দার উত্তর, তন্নিষ্ঠের মত নিজের কাজ করে যাওয়া, নিজের ধর্মপথে দৃঢ়ব্রত থাকা। স্বভাবচ্যুতি না ঘটানো। আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করা। এক কথায় চুপ করে যাওয়া। অফুরন্ত লেখা। ধ্যানবৃক্ষের ফল এই স্তব্ধতা। কর্মবৃক্ষের ফল এই সৃষ্টি। আরো সংক্ষেপে, ধৈর্য ধরা। ধৈর্যই সব চেয়ে বড় প্রার্থনা।

তাছাড়া, এমনিতেও "মহাকাল" চলতনা। তার কারণ অন্য কিছু নয়, এ ধরনের কাগজ চালাতে যে কূটনীতি দরকার তা তার জানা ছিলনা। হেয়-র সঙ্গে উপাদেয়কে মিশিয়ে দেওয়া, লঘুর সঙ্গে গম্ভীর, খিস্তি-খেউড়ের সঙ্গে বৈরাগ্যশতক বা বেদান্তদর্শন। "শনিবারের চিঠি" এ বিষয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমান। একদিকে মণিমুক্তার আবর্জনা, অন্যদিকে

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, রবীন হালদার ইত্যাদির প্রবন্ধ। অকুলীনকে আভিজাত্যের মুখোস পরানো। এবং, এতদূর পর্যন্ত যে, মোহিতলাল শিবস্তব করতে বসলেন। কথাই আছে, শিবো ভূত্বা শিবং যজেৎ। "শনিবারের চিঠি"কে উদ্দেশ করে লিখলেন মোহিতলাল।

"'শিব' নাম জপ করি' কালরাত্রি পার হয়ে যাও—
হে পুরুষ! দিশাহীন তরণীর তুমি কর্ণধার!
নীর-প্রান্তে প্রেতচ্ছায়া, তীরভূমি বিকট আঁধার—
ধ্বংস দেশ—মহামারী!—এ শ্মশানে কারে ডাক দাও?
কাণ্ডারী বলিয়া কারে তর-ঘাটে মিনতি জানাও?
সব মরা!—শকুনি গৃধিনী হের ঘেরিয়া সবার
প্রাণহীন বীর-বপু, উর্দ্ধস্বরে করিছে চীৎকার!
কেহ নাই!—তরী 'পরে তুমি একা উঠিয়া দাঁড়াও!

ছলভরা কলহাস্যে জলতলে ফুঁসিছে ফেনিল
ঈর্ষ্যার অজস্র ফণা, অর্দ্ধমগ্ন শবের দশনে
বিকাশে বিদ্রূপ-ভঙ্গি, কুৎসা-ঘোর কুহেলি ঘনায়—
তবু পার হ'তে হবে, বাঁচাইতে হবে আপনায়!
নগ্ন বক্ষে, পাল তুলি' একমাত্র উত্তরী-বসনে,
ধর হাল—বদ্ধ করি' করাঙ্গুলি, আড়ষ্ট আনীল!"

আদিরসসিক্ত আধুনিক কীর্তনেও এমনি ভাবে রাধা-কৃষ্ণের নাম ঢুকিয়ে দেবার চতুরতা দেখেছি।

আরো দুজন লেখক চকিততড়িতের মত এসে চলে গেল—"কল্লোলের" বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় আর "ধূপছায়ার" অরিন্দম বসু। বাসুদেব "কল্লোলের" বহু আড্ডা-পিকনিকে এসেছে, হেসে গেছে অনেক উচ্চ

হাসি—"বিচিত্রায়"ও তার লেখার জের চলেছিল কিছুকাল। তারপর কোথায় চলে গেল আর ঠিকানা নেই। অরিন্দমও বেপাত্তা।

এসেছিল অখিল নিয়োগী আর মন্মথ রায়। মন্মথকে যদিও সব সময়ে মনের মত করে পাওয়া যেত না কাছাকাছি, অখিলের ঘরের দরজায় খিল ছিল না। আমাদের বইয়ের তো আবার একজন আর্টিস্ট চাই—অখিলই আমাদের সেই চিত্তরঞ্জী চিত্রকর।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশি ও পরিমল গোস্বামীও "কল্লোলে" লিখেছেন। বিভূতিবাবু প্রায় নিয়মিত লেখকের মধ্যে। তাঁর অনেকগুলি গল্প "কল্লোলে" বেরিয়েছে, কিন্তু তিনি নিজে কোনোদিন "কল্লোলে" আসেননি। যিনি হাসির গল্প লেখেন তিনি সকল দলেই হাসির খোরাক পান এবং কাজেকাজেই তিনি সকল দলের বাইরে। বা, তিনি সকল দলের সমান প্রিয়।

শিবরাম তো হাসির গল্প লেখে, তবে তাকে "কল্লোলের" দলে টানি কেন? কারণ "কল্লোলের" সমসময়ে শিবরাম বিপ্লবপ্রধান কবিতা লিখত। যার কবিতার বইর নাম "মানুষ" আর "চুম্বন" সে তো সবিশেষ আধুনিক। বই দুখানি থেকে দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:

"আমার স্বাচ্ছন্দ্য মোরে হানিছে বিকার,
এই আলো এ বাতাস
যেন পরিহাস—
আমার সম্মান মোরে করে অপমান।—
ভূমাতেও নাহি সুখ, অমৃতেও নাহি অধিকার
—কে সহিবে আত্মার ধিক্কার!...
সুখ নাই পূর্ণতায়, তিক্ত প্রেয়সীর ওষ্ঠাধর
সভ্যতায় সুখ নাই, শত কোটী নর যার পর—
এ জীবন এত সুখহীন—বেদনাও হেথায় বিলাস!

কিংবা :

"গাহি জয় জননী রতির !
এ ভুবনে প্রথমা গতির—
গাহি জয়—
যে গতির মাঝে ছিল জীবনের শত লক্ষ গতি
নিত্য নব আগতির
অনন্ত বিস্ময় ।
স্বর্গ হতে আসিল যে রসাতলে নেমে
সকলের পাপে আর সকলের প্রেমে...
গাহি জয় সে বিজয়িনীর !
যে বিপুল যে বিচিত্র যে বিনিদ্র কাম
গাহি জয়—তারই জয় ।"

হেমন্ত সরকার কল্লোল যুগের কেউ নন একথা বলতে রাজি নই। তিনি আমাদের পক্ষে কিছু লেখেননি হয়তো কিন্তু বরাবর অনুপ্রাণনা দিয়ে এসেছেন। সুভাষচন্দ্রের সতীর্থ, নজরুলের বন্ধু, হেমন্তকুমার চিরকাল বন্ধন-বশ্যতা-না-মানা অমেয়জীবী যৌবনের পক্ষে। তাই তিনি বহুবার আমাদের সঙ্গে মিশেছেন, আমরাও তাঁর কাছ থেকে বহু আনন্দ নিয়ে এসেছি। উল্লাসে-উৎসবে বহু ক্ষণ-খণ্ড কেটেছে তাঁর সাহচর্যে। তিনি বলতেন, যে কিছুই করে না, কিছুই বলে না, কিছুই হয় না, সেই শুধু নিন্দা এড়ায়। যে কিছু করে, বলে, বা হয়, সেই তো নিন্দা দ্বারা স্বীকৃত, সংবর্ধিত। চলতে-চলতে একবারও পড়ব না এতে কোনো মহত্ত্ব নেই, যতবার পড়ব ততবারই উঠব এতেই আসল মহত্ত্ব। তাই যত গাল খাবে তত লিখবে। শত চীৎকারেও ক্যারাভেন থামেনি কোনোদিন।

বর্ধমানের বলাই দেবশর্মার চিঠি নিয়ে কল্লোল-আপিসে আসে

একদিন দেবকী বসু, বর্তমানে এক জন বিখ্যাত ফিলম-ডিরেক্টর। চিঠিখানি পত্রবাহকের পরিচিতি বহন করছে—'ইনি আমার 'শক্তি' কাগজের সহকারী'—অনুরোধ—'যদি এর লেখা তোমরা দয়া করে একটু স্থান দাও তোমাদের পত্রিকায়।' ঠিক উদীয়মান নয়, উদয়-উন্মুখ দেবকী বোস বিনয়গলিত ভঙ্গিতে বসল "কল্লোলের" তক্তপোশে। দীনেশরঞ্জন হয়তো বুঝলেন, এর স্থান এই তক্তপোশে নয়, অন্য মঞ্চে। দমদমে তখন ধীরেন গাঙ্গুলিরা ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিলম কোম্পানি চালাচ্ছে, সেইখানে যাতায়াত ছিল দীনেশরঞ্জনের। দেবকী বোসকে সেখানে নিয়ে গেলেন দীনেশরঞ্জন। দেবকী বোস দেখতে পেল তার সাফল্যের সম্ভাবনা। সে আর ফিরল না। বলাই দেবশর্মার পরিচয়পত্র প্রত্নতত্ত্বে লীন হয়ে গেল!

সিনেমায় ফল পেলে সাহিত্যফলের জন্যে বুঝি কেউ আর লালায়িত হয় না। মদের স্বাদ পেলে মধুর সন্ধানে কে আর কমলবনে বিচরণ করে? এককালে দারিদ্র্যপীড়িত লেখকের দল ভাগ্যদেবতার কাছে এই প্রার্থনাই করেছিল, জমিদারি-তেজারতি চাই না, শুধু অভাবের ঊর্ধ্বে থাকতে দাও, এই ক্লেশক্লেদময় কায়ধারণের ঊর্ধ্বে। দাও শুধু ভদ্র পরিবেশে পরিমিত উপার্জন, যাতে স্বচ্ছন্দ-স্বাধীন মনে পরিপূর্ণ ভাবে সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করতে পারি। সাহিত্যই মুখ্য আর সব গৌণ। সাহিত্যই জীবনের নিশ্বাসবায়ু।

গল্পে নাকের বদলে নরুন দিয়েছিল। ভাগ্যদেবতা সাহিত্যের বদলে সিনেমা দিলেন।

তেইশ

লিখছি, চোখের সামনে কম্পমান কুয়াসার মত কি-একটা এসে দাঁড়াল ভাসতে-ভাসতে। আস্তে-আস্তে সে শূন্যাকার কুয়াসা রেখান্বিত হয়ে উঠল। অস্পষ্ট এক মানুষের মূর্তি ধারণ করলে। প্রথমে ছায়াময়, পরে শরীরী হয়ে উঠল।

অপরূপ সুন্দর এক যুবকের মূর্তি। যুবক, না, তাকে কিশোর বলব? ধোপদস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এসেছে, পায়ে ঠনঠনের চটি। মাথায় একরাশ এলোমেলো চুল। সেই শিথিল-স্খলিত কেশদামে তার গৌর মুখখানি মনোহর হয়েছে। ঠোঁটে বৈরাগ্যনির্মল হাসি, চোখে অপরিপূর্ণতার ঔদাস্য। হাতে কতগুলি ছিন্ন পাণ্ডুলিপি।

'কে তুমি?'

'চিনতে পাচ্ছ না?' ম্লানমৃদুরেখায় হাসল আগন্তুক: 'আমি সুকুমার।'

'কোন সুকুমার?'

'সুকুমার সরকার।'

চিনতে পারলাম। কল্লোলের দলের নবীনতম অভ্যাগত।

'হাতে ও কী! কবিতা?' প্রশ্ন করলাম সকৌতূহলে।

'পৃথিবীতে যখন এসেছি, কবিতার জন্যেই তো এসেছি। কবিতায়ই তো পৃথিবীর প্রাণ, মানুষের মুক্তি। স্বর্গের অমৃতের চেয়েও পৃথিবীর কবিতা অমৃততর।'

'কিসের কবিতা? প্রেমের?'

'প্রেম ছাড়া আবার কবিতা হয় নাকি? তোমাদের এ সময়ে রুটি নিয়ে ঢের রোমান্টিসিজম চলেছে—কিন্তু যাই বলো, সব খিদেই

মেটে, প্রেমের ক্ষুধাই অতৃপ্য। লাখো লাখো যুগ হিয়ে হিয় রাখনু—এ তো কম করে বলা। শুনবে একটা কবিতা? সময় আছে?'

তার পাণ্ডুলিপি থেকে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল স্নকুমার :

"সে হাসির আড়ালে রাখিব দুই সারি শ্বেত মুক্তামালা,
রাঙা-রাঙা ক্ষীণ মণি-কণা পাশে-পাশে অঙ্কিব নিরালা!
শ্রাবণের উড়ন্ত জলদে রচি এলো-কেশ নিরুপম,
সিঁথি দেব তমালের বনে সরিতের শীর্ণ ধারা সম!
ললাট সে লাবণ্যবারিধি, সিঁদুর প্রদীপ তার বুকে
অলকের কালিমা-সন্ধ্যায় ভাসাইব তৃপ্তিভরা সুখে!
বাহু হবে বসন্ত উৎসবে লীলায়িত বেতসের মত,
স্পর্শনের শিহর-কণ্টকে দেবে মধুদংশ অবিরত!
চম্পকের কুঁড়ি এনে এনে সৃষ্টি করি সুন্দর আঙুল,
শীর্ষদেশে দেব তাহাদের ছোট-ছোট বাঁকা চন্দ্রফুল!
সূর্য্যমুখী কুসুমের বুকে যে সুবর্ণ যৌবনের আশ
নিঙাড়িয়া তার সর্ব্বরস এঁকে দেব বক্ষের বিলাস!
পরে অর্দ্ধ হৃৎপিণ্ড মোর নিজ হাতে ছিন্ন করি নিয়া
দেহে তব আনিব নিশ্বাস প্রেমমন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠিয়া!"

মুহূর্তে স্নকুমারের উপস্থিতি দিব্যার্কত্যুতিময় হয়ে উঠল। আর তাকে রেখার মধ্যে চেতনাবেষ্টনীর মধ্যে ধরে রাখা গেল না। মিলিয়ে গেল জ্যোতির্মণ্ডলে।

কতক্ষণ পরে ঘরের শুব্ধতায় আবার কার সাড়া পেলাম। নতুন কে আরেকজন যেন ঢুকে পড়েছে জোর করে। অপরিচিত, বিকট-বিকৃত চেহারা। ভয় পাইয়ে দেবার মত তার চোখ।

'না, ভয় নেই। আমি।' শ্রান্তিমাখানো সুরে বললে।

গলার আওয়াজ যেন কোথায় শুনেছি। জিগগেস করলাম, 'কে তুমি ?'

'আমি সেই সুকুমার।'

সেই সুকুমার ? সে কি ? এ তুমি কী হয়ে গিয়েছ ! তোমার সেই চম্পককান্তি কই ? কই সেই অরুণ-তারুণ্য ? তোমার চুল শুষ্করুক্ষ, বেশবাস শতছিন্ন, নগ্ন পায়ে ধুলো—

'বসব একটু এখানে ?'

'বসো।'

'তুমি বসতে জায়গা দিলে তোমার পাশে ? আশ্চর্য ! কেউ আর জায়গা দেয় না। পাশে বসলে উঠে চলে যায় আচমকা। আমি ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য। আমি কি তবে এখন ফুটপাতে শুয়ে মরব ?'

'কেন, তোমার কি কোনো অসুখ করেছে ?'

'করেছিল। এখন আর নেই।' বিদ্রূপকুটিল কণ্ঠে হেসে উঠল সুকুমার।

'নেই ?'

'বহুকষ্টে সেরে উঠেছি।'

'কি করে ?'

'আত্মহত্যা করে।'

'সে কি ?' চমকে উঠলাম : 'আত্মহত্যা করতে গেলে কেন ?'

'নৈরাশ্যের শেষপ্রান্তে এসে পৌচেছিলাম, মনোবিকারের শেষ আচ্ছন্ন অবস্থায়। সংসারে আমার কেউ ছিল না—মৃত্যু ছাড়া। আর একজন যে ছিল সে আমার প্রেম, যে অপ্রাপ্তব্য অলব্ধব্য—যার মুখ দেখা যায় না প্রত্যক্ষচক্ষে। সেই অন্ধ আবৃত মুখ উন্মোচিত করবার জন্যে তাই চলে এলাম এই নির্জনে, এই অন্ধকারে—'

'কেন তোমার এই পরিণাম হল ?'

'যিনি পরিণামপ্রদায়ী তিনি বলতে পারেন।' হাসল সুকুমার: 'যুগব্যাধির জ্বর ঢুকেছিল আমার রক্তে, সব কিছুকে অস্বীকার করার দুঃসাহস। সমস্ত কিছু নিয়মকেই শৃঙ্খল বলে অমান্য করা। তাই নিয়মহীনতাকে বরণ করতে গিয়ে আমি উচ্ছৃঙ্খলতাকেই বরণ করে নিলাম। আমার সে উজ্জ্বল উদার উচ্ছৃঙ্খলতা! অল্পপ্রাণ হিসেবী মনের মলিন মীমাংসা তাতে নেই, নেই তাতে আত্মরক্ষা করবার সংকীর্ণ কাপুরুষতা। সে এক নিবারণহীন অনাবৃতি। পড়ব তো মরব বলে ভয় করব না। বিদ্রোহ যখন করব তখন নিজের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করব। তাই আমার বিদ্রোহ সার্থকতম, পবিত্রতম বিদ্রোহ!' প্রদীপ্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সুকুমার।

'কিন্তু, বলো, কী লাভ হল তোমার মৃত্যুতে?'

'একটি বিশুদ্ধ আত্মদ্রোহের স্বাদ তো পেলে। আর বুঝলে, যা প্রেম তাই মৃত্যু। জীবনে যে আবৃতমুখী মৃত্যুতে সে উন্মোচিতা।'

বলতে-বলতে সমস্ত কায়মালিন্য কেটে গেল সুকুমারের। অন্তরীক্ষের ধৌতধবল জ্যোতিষ্মান উপস্থিতিতে সে উপনীত হল। হৃদয়ের মধ্যে শুধু একটি কুমার-কোমল বন্ধুতার স্নেহস্পর্শ রইল চিরস্থায়ী হয়ে।

শিশিরকুমার ভাদুড়ির নাট্যনিকেতনে একদা রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন 'শেষরক্ষা' দেখতে। সেটা "কল্লোলের" পক্ষে একটা স্মরণীয় রাত, কেননা সে অভিনয় দেখবার জন্যে "কল্লোলের" দলেরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল। আমরা অনেকেই সেদিন গিয়েছিলাম। অভিনয় দেখবার ফাঁকে-ফাঁকে বারে-বারে রবীন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করেছি তাতে কখন ও কতটুকু হাসির রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। স্বভাবতই, অভিনয় সেদিন ভয়ানক জমেছিল, এবং 'যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে' গানের সময় অনেক দর্শকও সুর মিলিয়েছিল মুক্তকণ্ঠে। শেষটায় আনন্দের লহর পড়ে গিয়েছিল চারদিকে। শিশিরবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে এলেন

কবির কাছে, অভিনয় কেমন লাগল তাঁর মতামত জানতে। সরলস্নিগ্ধ কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'কাল সকালে আমার বাড়িতে যেও, আলোচনা হবে।' আমাদের দিকেও নেত্রপাত করলেন : 'তোমরাও যেও।'

দীনেশদা, নৃপেন, বুদ্ধদেব আর আমি—আর কেউ সঙ্গে ছিল কিনা মনে করতে পারছি না—গিয়েছিলাম পরদিন। শিশিরবাবুও গিয়েছিলেন ওদিক থেকে। রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বসবার ঘরে একত্র হলাম সকালে। স্নানশেষে রবীন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকলেন।

কি কি কথা হয়েছিল স্পষ্ট কিছু মনে নেই। ইংরিজি পাবলিক-কথাটার রসাত্মক অর্থ করেছিলেন—লোকলক্ষ্মী—এ শব্দটা গেঁথে আছে। সেদিনকার সকাল বেলার সেই ছোট্ট ঘটনাটা উল্লেখ করছি, আর কিছুর জন্যে নয়, রবীন্দ্রনাথ যে কত মহিমাময় তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছিলাম বলে। এমনিতে শিশিরকুমার আমাদের কাছে বিরাট বনস্পতি—অনেক উচ্চস্থ। কিন্তু সেদিন রবীন্দ্রনাথের সামনে ক্ষণকালের জন্যে হলেও, শিশিরকুমার ও আমাদের মধ্যে যেন কোনোই প্রভেদ ছিল না। দেবতাত্মা নগাধিরাজের কাছে বৃক্ষ-তৃণ সবই সমান।

শরৎচন্দ্র এসেছিলেন একদিন "কল্লোলে"—"কালিকলমে" একাধিক দিন।

কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের উপরে বরদা এজেন্সি অর্থাৎ কালি-কলম-আপিসের পাশেই আর্য-পাবলিশিং হাউস। আর্য-পাবলিশিং-এর পরিচালক শশাঙ্কমোহন চৌধুরী। শশী তখন "বাংলার কথায়" সাব-এডিটারি করে আর দোকান চালায়। বেলা দুটো পর্যন্ত দোকানে থাকে তারপর চলে যায় কাগজের আপিসে। বেস্পতিবার কাগজের আপিসে ছুটি, শশাঙ্ক সেদিন পুরোপুরি দোকানের বাসিন্দা।

'মুরলী আছে ? মুরলী আছে ?' শশব্যস্ত হয়ে শরৎচন্দ্র একদিন ঢুকে পড়লেন আর্য-পাবলিশিং-এ।

বরদা ভুল করেছেন। লাগোয়া আর্য-পাবলিশিংকেই ভেবেছেন বরদা এজেন্সি বলে।

এত ত্বরা যে, দোকানের পিছন দিকে যেখানটায় একটু অন্তরাল রচনা করে শশাঙ্ক বসবাস করত সেখানে গিয়ে সরাসরি উঁকি মারলেন। অথচ ঘরে ঢোকবার দরজার গোড়াতেই যে শশাঙ্ক বসে আছে সে দিকে লক্ষ্য নেই। পিছন দিকের ঐ নিভৃত অংশে মুরলীকে পাওয়া যাবে কি না বা কোথায় পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে শশাঙ্ককে একটা প্রশ্ন করাও প্রয়োজনীয় মনে করলেন না। মুরলী যে কী সম্পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তা মুরলী জানে না—মুরলীকে এই দণ্ডে, এই মুহূর্তবিন্দুতে চাই। যেমন দ্রুত এসেছিলেন তেমনি ত্বরিতগতিতে চলে গেলেন।

গায়ে খদ্দরের গলাবন্ধ কোট। তারই একদিকের পকেটে কী ওটা শুঁড় বার করে রয়েছে!

বুঝতে দেরি হল না শশাঙ্কর। শরৎচন্দ্রের পকেটে চামড়ার কেসে মোড়া একটি আস্ত জলজ্যান্ত রিভলবার।

সন্ত লাইসেন্স পাওয়ার পর ঐ ভায়োলেণ্ট বস্তুটি শরৎচন্দ্র তাঁর নন-ভায়েলেণ্ট কোটের পকেটে এমনি অবলীলায় কিছুকাল বহন করেছিলেন।

ওদিককার কোটের পকেটে আরো একটা জিনিস ছিল। সেটা কাগজে মোড়া। সেটা শশাঙ্ক দেখেনি। সেটা শরৎচন্দ্রের 'সতী' গল্পের পাণ্ডুলিপি।

ঐ গল্পটিই তিনি দিতে এসেছিলেন "কালি-কলমকে"। তারই জন্যে অমনি হন্তদন্ত হয়ে খুঁজছিলেন মুরলীধরকে। মুরলীধরকে না পেয়ে সোজা চলে গেলেন ভবানীপুরে—"বঙ্গবাণীতে"। 'সতীর' পূতস্পর্শ পড়ল না আর মসীচিহ্নিত "কালি-কলমে"।

এদিকে ঐ দিনই মুরলীধর আর শৈলজা সকালবেলার ট্রেনে চলে

এসেছে পানিত্রাস। শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে শোনে, শরৎচন্দ্র সকাল-বেলার ট্রেনে চলে গিয়েছেন কলকাতা। এ যে প্রায় একটা উপন্যাসের মতন হল। এখন উপায়? ফিরবেন কখন? সেই রাত্রে। তাও ঠিক কি।

এতটা এসে দেখা না করে ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। রাত্রে না হোক, পরদিন কিংবা কোনো একদিন তো ফিরবেন। সুতরাং থেকে যাওয়া যাক। কিন্তু শুধু উপন্যাসে কি পেট ভরবে?

শরৎচন্দ্রের ছোট ভাই প্রকাশের সঙ্গে শৈলজা ভাব জমিয়ে ফেলল। কাজেই থাকা বা খাওয়া-দাওয়ার কিছুরই কোনো অসুবিধে হল না।

রাত প্রায় দশটার কাছাকাছি পালকির আওয়াজ শোনা গেল। আসছেন শরৎচন্দ্র।

কি জানি কেমন ভাবে নেবেন ভয় করতে লাগল দুই বন্ধুর। এত রাত পর্যন্ত তাঁর বাড়ি আগলে বসে আছে ঘাপটি মেরে এ কেমনতর অতিথি!

পালকি থেকে নামতে লণ্ঠনটা তুলে ধরল শৈলজা। এমন ভাবে তুলে ধরল যাতে আলোর কিছুটা অন্তত তাদের মুখে পড়ে—যাতে তিনি একটু চিনলেও চিনতে পারেন বা! প্রতীক্ষমান বিদেশী লোক দেখে পাছে কিছু বিরক্তিব্যঞ্জক উক্তি করেন, তাই দ্রুত প্রণাম সেরেই মুরলীধর বলে উঠলেন: 'এই শৈলজা'; আর শৈলজাও সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিধ্বনি করল: 'এই মুরলীদা।'

'আরে, তোমরা?' শরৎচন্দ্রের স্তম্ভিত ভাবটা নিমেষে কেটে গেল। 'আমি যে আজ দুপুরে তোমাদের কালি-কলমেই গিয়েছিলাম। কি আশ্চর্য—তোমরা এখানে? এলে কখন?'

দুঃসংবাদটা চেপে গেলেন—ভাগ্যের কারসাজিতে কী সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে "কালি-কলম"। উচ্ছলিত হয়ে উঠলেন আতিথেয়তার

বললেন: 'এ তো বেশ হয়েছে—তোমরা এসেছ! খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো? অসুবিধে হয়নি তো কোনো? কি আশ্চর্য—তোমরা আমার বাড়িতে আর আমি তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি! তা এইরকমই হয় সংসারে। একরকম ভাবি হয়ে ওঠে অন্যরকম। আচ্ছা, তোমরা বোসো, আমি জামা-কাপড় ছেড়ে খেয়ে আসি। কেমন?'

বলেই ভিতরে চলে গেলেন, এবং বললে বিশ্বাস হবে না, মিনিট পনেরোর মধ্যেই বেরিয়ে এলেন চটপট। তারপর সুরু হল গল্প—সে আর থামতে চায় না। মমতা করবার মত মনের মানুষ পেয়েছেন, পেয়েছেন অন্তরঙ্গ বিষয়—জীব আর জীবন—তাঁকে আর কে বাধা দেয়! রাত প্রায় কাবার হতে চলল, তরল হয়ে এল অন্ধকার, তবু তাঁর গল্প শেষ হয় না।

তাঁকেও বারণ করবার লোক আছে ভিতরে। প্রায় ভোরের দিকে ডাক এল: 'ওগো, তুমি কি আজ একটুও শোবে না?'

তক্ষুনি মুরলীদারা তাঁকে উপরে পাঠিয়ে দিলেন। যেতে-যেতেও কিছু দেরি করে ফেললেন। তাঁর লাইব্রেরি ঘরে মুরলীদাদের শোবার বিস্তৃত ব্যবস্থা করলেন। তাতেও যেন তাঁর তৃপ্তি নেই। বিছানার চারপাশ ঘুরে-ঘুরে নিজ হাতে মশারি গুঁজে দিলেন।

আমি একবার গিয়েছিলাম পানিত্রাস। একা নয়, শৈলজা আর প্রেমেনের সঙ্গে। ভাগ্য ভালো ছিল, শরৎচন্দ্র বাড়ি ছিলেন। আমি তো নগণ্য, নেতিবাচক উপসর্গ, তবুও আমারও প্রতি তিনি স্নেহে দ্রবীভূত হলেন। সারা দিন আমরা ছিলাম তাঁর কাছে কাছে, কত-কী কথা হয়েছিল কিছুই বিশেষ মনে নেই, শুধু তাঁর সেই সামীপ্যের সম্প্রীতিটি মনের মধ্যে এখনো লেগে আছে। আমাদের সেদিনকার বহুব্যঞ্জনব্যঞ্জিত অন্নের থালায় যে অদৃশ্য হস্তের স্নেহ-সেবা-স্বাদ পরিবেশিত হয়েছিল তাও ভোলবার নয়।

কথায়-কথায় তিনি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলেন : 'কার জন্যে, কিসের জন্য বেঁচে আছ ?'

মন্দিরের ঘণ্টার মত কথাটা এসে বাজল বুকের মধ্যে।

জীবনে কোথায় সেই জাগ্রত আদর্শ ? কে সেই মানসনিবাস ? কার সন্ধানে এই সম্মুখযাত্রা ?

আদর্শ হচ্ছে রাতের আকাশের সুদূর তারার মত। ওদের কাছে পৌছুতে পারি না আমরা, কিন্তু ওদের দেখে সমুদ্রে আমরা আমাদের পথ করে নিতে পারি অন্তত।

সত্যব্রত হও, ধৃতব্রত। পার্বতী শিবের জন্যে পঞ্চানল জ্বেলে পঞ্চতপ করেছিলেন। তপস্যা করেছিলেন পঞ্চমুণ্ডির উপর বসে। নিরুত্থান তপস্যা। ইন্ধন না থাকে, তবুও আগুন নিভবে না। হও নিরিন্ধনাগ্নি।

যে শুধু হাত দিয়ে কাজ করে সে শ্রমিক, যে হাতের সঙ্গে-সঙ্গে মাথাও খাটায় সে কারিগর, আর যে হাত আর মাথার সঙ্গে হৃদয় মেশায় সে-ই তো আর্টিস্ট। হও সেই হৃদয়ের অধিকারী।

"কালি-কলমের" আড্ডাটা একটু কঠিন-গম্ভীর ছিল। সেখানে কথন ছিল বেশি, উপকথন কম। মানে যিনি বক্তা তাঁরই একলার সব কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব। আর সব শ্রোতা, অর্থাৎ নিশ্চলজিহ্ব। সেখানে একাভিনয়ের ঐকপত্য। বক্তার আসনে বেশির ভাগই মোহিতলাল, নয়তো সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়তো কখনো-সখনো সুরেন গাঙ্গুলী, নয়তো কোনো বিরল অবসরে শরৎচন্দ্র। "কালি-কলমের" আড্ডায় তাই মন ভরত না। তাই "কালি-কলমের" লাগোয়া ঘরেই আর্য-পাবলিশিং-এ আমরা আস্তে-আস্তে একটা মনোরম আড্ডা গড়ে তুললাম। অর্থাৎ "কালি-কলমের" সঙ্গে সংসর্গ রাখতে গিয়ে না শুদ্ধ শুষ্কতর্ক নিয়েই বাড়ি ফিরি।

আর্য-পাবলিশংএ জমে উঠল আমাদের 'বারবেলা ক্লাব'। সেই

ড্ডার কেন্দ্রবিন্দু শশাঙ্ক। বৃহস্পতিবার শশাঙ্কের কাগজের আপিসে ছুটি, তাই সেদিনটা অহোরাত্রব্যাপী কীর্তন। এ শুধু সম্ভব হয়েছিল শশাঙ্কর ঔদার্যের জন্যে। নিজে যখন সে কবি আর সৌভাগ্যক্রমে হৃদয়ে ও দোকানে যখন সে এতখানি পরিসরের অধিকারী, তখন বন্ধুদের একদিনের জন্যে অন্তত আশ্রয় ও আনন্দ না দিয়ে তার উপায় কি? দোকানের কর্তা বলতে সে-ই, আর নিতান্ত সেটা বইয়ের দোকান আর দোতলার উপর বইয়ের দোকান বলে নিরন্তর খদ্দেরের আনাগোনায় আমাদের আড্ডার তালভঙ্গ হবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এত লোকের গুলতানির মধ্যে শশাঙ্ক নিজে কোথাও স্পষ্ট-স্ফুট হয়ে নেই। মধ্যপদ হয়েও মধ্যপদলোপী সমাসের মতই নিজের অস্তিত্বটুকুকে কুণ্ঠিত করে রেখেছে। এত নম্র এত নিরহঙ্কার শশাঙ্ক। অতিথিসৎকারক হয়েও সৎই থেকে গেল চিরদিন, কারকত্বের কণামাত্র অভিমানকেও মনে স্থান দিল না।

সাহিত্যিক-সাংবাদিক অনেকেই আসত সে আড্ডায়। "কল্লোল" সম্পর্কে এতাবৎ যাদের নাম করেছি তারা তো আসতই, তা ছাড়া আসত প্রমোদ সেন, বিজন সেনগুপ্ত, গোপাল সান্যাল, ফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নলিনীকিশোর গুহ, বারিদবরণ বসু, রামেশ্বর দে, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারানাথ রায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত, শচীন্দ্রলাল ঘোষ, বিনয়েন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজা মুখোপাধ্যায়, অবিনাশ ঘোষাল, সন্ন্যাসী সাধুখাঁ এবং আরো অনেকে। এ দলের মধ্যে দুজন আমাদের অত্যন্ত অন্তিকে এসেছিল—বিবেকানন্দ আর অবিনাশ—দুজনেই প্রথমে সাহিত্যিক পরে সাংবাদিক। বিবেকানন্দ তখন প্রাণময় প্রেম বা প্রেমময় প্রাণের কবিতা লেখে, আর ভাগ্যের প্রতিরথ হয়ে জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। বেঁটে, বামুন আর বাঙাল—এই তিন 'ব' নিয়ে তার গর্ব, যেন ত্রিগুণাত্মক ত্রিশূল ধারণ

করে সে দিগ্বিজয়ে চলেছে। আরো এক 'ব'-র সে অধিকারী—সে তার তেজোতপ্ত নাম। মোটকথা, হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি—এই চতুরঙ্গে পরিপূর্ণ সৈনিক। অবিনাশ ক্ষয়োদয়রহিত একনিষ্ঠ সাধক—ফলাকাঙ্ক্ষাহীন। সহায়সম্পন্ন না হয়েও উপায়কুশল। মলয় হাওয়ার আশায় সারাজীবন সে পাখা করতে প্রস্তুত, এত শুদ্ধবুদ্ধিময় তার কাজ। সেই কাজের শুদ্ধিতে তার আর বয়স বাড়ল না কোনোদিন। এদিকে সে পবিত্রর সমতুল।

বারবেলা-ক্লাবে, শশাঙ্কর ঘরে, আমাদের মুৎফরাক্কা মজলিস। কখনো খুনসুটি, ছেলেমানুষি, কখনো বা বিশুদ্ধ ইয়ার্কি। প্রমথ চৌধুরী মাঝে-মাঝে এসে পড়তেন। তখন অকালমেঘোদয়ের মত সবাই গম্ভীর হয়ে যেতাম, কিন্তু সে-গাম্ভীর্যে রসের ভিয়ান থাকত। এক-একদিন এসে পড়ত নজরুল। ভাঙা হারমোনিয়ম একটা জুটত এসে কোত্থেকে, চারদিক সরগরম হয়ে উঠত। ওর প্রথম কীর্তন 'কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া' এই বারবেলা-ক্লাবেই প্রথম ও শুনিয়ে গেছে। কোন এক পথের নাচুনী ভিক্ষুক মেয়ের থেকে শিখে নিয়েছিল সুর, তারই থেকে রচনা করলে—"রুমুঝুমু রুমুঝুমু কে এলে নূপুর পায়," আর তা শোনাবার জন্যে সটান চলে এল রাস্তার প্রথম আস্তানা শশাঙ্কর আখড়াতে।

তবু, এত জনসমাগম, তবু যেন "কল্লোলের" মত জমত না। জনতার জন্যেই জমত না। জনতা ছিল, কিন্তু ঘনতা ছিল না। আকস্মিক হুল্লোড় ছিল খুব, কিন্তু "কল্লোলের" সেই আকস্মিক স্তব্ধতা ছিল না। যেন এক পরিবারের লোক এক নৌকোয় যাচ্ছি না, ছত্রিশ জাতের লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে চলেছি এক জাহাজে, উত্তেজ-উদ্বেল জল ঠেলে।

তবু নজরুল নজরুল। এসে গান ধরলেই হল, সবাই এক অলক্ষ্য সুরে বাঁধা পড়ে যেতাম। যৌবনের আনন্দে প্রত্যেক হৃদয়ে বন্ধুতার স্পন্দন লাগত, যেন এক বৃক্ষে পল্লব-পরম্পরায় বসন্তের শিহরণ

লেগেছে। একবার এক দোল-পূর্ণিমায় শ্রীরামপুরে গিয়েছিলাম আমরা অনেকে। বোটানিক্যাল গার্ডেনস পর্যন্ত নৌকো নিয়েছিলাম। নির্মেঘ আকাশে পর্যাপ্ত চন্দ্র—সেই জ্যোৎস্না সত্যি-সত্যিই অমৃত-তরঙ্গিণী ছিল। গঙ্গাবক্ষে সে রাত্রিতে সে নৌকোয় নজরুল অনেক গান গেয়েছিল—গজল, ভাটিয়ালি, কীর্তন। তার মধ্যে 'আজি দোল-পূর্ণিমাতে দুলবি তোরা আয়', গানখানির সুর আজও স্মৃতিতে মধুর হয়ে আছে। সেই অনির্বচনীয় পরিপার্শ্ব, সেই অবিস্মরণীয় বন্ধুসমাগম, জীবনে বোধহয় আর দ্বিতীয় বার ঘটবে না।

চব্বিশ

তারাশঙ্করেরও প্রথম আবির্ভাব "কল্লোলে"।

অজ্ঞাত-অখ্যাত তারাশঙ্কর। হয়তো পৈত্রিক বিষয় দেখবে, নয়তো কয়লাখাদের ওভারম্যানি থেকে সুরু করে পারমিট-ম্যানেজার হবে। কিংবা বড় জোর স্বদেশি করে এক-আধবার জেল খেটে এসে মন্ত্রী হবে।

কিন্তু বাংলা দেশের ভাগ্য ভালো। বিধাতা তার হাতে কলম তুলে দিলেন, কেরানি বা খাজাঞ্চির কলম নয়, স্রষ্টার কলম। বেঁচে গেল তারাশঙ্কর। শুধু বেঁচে গেল নয়, বেঁচে থাকল।

সেই মামুলি রাস্তায়ই চলতে হয়েছে তারাশঙ্করকে। গাঁয়ের সাহিত্য সভায় কবিতা পড়া, কিংবা কারুর বিয়েতে প্রীতি-উপহার লেখা, যার শেষ দিকে 'নাথ' বা 'প্রভু'কে লক্ষ্য করে কিছু ভাবাবেশ থাকবেই। মাঝে-মাঝে ওর চেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে হত না তা নয়। ডাক-টিকিটসহ কবিতা পাঠাতে লাগল মাসিকপত্রে। কোনোটা ফিরে আসে, কোনোটা আবার আসেই না—তার মানে, ডাক-টিকিটসহ গোটা কবিতাটাই লোপাট হয়ে যায়। এই অবস্থায় মনে শ্মশানবৈরাগ্য আসার কথা। কিন্তু তারাশঙ্করের সহিষ্ণুতা অপরিমেয়। কবিতা ছেড়ে গেল সে নাট্যশালায়।

গাঁয়ে পাকা স্টেজ, অঢেল সাজ-সরঞ্জাম, মায় ইলেট্রিক লাইট আর ডায়নামো। যাকে বলে ষোল কলা। সেখানকার সখের থিয়েটারের উৎসাহ যে একটু তেজালো হবে তাতে সন্দেহ কি। নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেই নাট্যসভার সভাপতি—তাঁর নিজেরও সাহিত্যসাধনার মূলধারা ছিল এই নাট্যসাহিত্য। তা ছাড়া তিনি কৃতকীর্তি—তাঁর নাটক অভিনীত হয়েছে কলকাতায়। তারাশঙ্কর

ভাবল, ঐটেই বুঝি সুগম পথ, অমনি নাটক লিখে একেবারে পাদপ্রদীপের সামনে চলে আসা। খ্যাতির তিলক না পেলে সাহিত্য বোধহয় জলের তিলকের মতই অসার।

নাটক লিখল তারাশঙ্কর। নির্মলশিববাবু তাকে সানন্দে সংবর্ধনা করলেন—সখের থিয়েটারের রথী-সারথিরাও উৎসাহে-উদ্যমে মেতে উঠল। মঞ্চস্থ করলে নাটকখানা। বইটা এত জমল যে নির্মলশিববাবু ভাবলেন একে গ্রামের সীমানা পেরিয়ে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া দরকার। তদানীন্তন আর্ট-থিয়েটারের চাঁইদের সঙ্গে নির্মলশিববাবুর দহরম-মহরম ছিল, নাটকখানা তিনি তাদের হাতে দিলেন। মিটমিটে জোনাকির দেশে বসে তারাশঙ্কর বিদ্যুৎদীপদ্যুতির স্বপ্ন দেখলো। আর্ট-থিয়েটার বইখানি সযত্নে প্রত্যর্পণ করলে, বলা বাহুল্য অনধীত অবস্থায়ই। সঙ্গে-সঙ্গে নির্মলশিববাবুর কানে একটু গোপনগুঞ্জনও দেয়া হল: 'মশাই, আপনি জমিদার মানুষ, আমাদের বন্ধুলোক, নাট্যকার হিসেবে ঠাঁইও পেয়েছেন আসরে। আপনার নিজের বই হয়, নিয়ে আসবেন, যে করে হোক নামিয়ে দেব। তাই বলে বন্ধুবান্ধব শালা-জামাই আনবেন না ধরে-ধরে।'

নির্মলশিববাবু তারাশঙ্করের মামাশ্বশুর।

সবিষাদে বইখানি ফিরিয়ে দিলেন তারাশঙ্করকে। ভেবেছিলেন কথাগুলি আর শোনাবেন না, কিন্তু কে জানে ঐ কথাগুলোই হয়তো মন্ত্রের মত কাজ করবে। তাই না শুনিয়ে পারলেন না শেষ পর্যন্ত, বললেন, তুমি নাকি অপাঙক্তেয়, তুমি নাকি অনধিকারী। রঙ্গমঞ্চে তোমার স্থান হল না তাই, কিন্তু আমি জানি তোমার স্থান হবে বঙ্গমালঞ্চে। তুমি নিরাশ হয়ো না। মনোভঙ্গ মানায় না তোমাকে।

স্তোকবাক্যের মত মনে হল। রাগে-দুঃখে নাটকখানিকে জলন্ত উনুনের মধ্যে গুঁজে দিল তারাশঙ্কর।

ভাবল সব ছাই হয়ে গেল বুঝি। পাদপ্রদীপের আলো বুঝি সব নিবে গেল। হয়তো গিয়ে ঢুকতে হবে কয়লাখাদের অন্ধকারে, কিংবা জমিদারি সেরেস্তার ধুলো-কাদার মধ্যে। কিংবা সেই গতানুগতিক শ্রীঘরে। নয়তো গলায় তিনকণ্ঠী তুলসীর মালা দিয়ে সোজা বৃন্দাবন।

কিন্তু, না, পথের নির্দেশ পেয়ে গেল তারাশঙ্কর। তার আত্মসাক্ষাৎ-কার হল।

কি-এক মামুলি স্বদেশী কাজে গিয়েছে এক মফস্বলি শহরে। এক উকিলের বাড়ির বৈঠকখানায় তক্তপোশের এক ধারে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। শুয়ে-শুয়ে আর সময় কাটে না—কিছু একটা পড়তে পেলে মন্দ হত না হয়তো। যেমন ভাবনা তেমনি সিদ্ধি। চেয়ে দেখলো তক্তপোশের তলায় কি-একটা ছাপানো কাগজ-মতন পড়ে আছে। নিলাম-ইস্তাহার জাতীয় কিছু না হলেই হয়। কাগজটা হাত বাড়িয়ে টেনে নিল তারাশঙ্কর। দেখল মলাট-ছেঁড়া ধুলোমাখা একখানা "কালিকলম"।

নামটা আশ্চর্যরকম নতুন। যেন অনেক শক্তি ধরে বলেই এত সহজ। উলটে-পালটে দেখতে লাগল তারাশঙ্কর। কি-একটা বিচিত্র নামের গল্প পেয়ে থমকে গেল। গল্পের নাম 'পোনাঘাট পেরিয়ে'—আর লেখকের নামও দুঃসাহসী—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

এক নিশ্বাসে গল্পটা শেষ হয়ে গেল। একটা অপূর্ব আস্বাদ পেল তারাশঙ্কর, যেন এক নতুন সাম্রাজ্য আবিষ্কার করলে। যেন তার প্রজ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষু খুলে গেল। খুঁজে পেল সে মাটিকে, মলিন অথচ মহত্বময় মাটি; খুঁজে পেল সে মাটির মানুষকে, উৎপীড়িত অথচ অপরাজেয় মানুষ। পতিতের মধ্যে খুঁজে পেল সে শাশ্বত আত্মার অমৃতপিপাসা। উঠে বসল তারাশঙ্কর। যেন তার মন্ত্রচৈতন্য হল।

'স্বাদু স্বাদু পদে পদে।' পৃষ্ঠা ওলটাতে-ওলটাতে পেল সে আরেকটা গল্প। শৈলজানন্দর লেখা। গল্পের পটভূমি বীরভূম, তারাশঙ্করের

নিজের দেশ। এ যে তারই অন্তরঙ্গ কাহিনী--একেবারে অন্তরের ভাষায় লেখা! মনের সুষমা মিশিয়ে সহজকে এত সত্য করে প্রকাশ করা যায় তা হলে! এত অর্থান্বিত করে। বাংলা সাহিত্যে নবীন জীবনের আভাস-আস্বাদ পেয়ে জেগে উঠল তারাশঙ্কর। মনে হল হঠাৎ নতুন প্রাণের প্লাবন এসেছে—নতুন দর্শন নতুন সন্ধান নতুন জিজ্ঞাসার প্রদীপ্তি—নতুন বেগবীর্যের প্রবলতা। সাধ হল সেও এই নতুনের বন্যায় গা ভাসায়। নতুন রসে কলম ডুবিয়ে গল্প লেখে।

কিন্তু গল্প কই? গল্প তোমার আকাশে-বাতাসে মাঠে-মাটিতে হাটে-বাজারে এখানে-সেখানে। ঠিক মত তাকাও, ঠিক মত শোনো, ঠিক মত বুকের মধ্যে অনুভব করো।

বৈষয়িক কাজে ঘুরতে-ঘুরতে তারাশঙ্কর তখন এসেছে এক চাষী-গাঁয়ে। যেখানে তার আস্তানা তার সামনেই রসিক বাউলের আখড়া। সরোবরের শোভা যেমন পদ্ম, তেমনি আখড়ার শোভা কমলিনী বৈষ্ণবী।

প্রথম দিনই কমলিনী এসে হাজির—কেউ না ডাকতেই। হাতে তার একটি রেকাবি, তাতে দুটি সাজা পান আর কিছু মশলা। রেকাবিটি তারাশঙ্করের পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে প্রণাম করলে গড় হয়ে, বললে, 'আমি কমলিনী বৈষ্ণবী, আপনাদের দাসী।'

শ্রবণলোভন কণ্ঠস্বর। অতুল-অপরূপ তার হাসি। সে-হাসিতে অনেক গভীর গল্পের কথকতা।

কি-একটা কাজে ঘরের মধ্যে গিয়েছে তারাশঙ্কর, শুনল গোমস্তা কমলিনীর সঙ্গে রসিকতা করছে; বলছে, 'বৈষ্ণবীর পানের চেয়েও কথা মিষ্টি—তার চেয়েও হাসি মিষ্টি—'

জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল কমলিনীর মুখ। সহজের সুষমা মাখানো সে-মুখে। যেন বা সর্বসমর্পণের শান্তি। মাথার কাপড়টা আরো একটু

টেনে নিয়ে আরো একটু গোপনে থেকে সে হাসল। বললে, 'বৈষ্ণবের ওই তো সম্বল প্রভু।'

কথাটা লাগল এসে বাঁশির সুরের মত। যে সুর কানের নয়, মর্মের—কানের ভিতর দিয়ে যা মর্মে এসে লেগে থাকে। শুধু শ্রোত্রের কথা নয়, যেন তত্ত্বের কথা—একটি সহজ সরল আচরণে গহন-গূঢ় বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রকাশ। কোন সাধনায় এই প্রকাশ সম্ভবপর হল—ভাবনায় ভোর হয়ে গেল তারাশঙ্কর। মনে নেশার ঘোর লাগল। এ যেন কোন আনন্দরসাশ্রয় গভীর প্রাপ্তির স্পর্শ!

এল বুড়ো বাউল বিচিত্রবেশী রসিক দাস। যেমন নামে-ধামে তেমনি কথায়-বার্তায়, অত্যুজ্জ্বল রসিক সে। আনন্দ ছাড়া কথা নেই। সংসারে সৃষ্টিও মায়া সংহারও মায়া—সুতরাং সব কিছুই আনন্দময়।

'এ কে কমলিনীর?'

'কমলিনীর আখড়ায় এ ঝাড়ুদার। সকাল-সন্ধেয় ঝাড়ু দেয়, জল তোলে, বাসন মাজে—আর গান গায়। মহানন্দে থাকে।'

তারাশঙ্কর ভাবলে এদের নিয়ে গল্প লিখলে কেমন হয়। এ মধুরভাব-সাধন—শ্রদ্ধাযুক্ত শান্তি—এর রসতত্ত্ব কি কোনো গল্পে জীবন্ত করে রাখা যায় না?

কিন্তু সুরু করা যায় কোত্থেকে?

হঠাৎ সামনে এল আধ-পাগলা পুলিন দাস। ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে।

রাতে চুপচাপ বসে আছে তারাশঙ্কর, কমলিনীর আখড়ার কথাবার্তা তার কানে এল।

পুলিন আড্ডা দিচ্ছিল ওখানে। বাড়ি যাবার নাম নেই। রাত নিঝুম হয়েছে অনেকক্ষণ।

কমলিনী বলছে, 'এবার বাড়ি যাও।'

'না।' পুলিন মাথা নাড়ছে।

'না নয়। বিপদ হবে।'

'বিপদ? কেনে? বিপদ হবে কেনে?'

'গোসা করবে। করবে নয় করেছে এতক্ষণ।'

'কে?'

'তোমার পাঁচসিকের বষ্টুমি।' বলেই কমলিনী ছড়া কাটল: "পাঁচসিকের বোষ্টুমি তোমায় গোসা করেছে হে গোসা করেছে—'

তারাশঙ্করের কলমে গল্প এসে গেল। নাম 'রসকলি'। গল্পে বসিয়ে দিলে কথাগুলো।

তারপর কি করা! সব চেয়ে যা আকাঙ্ক্ষনীয়, "প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দিল তারাশঙ্কর। সেটা বোধ হয় বৈশাখ মাস, ১৩৩৪ সাল। সঙ্গে ডাক-টিকিট ছিল, কিন্তু মামুলি প্রাপ্তিসংবাদও আসে না। বৈশাখ গেল, জ্যৈষ্ঠও যায়-যায়, কোনো খবর নেই। অগত্যা তারাশঙ্কর জোড়া কার্ডে চিঠি লিখলে। কয়েকদিন পরে উত্তর এল—গল্পটি সম্পাদকের বিবেচনাধীন আছে। জ্যৈষ্ঠর পর আষাঢ়, আষাঢ়ের পর—আবার জোড়া কার্ড ছাড়ল তারাশঙ্কর। উত্তর এল, সেই একই বয়ান—সম্পাদক বিবেচনা করছেন। ভাদ্র থেকে পৌষে আরো পাঁচটা জোড়াকার্ডে একই খবর সংগৃহীত হল—সম্পাদক এখনো বিবেচনামগ্ন! পৌষের শেষে তারাশঙ্কর জোড়া পায়ে একেবারে হাজির হল এসে "প্রবাসী" আপিসে।

'আমার গল্পটা—' সভয় বিনয়ে প্রশ্ন করল তারাশঙ্কর।

'ওটা এখনো দেখা হয়নি।'

'অনেক দিন হয়ে গেল—'

'তা হয়। এ আর বেশি কি! হয়তো আরো দেরি হবে।'

'আরো?'

'আরো কতদিনে হবে ঠিক বলা কঠিন।'

একমুহূর্ত ভাবল তারাশঙ্কর। কাঁচের বাসনের মত মনের বাসনাকে

ভেঙে চুরমার করে দিলে। বললে, 'লেখাটা তাহলে ফেরৎ দিন দয়া করে।'

বিনাবাক্যব্যয়ে লেখাটি ফেরৎ হল। পথে নেমে এসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল তারাশঙ্কর। মনে মনে সংকল্প করল লেখাটাকে নাটকের মতন অগ্নিদেবতাকে সমর্পণ করে দেবে, বলবে : হে অর্চি, শেষ অর্চনা গ্রহণ কর। মনের সব মোহ ভ্রান্তি নিমেষে ভস্ম করে দাও। আর তোমার তীব্র দীপ্তিতে আলোকিত কর জীবনের সত্যপথ।

অগ্নিদেবতা পথ দেখালেন। দেশে ফিরে এসেই তারাশঙ্কর দেখল কলেরা লেগেছে। আগুন পরের কথা, কোথাও এতটুকু তৃষ্ণার জল নেই। তুহাত খালি, সেবা ও স্নেহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারাশঙ্কর। গল্পটাকে ভস্মীকৃত করবার কথা আর মনেই রইল না। বরং দেখতে পেল সেই পুঞ্জীকৃত অজ্ঞান ও অসহায়তার মধ্যে আরো কত গল্প। আরো কত জীবনের ব্যাখ্যান।

একদিন গাঁয়ের পোস্টাপিসে গিয়েছে তারাশঙ্কর। একদিন কেন প্রায়ই যায় সেখানে। গাঁয়ের বেকার ভবঘুরেদের এমন আড্ডার জায়গা আর কি আছে! নিছক আড্ডা দেওয়া ছাড়া আরো তুটো উদ্দেশ্য ছিল। এক, দলের চিঠিপত্র সত্য-সত্য পিওনের হাত থেকে সংগ্রহ করা; তুই, মাসিক-পত্রিকা-ফেরৎ লেখাগুলো গায়ের কাপড়ে ঢেকে চুপিচুপি বাড়ি নিয়ে আসা। এমনি একদিন হঠাৎ নজরে পড়ল একটা চমৎকার ছবি-আঁকা মোড়কে কি-একটা খাতা না বই। এসেছে নির্মলশিববাবুর ছোট ছেলে নিত্যনারায়ণের নামে। নিত্যনারায়ণ তখন স্কুলের ছাত্র, রাশিয়া-ভ্রমণের খ্যাতি তখনো তার জয়টীকা হয়নি। প্যাকেটটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগল তারাশঙ্কর। এ যে মাসিক পত্রিকা। এমন সুন্দর মাসিক পত্রিকা হয় নাকি বাংলাদেশে! চমৎকার ছবিটা প্রচ্ছদপটের— সমুদ্রতটে নটরাজ নৃত্য করছেন, তাঁর পদপ্রান্তে উন্মথিত মহাসিন্ধু

তাণ্ডবতালে উদ্বেলিত হচ্ছে—ধ্বংসের সংকেতের সঙ্গে এ কি নতুনতরো সৃষ্টির আলোড়ন! নাম কি পত্রিকার? এক কোণে নাম লেখা: "কল্লোল"। কল্লোল অর্থ শুধু ঢেউ নয়, কল্লোলের আরেক অর্থ আনন্দ।

ঠিকানাটা টুকে নিল তারাশঙ্কর। নতুন বাঁশির নিশান শুনল সে। মনে পড়ে গেল 'রসকলির' কথা—সেটা তো পোড়ানো হয়নি এখনো! তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে গল্পের শেষ পৃষ্ঠাটা সে নতুন করে লিখলে। ও পৃষ্ঠার পিঠে "প্রবাসী"তে পাঠাবার সময়কার পোস্টমার্ক পড়েছে, তাই তাকে বদলানো দরকার—পাছে এক জায়গায় ফেরৎ লেখা অন্য জায়গায় না অরুচিকর হয়। জয় দুর্গা বলে পাঠিয়ে দিল লেখাটা। যা থাকে অদৃষ্টে।

অলৌকিক কাণ্ড—চারদিনেই চিঠি পেল তারাশঙ্কর। শাদা পোস্টকার্ডে লেখা। সে-কালে শাদা পোস্টকার্ডের আভিজাত্য ছিল। কিন্তু চিঠির ভাষায় সমবস্থ আত্মীয়তার সুর। কোণের দিকে গোল মনোগ্রামে "কল্লোল" আঁকা, ইতিতে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। মোটমাট, খবর কি? খবর আশার অধিক শুভ—গল্পটি মনোনীত হয়েছে। আরো সুখদায়ক, আসচে ফাল্গুনেই ছাপা হবে। শুধু তাই নয়, চিঠির মাঝে নির্ভুল সেই অন্তরঙ্গতার স্পর্শ যা স্পর্শমণির মত কাজ করে: 'এতদিন আপনি চুপ করিয়া ছিলেন কেন?'

পবিত্রর চিঠির ঐ লাইনটিই তারাশঙ্করের জীবনে সঞ্জীবনীর কাজ করলে। যে আগুনে সমস্ত সংকল্প ভস্ম হবে বলে ঠিক করেছিল সেই আগুনই জ্বাললে এবার আশ্বাসিকা শিখা। সত্য পথ দেখতে পেল তারাশঙ্কর। সে পথ সৃষ্টির পথ, ঐশ্বর্যশালিতার পথ। যোগশাস্ত্রের ভাষায় ব্যুত্থানের পথ। পবিত্রর চিঠির ঐ একটি লাইন, "কল্লোলের" ঐ একটি স্পর্শ, অসাধ্যসাধন করল—যেখানে ছিল বিমোহ, সেখানে নিয়ে এল ঐকাগ্র্য, যেখানে বিমর্ষতা, সেখানে প্রসন্নসমাধি। যেন নতুন করে

গীতার বাণী বাহিত হল তার কাছে : তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব, জিত্বা শত্রূন ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধং—তারাশঙ্কর দৃঢ়পরিকর হয়ে উঠে দাঁড়াল। আগুনকে সে আর ভয় করলে না। জীবনে প্রজ্বলিত অগ্নিই তো গুরু।

'রসকলি'র পর ছাপা হল 'হারানো সুর'। তার পরে 'স্থলপদ্ম'। মাঝখানে তারুণ্যবন্দনা করলে এক মাঙ্গল্যসূচক কবিতায়। সে কবিতায় তারাশঙ্কর নিজেকে তরুণ বলে অভিখ্যা দিলে এবং সেই সম্বন্ধে "কল্লোলের" সঙ্গে জানালে তার ঐকাত্ম্য। যেমন শোক থেকে শ্লোকের জন্ম, তেমনি তারুণ্য থেকেই "কল্লোলের" আবির্ভাব। তারুণ্য তখন বীর্য বিদ্রোহ ও বলবত্তার উপাধি। বিকৃতি যা ছিল তা শুধু শক্তির অসংযম। কিন্তু আসলে সেটা শক্তিই, অমিততেজার ঐশ্বর্য। সেই তারুণ্যের জয়গান করলে তারাশঙ্কর। লিখলে :

"হে নূতন জাগরণ, হে ভীষণ, হে চির-অধীর,
হে রুদ্রের অগ্রদূত, বিদ্রোহের ধ্বজাবাহী বীর ....
ঝঞ্ঝার প্রবাহে নাচে কেশগুচ্ছ, গৈরিক উত্তরী,
সেথা তুমি জীর্ণে নাশি নবীনের ফুটাও মঞ্জরী,
হে সুন্দর, হে ভীষণ, হে তরুণ, হে চারু কুমার,
হে আগত, অনাগত, তরুণের লহ নমস্কার ॥"

এর পর একদিন তারাশঙ্করকে আসতে হল কল্লোল-আপিসে। যেখানে তার প্রথম পরিচিতির আয়োজন করা হয়েছিল সেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। কিন্তু তারাশঙ্কর যেন অনুভব করল তাকে উচ্ছ্বাসে-উল্লাসে বরণ-বর্ধন করা হচ্ছে না। একটু যেন মনোভঙ্গ হল তারাশঙ্করের।

বৈশাখ মাস, দুপুরবেলা। তারাশঙ্কর কল্লোল-আপিসে পদার্পণ করলে। ঘরের এক কোণে দীনেশরঞ্জন, আরেক কোণে পবিত্র চেয়ার-টেবিলে কাজ করছে, তক্তপোশে বসে আছে শৈলজানন্দ। আলাপ হল সবার সঙ্গে, কিন্তু কেমন যেন ফুটল না সেই অন্তরের আলাপী চক্ষু।

পবিত্র উঠে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল, কোথায় কি কাজ আছে তার। দীনেশরঞ্জন আর শৈলজা কি-একটা অজ্ঞাত কোডে চালাতে লাগল কথাবার্তা। তারাশঙ্করের মনে হল এখানে সে যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে। "কল্লোলের" লেখকদের মধ্যে তখন একটা দল বেঁধে উঠেছিল। তরাশঙ্করের মনে হল সে বুঝি সেই দলের বাইরে।

কবিতা আওড়াতে-আওড়াতে উস্কোখুস্কো চুলে স্বপ্নালু চোখে ঢুকল এসে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ। এক হাতে দইয়ের ভাঁড়, কয়েকটা কলা, আরেক হাতে চিঁড়ের ঠোঙা। জিনিসগুলো রেখে মাথার লম্বা চুল মচকাতে-মচকাতে বললে, 'চিঁড়ে খাব।'

দীনেশরঞ্জন পরিচয় করিয়ে দিলেন। চোখ বুজে গভীরে যেন কি রসাস্বাদ করলে নৃপেন। তদ্গতের মত বললে, 'বড় ভাল লেগেছে 'রসকলি'। খাসা!'

ঐ পর্যন্তই।

কতক্ষণ পরে উঠে পড়ল তারাশঙ্কর। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলে।

ঐ একদিনই শুধু। তারপর আর যায়নি কোনোদিন ওদিকে। হয়তো অন্তরে-অন্তরে বুঝেছে, মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না। "কল্লোলে" লেখা ছাপা হতে পারে কিন্তু "কল্লোলের" দলের সে কেউ নয়।

অন্তত উত্তরকালে তারাশঙ্কর এমনি একটা অভিযোগ করেছে বলে শুনেছি। অভিযোগটা এই "কল্লোল" নাকি গ্রহণ করেনি তারাশঙ্করকে। কথাটা হয়তো পুরোপুরি সত্য নয়, কিংবা এক দিক থেকে যথার্থ হলেও আরেক দিক থেকে সঙ্কুচিত। মোটে একদিন গিয়ে গোটা "কল্লোলকে" সে পেল কোথায়? প্রেমেন-প্রবোধের সঙ্গে বা আমার সঙ্গে তার তো চেনা হল প্রথম "কালি-কলমের" বারবেলা আসরে। বুদ্ধদেবের সঙ্গে

আদৌ আলাপ হয়েছিল কি না জানা নেই। তা ছাড়া "কল্লোলের" সুরের সঙ্গে যার মনের তার বাঁধা, সে তো আপনা থেকেই বেজে উঠবে, তাকে সাধ্যসাধনা করতে হবে না। যেমন, প্রবোধ। প্রবোধও পরে এসেছিল কিন্তু প্রথম দিনেই অনুকূল ঔৎসুক্যে বেজে উঠেছিল, ঢেউয়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ঢেউ হয়ে। তারাশঙ্কর যে মিশতে পারেনি তার কারণ আহ্বানের অনান্তরিকতা নয়, তারই নিজের বহির্মুখিতা। আসলে সে বিদ্রোহের নয়, সে স্বীকৃতির, সে স্থৈর্যের। উত্তাল উর্মিলতার নয়, সমতল তটভূমির, কিংবা, বলি, তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের।

দল যাই হোক, "কল্লোল" যে উদার ও গুণগ্রাহী তাতে সন্দেহ কি। নবীনপ্রবণ ও রসবুদ্ধিসম্পন্ন বলেই তারাশঙ্করকে স্থান দিয়েছিল, দিয়েছিল বিপুল-বহুল হবার প্রেরণা। সেদিন "কল্লোলের" আহ্বান না এসে পৌঁছুলে আরো অনেক লেখকেরই মত তারাশঙ্করও হয়তো নিদ্রা-নিমীলিত থাকত।

তারাশঙ্করে তখনো বিপ্লব না থাকলেও ছিল পুরুষকার। এই পুরুষকারই চিরদিন তারাশঙ্করকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে। পুরুষকারই কর্মযোগীর বিভূতি। কাষ্ঠের অব্যক্ত অগ্নি উদ্দীপিত হয় কাষ্ঠের সংঘর্ষে, তেমনি প্রতিভা প্রকাশিত হয় পুরুষকারের প্রাবল্যে। নিষ্ক্রিয়ের পক্ষে দৈবও অকৃতী। নিষ্ঠার আসনে অচল অটল সুমেরুবৎ বসে আছে তারাশঙ্কর—সাহিত্যের সাধনার থেকে একচুল তার বিচ্যুতি হয়নি। ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং—তারাশঙ্করের এই সংকল্পসাধনা। যাকে বলে স্বস্থানে নিয়তাবস্থা—তাই সে রেখেছে চিরকাল। তীর্থের সাজ সে এক মুহূর্তের জন্যেও ফেলে দেয়নি গা থেকে। ছাত্রের তপস্যায় সে দৃঢ়নিশ্চয়। স্থিরপদে চলেছে সে পর্বতারোহণে। সম্প্রতি এত বড় ইষ্টনিষ্ঠা দেখিনি আর বাংলাসাহিত্যে।

সরোজকুমার রায় চৌধুরীও "কল্লোলের" প্রথমাগত। দৈনিক "বাংলার কথায়" কাজ করত প্রেমেনের সহকর্মী হিসেবে। তার লেখায় প্রসাদগুণের পরিচয় পেয়ে প্রেমেন তাকে "কল্লোলে" নিয়ে আসে। প্রথমটা একটু লাজুক, গম্ভীর প্রকৃতির ছিল, কিন্তু হৃদয়বানের পক্ষে হৃদয় উন্মোচিত না করে উপায় কি! অত্যন্ত সহজের মাঝে অত্যন্ত সরস হয়ে মিশে গেল সে অনায়াসে। লেখনীটি সূক্ষ্ম ও শান্ত, একটু বা কোমলার্দ্র। জীবনের যে খুঁটিনাটিগুলি উপেক্ষিত, অন্তরদৃষ্টি তার প্রতিই বেশি উৎসুক। "কল্লোলের" যে দিকটা বিপ্লবের সেদিকে সে নেই বটে, কিন্তু যে দিকটা পরীক্ষা বা পরীষ্টির সে দিকের সে একজন। এক কথায় বিদ্রোহী না হোক সন্ধানী সে। এবং যে সন্ধানী সেই সংগ্রামী। সেই দিক থেকেই "কল্লোলের" সঙ্গে তার ঐকপন্থ।

মনোজ বসুও না লিখে পারেনি কল্লোলে। "কল্লোলে" ছাপা হল তার কবিতা—জসিমী ঢঙে লেখা। তার মেসের বিছানার তলা থেকে কবিতাটি লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল কবি ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মনোজের সঙ্গে পড়েছি এক কলেজে। মনের প্রবণতায় এক না হলেও মনের নবীনতায় এক ছিলাম। "কল্লোল" যে রোমান্টিসিজম খুঁজে পেয়েছে শহরের ইঁট-কাঠ লোহা-লক্কড়ের মধ্যে, মনোজ তাই খুঁজে পেয়েছে বনে-বাদায় খালে-বিলে পতিতে-আবাদে। সভ্যতার কৃত্রিমতায় "কল্লোল" দেখেছে মানুষের 'ট্রাজেডি', প্রকৃতির পরিবেশে মনোজ দেখেছে মানুষের স্বাভাবিকতা। একদিকে নেতি, অন্যদিকে আপ্তি। যোগবলের আরেক দৃপ্ত উদাহরণ মনোজ বসু। কর্মই ফলদাতা, তাই কর্মে সে অনম্য, কর্মই তার আত্মলক্ষ্য। যে তীব্র পুরুষকারবান তার নিশ্চয়সিদ্ধি।

একদিন, গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্‌এ, আশু ঘোষের দোকানে, বিষ্ণু দে একটি সুকুমার যুবকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। নাম ভবানী মুখোপাধ্যায়।

মিতবাক স্নিগ্ধহাস্য নির্মলমানস। শুনলাম লেখার হাত আছে। তবলায় শুধু চাঁটি মারবার হাত নয়, দস্তুরমতো বোল ফোটাবার হাত। নিয়ে এলাম তাকে "কল্লোলে"। তার গল্প বেরুলো, দলের খাতায় সে নাম লেখালে। কিন্তু কখন যে হৃদয়ের পাতায় তার নাম লিখল কিছুই জানি না। যখন আমাদের ভাব বদলায় তখন সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধুও বদলায়, কেননা বন্ধু তো ভাবেরই প্রতিচ্ছায়া। কিন্তু ভবানীর বদল নেই। তার কারণ বন্ধুর চেয়েও মানুষ যে বড় তা সে জানে। বড় লেখক তো অনেক দেখেছি, বড় মানুষ দেখতেই সাধ আজকাল। আর সে বড়ত্ব গ্রন্থের আয়তনে নয়, হৃদয়ের প্রসারতায়। যশবুদ্বুদ আর জনপ্রিয়তা মুহূর্তের ছলনা। টাকাপয়সা ক্ষণবিহারী রঙচঙে প্রজাপতি। থাকে কি? টেকে কি? টেকে শুধু চরিত্র, কর্মোদ-যাপনের নিষ্ঠা। আর টেকে বোধ হয় পুরানো দিনের বন্ধুত্ব। পুরোনো কাঠ ভালো পোড়ে, তেমনি পুরোনো বন্ধুতে বেশি উষ্ণতা। আনন্দ বস্তুতে নয়, আনন্দ আমাদের অন্তরের মধ্যে। সেই আনন্দময় অন্তরের স্বাদ পাওয়া যায় ভবানীর মত বন্ধু যখন অনন্তর।

এই সম্পর্কে অবনীনাথ রায়ের কথা মনে পড়ছে। চিরকাল প্রায় প্রবাসেই কাটালেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বরাবর নিবিড় সংযোগ রেখে এসেছেন। চাকরির খাতিরে যেখানে গেছেন সেখানেই সাহিত্য সভা গড়েছেন বা মরা সভাকে প্রাণরসে উজ্জীবিত করেছেন। হাতে নিয়েছেন আধুনিক সাহিত্যপ্রচারের বর্তিকা। কলকাতায় এসেও যত সাহিত্য-ঘেঁষা সভা পেয়েছেন, "রবিবাসর" বা "সাহিত্যসেবক সমিতি,"—ভিড়ে গিয়েছেন আনন্দে। নিজেও লিখেছেন অজস্র— "সবুজ পত্র" থেকে "কল্লোলে"। সাহিত্যিক শুনলেই সৌহার্দ্য করতে ছুটেছেন। আমার তিরিশ গিরিশে প্রথম খোঁজ নিতে এসে শুনলেন

আমি দিল্লি গিয়েছি। মীরাট যাবার পথে দিল্লিতে নেমে আমাকে খুঁজে নিলেন সমরু প্রেসে, ভবানীদের বাড়িতে।

"কল্লোলে" অনেক লেখকই ক্ষণদ্যুতি প্রতিশ্রুতি রেখে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়েছে। অমরেন্দ্র ঘোষ তাঁর আশ্চর্য ব্যতিক্রম। "কল্লোলের" দিনে একটি জিজ্ঞাসু ছাত্র হিসেবে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। দেখি সে গল্প লেখে, এবং যেটা সবচেয়ে চোখে পড়ার মত, বস্তু আর ভঙ্গি দুইই অগতানুগ।, খুশি হয়ে তার 'কলের নৌকা' ভাসিয়ে দিলাম "কল্লোলে"। ভেবেছিলাম ঘাটে-ঘাটে অনেক রত্নপণ্যভার সে আহরণ করবে। কোথায় কোন দিকে যে ভেসে গেল নৌকো, কেউ বলতে পারল না। ডুবে তলিয়ে গেল কি-না তাই বা কে বলবে। প্রায় দুই যুগ পরে তার পুনরাবির্ভাব হল। এখন আর সে 'কলের নৌকা' হয়ে নেই, এখন সে সমুদ্রাভিসারী সুবিশাল জাহাজ হয়ে উঠেছে—নতুনতরো বন্দরে তার আনাগোনা। ভাবি জীবনে কত বড় যোগসাধন থাকলে এ উন্মোচন সম্ভবপর।

কল্লোল-আপিসে তুমুল কলরব চলেছে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, কে একজন খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকছে গুটিসুটি। পাছে তাকে দেখে ফেলে হুল্লোড়ের উত্তালতায় বাধা পড়ে, একটি অট্টহাসি বা একটি চীৎকারও বা অর্ধপথে থেমে যায়—তাই তার সঙ্কোচের শেষ নেই। নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে সে চুপিচুপি। কিংবা এই বলাই হয়তো ঠিক হবে, নিজেকে মুছে ফেলছে সে সন্তর্পণে। সকালবেলায়ও আবার আড্ডা, তেমনি অনিবার্য অনিয়ম। আবার লোকটি বেরিয়ে যাচ্ছে বাড়ি থেকে, তেমনি কুণ্ঠিত অপ্রস্তুতের মত—যেন তার অস্তিত্বের খবরটুকুও কাউকে না বিব্রত করে। কে এই লোকটি? কর্তা হয়েও যে কর্তা নয়, কে এই নির্লেপ-নির্মুক্ত উদাসীন গৃহস্থ? সবহুমানে তাঁকে স্মরণ করছি—তিনি গৃহস্বামী—দীনেশরঞ্জনের

তথা "কল্লোলের" সবাইকার মেজদাদা। কারুর সঙ্গে সংস্রব-সম্পর্ক নেই, তবু সবাইকার আত্মীয়, সবাইকার বন্ধু। বস্তুর আকারে কোনো কিছু না দিয়ে একটি রমণীয় ভাবও যদি কাউকে দেওয়া যায় তা হলেও বোধ হয় বন্ধুরই কাজ করা হয়। "কল্লোলের" মেজদাদা "কল্লোল"কে দিয়েছেন একটি রমণীয় সহিষ্ণুতা, প্রসন্ন প্রশ্রয়।

পঁচিশ

"কল্লোলের" শেষ বছরে "বিচিত্রায়" চাকরি নিলাম। আসলে প্রুফ দেখার কাজ, নামে সাব-এডিটর। মাইনে পঞ্চাশ টাকা।

বহুবিশ্রুত সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় "বিচিত্রার" সম্পাদক। তাঁর ভাগ্নে 'আদি' পোস্ট-গ্রাজুয়েটে আমার সহপাঠী ছিল। সেই একদিন বললে, চাকরি করব কি না। চাকরিটা অপ্রীতিকর নয়, মাসিক পত্রিকার আপিসে সহ-সম্পাদকি। তারপর "বিচিত্রার" মত উঁচকপালে পত্রিকা—যার শুনেছি, বিজ্ঞাপনের পোস্টার শহরের দেয়ালে ঠিক-ঠিক লাগানো হয়েছে কিনা দেখবার জন্যেই ট্যাক্সি-ভাড়া লেগেছিল একটা স্ফীতকায় অঙ্ক। কিন্তু আমরা নিন্দিত অতি-আধুনিকের দলে, অভিজাত মহলে পাত্তা পাব কিনা কে জানে। সাহিত্যের পূর্বগত সংস্কার-মানা কেউ আছে হয়তো উমেদার। সে-ই কামনীয় সন্দেহ কি।

কিন্তু উপেনবাবু অবাক্যব্যয়ে আমাকে গ্রহণ করলেন। দেখলাম গণ্ডূষজলে সফরীরাই ফরফর করে, সত্যিকারের যে সাহিত্যিক সে গভীরসঞ্চারী! উপেনবাবুর দুই ভাই গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আর সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দুইজনেই আধুনিক সাহিত্যের সংরক্ষক ছিলেন। সুরেনবাবু তো সক্রিয় ভাবে অজস্র লিখেছেনও কল্লোল-কলিকলমে। গিরীনবাবু না লিখলেও বক্তৃতা দিয়েছিলেন মজঃফরপুর সাহিত্য-সম্মিলনে। খানিকটা অংশ তুলে দিচ্ছি:

"আজ সাহিত্যের বাজারে শ্লীল-অশ্লীল সুরুচিসম্পন্ন-রুচিবিগর্হিত রচনার চুল-চেরা শ্রেণীবিভাগ লইয়া যে আলোচনার কোলাহল জাগিয়াছে তাহা বহু সময়েই সত্যকার রুচির সীমা লঙ্ঘন করিয়া যায়। কুৎসিতকে নিন্দা করিয়া যে ভাষা প্রয়োগ করা হয় তাহা নিজেই কুৎসিত।

অশ্লীলতা এবং কুৎসিত সাহিত্য নিন্দনীয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। ইহা এমন একটা অদ্ভুত কথা নহে যাহা মানুষকে কুৎসিত কণ্ঠে শিখাইয়া না দিলে সে শিখিতে পারিবে না। কিন্তু আসল গোল হইতেছে শ্লীলতা এবং অশ্লীলতার সীমানির্দেশ ব্যাপার লইয়া। কে এই সীমা-নির্দেশ করিবে? ....

এই তথাকথিত অশ্লীলতা লইয়া এত শঙ্কিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। ছেলেবেলায় আমি একজন শুচিবায়ুগ্রস্তা নারীকে দেখিয়াছিলাম, তিনি অশুচিকে বাঁচাইয়া চলিবার জন্য সমস্ত দিনটাই রাস্তায় লম্ফ দিয়া চলিতেন, কিন্তু রোজই দিনশেষে তাঁহাকে আক্ষেপ করিতে শুনিতাম যে, অশুচিকে তিনি এড়াইতে পারেন নাই। মাঝে হইতে তাঁহার লম্ফঝম্পের পরিক্রমই সার হইত। সাহিত্যেও এই অত্যন্ত অশুচিবায়ুরোগের হাত এড়াইতে হইবে। ...

যাহা সত্য তাহা যদি অশুভও হয় তথাপি তাহাকে অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই, তাহাকে গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা! বরং তাহাকে স্বীকার করিয়া তাহার অনিষ্ট করিবার সম্ভাবনা কোথায় জানিয়া লইয়া সাবধান হওয়াই বিবেচনার কার্য্য। ...

মাসিকে সাপ্তাহিকে দৈনিকে আজ এই হাহাকারই ক্রমাগত শোনা যায় যে, বাঙলা সাহিত্যের আজ বড় দুর্দ্দিন, বাঙলা-সাহিত্য জঞ্জালে ভরিয়া গেল—বাঙলা-সাহিত্য ধ্বংসের পথে দ্রুত নামিয়া চলিয়াছে। হাহাকারের এই একটা মস্ত দোষ যে, তাহা অকারণ হইলেও মনকে দমাইয়া দেয়, খামকা মনে হয় আমিও হাহাকার করিতে বসি। এই সভায় সমাগত হে আমার তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুগণ, আমি আপনাদিগকে সত্য বলিতেছি যে, বাঙলা-সাহিত্যের অত্যন্ত শুভদিনে আপনাদের সাহিত্যজীবন আরম্ভ হইয়াছে, এত বড় শুভদিন বাঙলা-সাহিত্যের আর আসিয়াছিল কি না জানি না। বাঙলা-সাহিত্য-

জননী আজ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—এই দুই দিকপালের জন্মদান করিয়া জগৎবরেণ্যা। জননীর পূজার জন্য যে বহু বঙ্গসন্তান, সক্ষম অক্ষম, বড় ও ছোট—আজ থরে-থরে অর্ঘ্যের ভার লইয়া মন্দির-পথে উৎসুক নেত্রে ভিড় করিয়া চলিয়াছেন, এ দৃশ্য কি সত্যই মনোরম নহে?"

উপেনবাবুই তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন নি, না কোনো সাহিত্য-সাহচর্যে না কোনো লেখায়-বক্তৃতায়। তাই কিছুটা সংকোচ ছিল গোড়াতে। কিন্তু, প্রথম আলাপেই বুঝলাম, "বিচিত্রা"র ললাট যতই উচ্চ হোক না কেন, উপেনবাবুর হৃদয় তার চেয়ে অনেক বেশি উদার। আর, সাহিত্যে যিনি উদার তিনিই তো সবিশেষ আধুনিক। কাগজের ললাটে-মলাটে যতই সম্ভ্রান্ততার তিলকছাপা থাক না কেন, অন্তরে সত্যিকারের রসসম্পদ কিছু থাক, তাই উপেনবাবুর লক্ষ্য ছিল। সেই কারণে তিনি কুলীনে-অকুলীনে প্রবীণে-নবীনে ভেদ রাখেন নি, আধুনিক সাহিত্যিকদেরও সাদরে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বয়সের প্রাবীণ্য তাঁর হৃদয়ের নবীনতাকে শুষ্ক করতে পারেনি। আর যেখানেই নবীনতা সেখানেই সৃষ্টির ঐশ্বর্য। আর যেখানেই প্রীতি সেখানেই রসস্বরূপ।

আর এই অক্ষয়-অক্ষুণ্ণ প্রীতির ভাবটি সর্বক্ষণ পোষণ করেছেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা-সাহিত্যের সর্বজনীন দাদামশায়। "কল্লোলে" তিনি শুধু লেখেনইনি, সবাইকে স্নেহাশীর্বাদ করেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দুটি সাধ ছিল—প্রথম, ভক্তের রাজা হবেন, আর দ্বিতীয়, শুঁটকে সাধু হবেন না। কেদারনাথের জীবনেও ছিল এই দুই সাধ—প্রথম, ঠাকুর রামকৃষ্ণের দর্শন পাবেন আর দ্বিতীয়, রবীন্দ্রনাথের বন্ধু হবেন। এই দুই সাধই বিধাতা পূর্ণ করেছিলেন তাঁর।

সজ্জা শোভা ও কারুকার্যের দিকে বিচিত্রার বিশেষ ঝোঁক ছিল। একেক সময় ছবির জমকে লেখা কুণ্ঠিত হয়ে থাকত, মনে হত লেখার চেয়ে ছবিরই বেশি মর্যাদা—অন্তশ্চক্ষুর চাইতে চর্মচক্ষু। লেখকের

নামসজ্জা নিয়েও কারিকুরি ছিল। প্রত্যেক লেখার দু অংশে নাম ছাপা হত। লেখার নিচে লেখকের যে নাম সেটি লেখকদত্ত, তাই সেটি শ্রীহীন, আর যেটি শিরোভাগে সেটি সম্পাদকদত্ত, তাই সেটি শ্রীযুক্ত। এর একটা তাৎপর্য ছিল। নামের আগে যে শ্রী বসে সেটা সমাস হয়ে বসে, তার অর্থ, নামধারী একজন শ্রীসম্পৎশালী লক্ষ্মীমন্ত লোক। নিজের পক্ষে এই আত্মঘোষণাটা শিষ্টাচার নয়। তাই বিনয়বুদ্ধিবিশিষ্ট লোক নিজের নামের আগে এই শ্রী ব্যবহার করে না। সেই ব্যবহারটা অব্যবহার। কিন্তু পরের নামের বেলায় শ্রী যুক্ত করে দেয়াটা সৌজন্যের ক্ষেত্রে সমীচীন। পরকে সম্মান দেয়া সুখৈশ্বর্যবান আখ্যা দেওয়া ভদ্রতা, সভ্যতা, বিনয়বাক্যের প্রথম পাঠ। এই তাৎপর্যের ব্যাখ্যাতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আর, এটি একটি যথার্থ ব্যাখ্যা।

যতদূর দেখছি, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ই বোধহয় আত্মোল্লেখে প্রথম শ্রী বর্জন করেন। এবং সে সব দিনে এমন অরসিকেরও অভাব ছিল না যে 'শ্রীহীন চারু'কে নিয়ে না একটু ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছে।

আসলে সব চেয়ে সরল ও পরিচ্ছন্ন, নাম নামের আকারেই ব্যক্ত করা। নাম শুধু নামই। নামের মধ্যে নাম ছাড়া আর কিছুর নাম-গন্ধ না প্রকাশ পায়। শ্রী একেবারে বিশ্রী না হোক, নামের তো বটেই, প্রসঙ্গেরও বহির্ভূত।

একদিন দুপুরবেলা বসে আছি—বা, বলতে পারি, কাজ করছি—একটি দীর্ঘকায় ছেলে ঢুকল এসে বিচিত্রা-আপিসে। দোতলায় সম্পাদকের ঘরে।

উপেনবাবু তখনো আসেননি। আমিই উপনেতা।

'একটা গল্প এনেছি বিচিত্রার জন্যে—' হাতে একটা লেখা, ছেলেটি হাত বাড়াল।

প্রখর একটা ক্ষিপ্রতা তার চোখে-মুখে, যেন বুদ্ধির সন্দীপ্তি। গল্প যেন সে এখুনি শেষ করেছে আর যদি কাল বিলম্ব না করে এখুনি ছেপে দেওয়া হয় তা হলেই যেন ভালো হয়।

'এই রইল—'

ভঙ্গিতে এতটুকু কুণ্ঠা বা কাকুতি নেই। মনোনীত হবে কি না হবে সে সম্বন্ধে এতটুকু দ্বন্দ্ব নেই। আবার কবে আসবে ফলাফল জানতে, কৌতূহল নেই একরতি।

যেন, এলুম, লিখলুম আর জয় করলুম—এমনি একটা দিব্য ভাব।

লেখাটা নিলুম হাত বাড়িয়ে। গল্পটির নাম 'অতসী মামী'। লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক ভট্টাচার্য যিনি লিখতেন এ সে নয়। এ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখাটা অদ্ভুত ভালো লাগল। উপেনবাবুও পছন্দ করলেন। গল্প ছাপা হল "বিচিত্রা"য়। একটি লেখাতেই মানিকের আবির্ভাব অভ্যর্থিত হল।

মানিকই একমাত্র আধুনিক লেখক যে "কল্লোল"-ডিঙিয়ে "বিচিত্রা"য় চলে এসেছে—পটুয়াটোলা ডিঙিয়ে পটলডাঙায়। আসলে সে "কল্লোলেরই" কুলবর্ধন। তবে দুটো রাস্তা এগিয়ে এসেছে বলে সে আরো ত্বরান্বিত। কল্লোলের দলের কারু কারু উপন্যাসে পুলিশ যখন অশ্লীলতার ওজুহাতে হস্তক্ষেপ করে, তখন মানিক বোধ হয় শুক্তি-মগ্ন! এক যুগে যা অশ্লীল পরবর্তী যুগে তাই জোলো, সম্পূর্ণ হতাশাব্যঞ্জক।

"বিচিত্রা"য় এসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্নিহিত হই। তখন তাঁর 'পথের পাঁচালী' ছাপ হচ্ছে—মাঝে-মধ্যে বিকেলের দিকে আসতেন "বিচিত্রা"য়। যখনই আসতেন মনে হত যেন অন্য জগতের সংবাদ নিয়ে এসেছেন। সে জগতে প্রকৃতির একচ্ছত্র রাজত্ব—যেন অনেক শান্তি অনেক ধ্যানলীনতার সংবাদ সেখানে। ছায়ামায়াভরা

বিশালনির্জন অরণ্যে যে তাপস বাস করছে তাকেই যেন আসন দিয়েছেন হৃদয়ে—এক আত্মভোলা সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে তিনিও যেন সমাহিত, প্রসন্নগম্ভীর। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্য আত্মসংযোগ রেখেছেন বলে তাঁর ব্যক্তে ও মৌনে সর্বত্রই সমান স্বচ্ছতা, সমান প্রশান্তি। তাঁর মন যেন অনন্তভাবে স্থির ও আবিষ্ট। মনের এই শুক্লধর্ম বা নৈর্মল্যশক্তি অন্য মনকে স্পর্শ করবেই। যে মানবপ্রীতির উৎস থেকে এই প্রজ্ঞা এই আনন্দ তাই তো পরমপুরুষার্থ। এই প্রীতিস্বরূপে অবস্থিতিই তো সাহিত্য। এই সাহিত্যে বা সহিত-ত্বেই বিভূতিভূষণের প্রতিষ্ঠা। স্বভাবস্বচ্ছধবল নিশ্চিন্ত-নিস্পৃহ বিভূতিভূষণ।

এই বিভূতিভূষণের আওতায় এসে "শনিবারের চিঠি" তার স্বর বদলাতে স্বরু করল। অর্থাৎ সে স্তুতি ধরলে। এর আগে পর্যন্ত সে একটানা ঘৃণা-নিন্দা করেই এসেছে, পরের ছিদ্রদর্শনই তার একমাত্র দর্শন ছিল। চিত্তের ধর্মই এই, যখন সে যার ভাবনা করে, তখন তদাকারাকারিত হয়। আকাশ বা সমুদ্র ভাবলে মন যেমন প্রশান্ত ও প্রসারিত হয় তেমনি ক্লেদ ও কর্দম ভাবলে হয় দূষিত ও কলুষিত। যার শুধু পরের দোষ ধরাই ঝোঁক—এমন মজা—সে দোষই তাকে ধরে বসে। আর, ভাগ্যের এমন পরিহাস, যে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে সে-ই শেষে একদিন সেই অশ্লীলতার অভিযোগেই রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়।

সব চেয়ে লাঞ্ছনা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। সে এক হীনতম ইতিহাস। "শনিবারের চিঠি"র হয়তো ধারণা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লেখকদের উপর সম্পূর্ণ বীতরাগ নন—তাঁরই প্রশংসার আশ্রয়ে তারা পরিপুষ্ট হচ্ছে। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ির বিচিত্রাভবনে যে বিচার-সভা বসে তা উল্লেখযোগ্য। আধুনিক সাহিত্যের গতি ও রীতি নিয়ে যে তর্ক উঠেছে তার মীমাংসা

নিয়েই সে সভা। মীমাংসা আর কি, রবীন্দ্রনাথ কি বলেন তাই শোনা।

দু'দিন সভা হয়েছিল। প্রথম দিন "শনিবারের চিঠি" উপস্থিত ছিল না। দ্বিতীয় দিন ছিল। তার দলে অনেকেই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—মোহিতলাল, অশোক চট্টোপাধ্যায়, নীরদ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, গোপাল হালদার—তবে দ্বিতীয় দিনের সভায় ও-পক্ষে ঠিক কে-কে এসেছিলেন মনে করতে পারছি না। কল্লোল-দল দুদিনই উপস্থিত ছিল। আর অনপেক্ষদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, প্রশান্ত মহলানবিশ, অপূর্বকুমার চন্দ, নরেন্দ্র দেব—আর সর্বোপরি অবনীন্দ্রনাথ।

কথা-কাটাকাটি আর হট্টগোল হয়েছিল মন্দ নয়। এর কি কোনো ডিক্রি-ডিসমিস আছে, না, এ নিয়ে আপোষ-নিষ্পত্তি চলে? দল বেঁধে যদি সাহিত্য না হয়, তবে সভা করেও তার বিধি-বন্ধন হয় না।

চরম কথা বলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। বলেছিলেন, 'এদের লেখা যদি খারাপ তবে তা পড়ো কেন বাপু। খারাপ লেখা না পড়লেই হয়।'

শুধু নিজেরা পড়েই ক্ষান্তি নেই, অন্তকে চোখে আঙুল দিয়ে পড়ানো চাই। আর তারি জন্যে মণি-মুক্তা অংশটিতে ঘন-ঘন ফোঁড় দিয়ে দেওয়া যাতে করে বেশ নিরিবিলিতে বসে উপভোগ করা চলে। প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞাপনটি এইরূপ: "অশ্লীলতার জন্য যাহারা শনিবারের চিঠির মণিমুক্তা অংশটি না ছিঁড়িয়া বাড়ী যাইতে পারেন না বলিয়া আপত্তি করেন তাঁহাদের জন্য মণিমুক্তা perforate করিয়া দিলাম।" কেউ-কেউ আকর্ষণ বাড়াবার জন্যে পৃষ্ঠাগুলো আঠা দিয়ে এঁটে দেয়, কেউ-কেউ বা স্বচ্ছাবরণ জ্যাকেটে পুরে রাখে।

অপূর্ব ভাষণ দিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেটি 'সাহিত্যধর্ম' নামে ছাপা

হল "প্রবাসী"তে। মূল কথা যা বলেছিলেন সেদিন, তা যেন আজকের দিনের সাহিত্যের পক্ষেও প্রযোজ্য।

"রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম।

মানুষের আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্র কালে কালে বিস্তৃত হতে থাকে।… অতএব বিষয়ের বৈচিত্র্য কালে-কালে ঘটতে বাধ্য। কিন্তু যখন সাহিত্যে আমরা তার বিচার করি তখন কোন কথাটা বলা হয়েছে তার উপর ঝোঁক থাকে না, কেমন করে বলা হয়েছে সেইটের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিই।…

কয়লার খনিক বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসবে? এই রকমের কোনো একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায় এ মানতে পারব না। বিশেষ একটা চাপরাসপরা সাহিত্য দেখলেই গোড়াতে সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত। তার ভিতরকার দৈন্য আছে বলেই চাপরাসের দেমাক বেশি হয়।… আজকের হাটে যা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, কালই তা আবর্জনা-কুণ্ডে স্থান পায়।… সাহিত্যের মধ্যে অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ তখনি প্রকাশ পায়, যখন দেখি বিষয়টা অত্যন্ত বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে।…. বিষয়প্রধান সাহিত্যই যদি এই যুগের সাহিত্য হয়, তা হলে বলতেই হবে এটা সাহিত্যের পক্ষে যুগান্ত।"

কিন্তু আসল মর্মকথাটি কি?

"রাজপুত্র বৈজ্ঞানিক নন—অর্থশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি—তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন বোধ করি চব্বিশ বছর বয়স এবং তেপান্তরের মাঠ। দুর্গম পথ পার হয়েছেন জ্ঞানের জন্যে নয়, ধনের জন্যে নয়, রাজকন্যারই জন্যে। এই রাজকন্যার স্থান ল্যাবরটরিতে নয়, হাটবাজারে নয়, হৃদয়ের সেই নিত্য বসন্তলোকে, যেখানে কাব্যের কল্পলতায় ফুল ধরে; যাকে জানা যায় না, যার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না, বাস্তব ব্যবহারে যার

মূল্য নেই, যাকে কেবল একান্তভাবে বোধ করা যায়—তারি প্রকাশ সাহিত্যকলায়, রসকলায়। এই কলাজগতে যার প্রকাশ, কোনো সমজদার তাকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে না, 'তুমি কেন?' সে বলে, 'তুমি যে তুমিই এই আমার যথেষ্ট।' রাজপুত্রও রাজকন্যার কানে-কানে এই কথাই বলেছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথের এই 'সাহিত্যধর্ম' নিয়েও তর্ক ওঠে। শরৎচন্দ্র প্রতিবাদে প্রবন্ধ লেখেন "বঙ্গবাণী"তে—'সাহিত্যের রীতি ও নীতি'। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তও শরৎচন্দ্রকে সমর্থন করেন। শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র তো প্রকাশ্যভাবেই আধুনিকতার স্বপক্ষে। "শনিবারের চিঠি" মনে করল, রবীন্দ্রনাথও যেন প্রচ্ছন্নরূপে আশীর্বাদময়। নইলে এমন কবিতা তিনি কেন লিখলেন?

"নিম্নে সরোবর স্তব্ধ হিমাদ্রির উপত্যকাতলে;
ঊর্দ্ধে গিরিশৃঙ্গ হ'তে শ্রান্তিহীন সাধনার বলে
তরুণ নির্ঝর ধায় সিন্ধুসনে মিলনের লাগি
অরুণোদয়ের পথে। সে কহিল, "আশীর্ব্বাদ মাগি,
হে প্রাচীন সরোবর।" সরোবর কহিল হাসিয়া,
"আশীষ তোমার তরে নীলাম্বরে উঠে উদ্ভাসিয়া
প্রভাত সূর্য্যের করে; ধ্যানমগ্ন গিরি তপস্বীর
নিরন্তর করুণার বিগলিত আশীর্ব্বাদ-নীর
তোমারে দিতেছে প্রাণধারা। আমি বনচ্ছায় হ'তে
নির্জ্জনে একান্তে বসি, দেখি তুমি নির্বারিত স্রোতে
সঙ্গীত-উদ্বেল নৃত্যে প্রতিক্ষণে করিতেছ জয়
মসীকৃষ্ণ বিঘ্নপুঞ্জ পথরোধী পাষাণ-সঞ্চয়
গূঢ় জড় শত্রুদল। এই তব যাত্রার প্রবাহ
আপনার গতিবেগে আপনাতে জাগাবে উৎসাহ॥"

শুধু আশীর্বাদ নয়, বিপক্ষদলের শক্রকে "মসীকৃষ্ণ" বলা, "জড়" বলা! অসহ্য। সুতরাং বেড়া-আগুনে পোড়াও সবাইকে। শ্রদ্ধা ভক্তি ভদ্রতা শালীনতা সব বিসর্জন দাও।

সুরু হল সে এক উদ্দণ্ড তাণ্ডব। "তাণ্ডবে তুষিয়া দেবে খণ্ডাইবে পাপ"। পাপটি খণ্ডে গেল, মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে কোল দিলেন। কংস পেয়ে গেল কৃষ্ণের পাদপদ্ম।

সুবাতাস বইতে লাগল আস্তে আস্তে। কটূক্তি ছেড়ে সদুক্তির চেষ্টা-চর্চা সুরু করল "শনিবারের চিঠি"। বিভূতিভূষণের আগমনেই এই বাঁক নিলে, বাঁকাকে সোজা করার সাধনা। আসলে রোষ অস্ত গেলেই রস এসে দেখা দেয়। "শনিবারের চিঠি"ও ক্রমে-ক্রমে রোষের জগৎ থেকে চলে আসতে লাগল রসের জগতে। "পতন-রব্যুদয়-দুর্গম-পন্থা" শেষ পর্যন্ত "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা" বলেই মান পেল। "খোকা-ভগবান" বা "গরু" মান পেল মহাপুরুষপ্রবর নেতাজীরূপে! বিদ্রোহী নজরুল ইসলাম পেল উপযুক্ত স্বদেশ-প্রেমীর বিজ্ঞাপন। ক্রমে-ক্রমে সে স্তুতিবাদের সংসারে দেখা দিতে লাগল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর কিছুকালের জন্যে বা মানিক—মনোজ, বনফুল—এবং পরবর্তী আরো কেউ-কেউ। বস্তুত ইচ্ছে করলে ওদের সম্বন্ধেও কি অপভাষ রচনা করা যেত না? কিন্তু "শনিবারের চিঠি" হৃদয়ঙ্গম করল শুধু নিন্দা কোথাও নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেয় না; আর শুধু-প্রশংসা কোথাও নিয়ে গিয়ে পৌঁছে না দিলেও অন্তত হৃদয়ে এনে জায়গা দেয়। সেই তো অনেক। এমনিতেও সমালোচনা নয়, অমনিতেও সমালোচনা নয়। তবে বৈরাচরণ না করে বন্ধুকৃত্য করাই তো শুভকর। আঘাত অনেকই তো দিয়েছি, এবার আলিঙ্গন দেয়া যাক। দেখিয়েছি কত পরাক্রান্ত শত্রু হতে পারি, এখন দেখানো যাক হতে পারি কত বড় অনিন্দ্যবন্ধু। সজনীকান্ত প্রীতির মায়াপাশে বাঁধা পড়ল। যার যেমন পুঁজি, জিনিসের সে সেই

রকমই দাম দেয়। কিন্তু অন্তরে প্রীতি জন্মালে বোধ করি নিজেকেও দিয়ে দিতে বাধে না।

"কল্লোল" উঠে যাবার পর কুড়ি বছর চলে গেছে। আরো কত বছর চলে যাবে, কিন্তু ওরকমটি আর "ন ভূতো ন ভাবী"। দৃশ্য বা বিষয়ের পরিবর্তন হবে দিনে-দিনে, কিন্তু যে যৌবন-দীপ্তিতে বাংলা সাহিত্য একদিন আলোকিত হয়েছিল তার লয়-ক্ষয়-ব্যয় নেই—সত্যের মত তা সর্বাবস্থায়ই সত্য থাকবে। যারা একদিন সেই আলোক-সভাতলে একত্র হয়েছিল, তারা আজ বিচিত্র জীবনিয়মে পরস্পরবিচ্ছিন্ন —প্রতিপূরণে না হয়ে হয়তো বা প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত—তবু, সন্দেহ কি, সব তারা এক জপমালার গুটি, এক মহাকাশের গ্রহতারা। যে যার নিজের ধান্দায় ঘুরছে বটে, কিন্তু সব এক মন্ত্রে বাঁধা, এক ছন্দে অনুবর্তিত। এক তত্ত্বাতীত সত্তা-সমুদ্রের কল্লোল একেক জন। বাহ্যত বিভিন্ন, আসলে একত্র। কর্ম নানা আনন্দ এক। স্পর্শ নানা অনুভূতি এক। তেমনি সর্বঘটে এক আকাশ, সর্বপীঠে এক দেবতা, সর্বদেহে এক অধিষ্ঠান। "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।" তাই সর্বত্র মহামিলন। ভেদ নেই, দ্বৈত নেই, তারতম্য নেই, সর্বত্র এক সনাতনের উপাসনা।